প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : অজিত গুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৫১

মূল্য : চার টাকা

ঘরের দরজার কপাটে টোকা পড়ছে—টক্ টক্ টক্। একবার দুবার তিনবার। তার পরেই শব্দটা থেমে গেল।

ঘরের ভিতরে আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে চিরুনিটাকে হাতে তুলে নিতে গিয়েই হেসে ফেলে প্রতিভা। বুঝতে তো কোন অসুবিধে নেই, কে টোকা দিয়েছে।

কিন্তু টোকা দেবার কী দরকার ছিল? দরজার কপাট তো বন্ধ নয়। ভিতর থেকে কপাটের গায়ে খিল এ'টে দেয়নি প্রতিভা। তাছাড়া ভেজানো কপাট তো কোন বাধাও নয়। সামান্য একটু ঠেলা দিলেই খুলে যায়। তবু টোকা দিচ্ছেন ভদ্রলোক। আহা, কী ভদ্রতা! যিনি সেদিন হুট করে স্নানের ঘরে ঢুকে প্রতিভার হাতের তোয়ালেটাকে কেড়ে নিলেন, তিনি এখন প্রতিভার ঘরের দরজার ভেজানো কপাটে টোকা দিয়ে প্রতিভাকে সাবধান হতে বলছেন। কী চমৎকার সতর্ক আর সংযত সৌজন্য!

প্রতিভার চোখের হাসিটা দরজার দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পেরেছে, ভেজানো কপাটের ওদিকে কী সুন্দর একটি দুষ্টুমির হাসি দাঁড়িয়ে আছে। উনি বোধ হয় মনে করেছেন যে, কপাটের গায়ে এরকম তিনটে টোকার শব্দ শুনলে ভয় পেয়ে চমকে উঠবে প্রতিভা। বন্ধ জানালার গায়ে কাকের ঠোকরের শব্দ শুনে খুব ভয় পায়, বউদির যে ছোট মেয়েটা, সেই মণ্টুর মত গলা কাঁপিয়ে চে'চিয়ে উঠবে। আর, ভদ্রলোক তখন একটা ধাক্কা দিয়ে ভেজানো কপাট ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকবেন। থিয়েটারের বীরের মত চে'চিয়ে উঠবেন—ভয় নেই, এই যে, আমি আছি!

কে জানে এখন কেমন আছে মণ্টু? পুরো একটা বছর পার হয়ে গিয়েছে, সেই যে মণ্টুটা কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়লো, আর ঘুমন্ত মণ্টুকে বিছানাতে শুইয়ে দিলে প্রতিভা, তারপর সেদিন আর একটিবারও ওর কাছে গিয়ে ওকে দেখবার সাহস হলো না। তিন বছর বয়সের সেই মণ্টুকে সেদিন তখন ঘুম না পাড়িয়ে প্রতিভার চলে আসবারও উপায় ছিল না। জাগন্ত মণ্টুর দুই চোখ কী অদ্ভুত সতর্ক দুটো চোখ। পিসি যেন বরের বাড়িতে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পিসির হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিল মণ্টু। বিয়ের রাতের উৎসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়ে ছুটোছুটি করেছিল যে, সেই মণ্টু। বড় বেশী ঘামাচি হয় মেয়েটার। বউদিকে তো অনেকবার বলা হয়েছে, মাঝে মাঝে শ্বেতচন্দনের গুঁড়ো ভাল করে ওর সারা

গায়ে মেখে দিয়ে তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে দিও। বউদি কি মনে করে রেখেছে সে-কথা? মনে করে রাখলেই বা কি? শুধু কাপড় কাচতেই যার সকাল থেকে বিকেল ফুরিয়ে যায়, সে মানুষের পক্ষে মণ্টুর ঘামাচি নিয়ে ব্যস্ত হবার সময় কোথায়?

চলে গেলেন নাকি ভদ্রলোক? কপাটের গায়ে আর তো টোকা পড়ছে না। মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকায় প্রতিভা। না, ভেজানো কপাট একটুও নড়ে উঠলো না। তবে, তবে বোধ হয় খুব আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে, দুই কপাটের মাঝখানে সামান্য একটু ফাঁক দিয়ে একজোড়া ধূর্ত চোখের হাসি এখুনি ঘরের ভিতরে উঁকি দেবে। চিরুনিটাকে তেমনই হাতে ধরে রেখে দরজার কাছে এগিয়ে আসে প্রতিভা। কপাট একটু ফাঁক হলেই, একজোড়া ধূর্ত চোখের হাসি দেখতে পেলেই কপাটের ফাঁকের ভিতর হাত চালিয়ে অনুপমের মাথায় ওই চিরুনি দিয়ে বেশ জোরে একটা টোকা দিতে হবে। শাড়ির আঁচলটাকে দাঁতে চেপে ধরে আর চুপ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিভা। খুব সাবধান; মুখের নীরব হাসিটা যেন শব্দ করে উথলে উঠতে না পারে।

অনুপমের মাথায় মেয়েলী চিরুনির টোকা! এর পরিণাম কী হবে, তা-ও বুঝে নিতে কোন অসুবিধা নেই প্রতিভার। জানাই আছে, কী করবেন ভদ্রলোক। প্রতিভার হাত দুটো শুধু শক্ত করে একবার চেপে ধরেই আবার শান্ত হয়ে চলে যাবেন, এমন মেজাজের মানুষ উনি নন। কিন্তু তাতেই বা ভয় কিসের? ছাই ভয়। ভালই তো লাগে। শুধু অনুপমের মেজাজের দোষ দেবার কোন মানে হয় না। প্রতিভার মনটাও যে মাঝে-মাঝে সময়-অসময় বিচার করতে চায় না। কতবার ভুলে যেতে হয়েছে, এটা রাত নয়, নিতান্ত একটা দুপুরবেলা। সেদিনও তো, হঠাৎ ভুলেই যেতে হলো যে, এটা একটা বিকালবেলা, এখনই বের হতে হবে, পার্ক-সার্কাসের রজনীবাবুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে, রজনীবাবুর গাড়িটা এসেও গিয়েছে। আধ ঘণ্টা ধরে কত যত্ন করে পরা সাজ এক মিনিটের মধ্যে এলোমেলো হয়ে গেল। আবার নতুন করে সাজতে হলো। শুধু অনুপমকে একটা ক্ষেপা বাতাসের ঝড় বলে নিন্দে করা উচিত নয়। প্রতিভা নিজেও যে একটা ঢলের জলের ঢেউ, ভেসে যেতে আর ভাসিয়ে নিয়ে যেতে ভালবাসে। আশ্চর্য, বলে আশ্চর্য! ভাবতেও অদ্ভুত লাগে, এক বছর আগে যে-মানুষ একেবারে অচেনা অজানা ও অদেখা একটা মানুষ ছিল, আজ এখন তারই কাছে মন-প্রাণ সবই সব লজ্জা হারিয়ে কত সুখী হয়ে যায়।

মনে পড়লে হাসি পায়। একদিন রিক্সাতে বড় মাসির কোলে বসতে হয়েছিল বলে কত অস্বস্তি বোধ করতে হয়েছিল। ধিঙ্গি শরীরটা নিয়ে বড় মাসির কোলে বসা, হাত-পা যেন লজ্জা পেয়ে শিউরে উঠেছিল। কিন্তু এখন? এই তো, এখুনি অনুপম এসে ঘরে ঢুকবে। ঘরের আলোটা জ্বলতেও থাকবে।

তখন কী হবে? তখন কী আর সেই অদ্ভুত লজ্জা আর অস্বস্তির কোন মনে পড়বে?

হ্যাঁ, রিক্সা। নড়বড়ে নোংরা একটা রিক্সা। সেই রিক্সার দিকে তাকিয়ে বড় মাসির চোখ দুটো ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁফ-ধরা স্বরে একটা অদ্ভুত কথাও জিজ্ঞেস করে বসলেন বড় মাসি—রিক্সা কেন পরেশ? শুনেছিলাম যে...।

হেসে ফেললেন বাবা। কী অদ্ভুত শুকনো খটখটে হাসি। যেন বুকের ভিতর থেকে একগাদা পোড়া কয়লার ছাই ঝরে পড়ছে। ছাতার হাতলটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বাবা যেন একটা হঠাৎ-আঘাতের কাঁপুনি সহ্য করে নিলেন। জবাব দিতে গিয়ে কেশে ফেললেন। হাসি আর কাশির সঙ্গে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলার স্বর মিশিয়ে দিয়ে বাবা শুধু বললেন—হ্যাঁ বড়দি; কিন্তু আপনার খুব বেশী কষ্ট হবে না। এই তো, এই স্টেশন থেকে মাত্র আট-দশ মিনিটের রাস্তা।

শ্রীনগরের বড় মাসি এই প্রথম গুপ্তিপাড়ার বাড়িতে এলেন। শ্রীনগরে নিশ্চয় রিক্সা নেই। তা না হলে সামান্য একটা রিক্সা দেখে এত ভয় পেতেন না বড় মাসি।

কিন্তু দরজার কপাট যে একেবারে চুপ হয়ে স্থির হয়েই এঁটে রয়েছে। ওদিকের কোন সাড়া আর শব্দ করে বেজে ওঠে না। তা হলে কি শুধু অকারণে তিনটে টোকা দিয়ে চলে গিয়েছে একটা মিথ্যে ভয়-দেখানো মতলব? এ সময়ে তো শুধু নীচের তলার ঘরে বসে চন্দ্রবাবু আর সূর্যবাবুর সঙ্গে দুনিয়ার যত মাথা-ব্যথার গল্প করা ছাড়া অনুপমের আর কোন কাজ নেই। ওসব গল্পের মধ্যে কী এমন আনন্দের জাদু আছে যে, এখানে এই ঘরের দরজার কাছে এসেও আবার ওখানেই ছুটে চলে যেতে হবে?

কপাট খুলে ঘরের বাইরের বারান্দার দিকে তাকায় প্রতিভা। ঠিকই, কেউ নেই। চলে গিয়েছে অনুপম। চলেই যদি যাবে, তবে এরকম একটা মিথ্যে ঠাট্টা করবার কী দরকার ছিল? চন্দ্র-সূর্যকে নীচের তলার ওই ঘরে দু পেয়ালা চা দিয়ে একটা ঘণ্টা বসিয়ে রাখলে কি গল্পের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? এমনিতেই তো কতবার সন্ধ্যা হবার আগেই এসে ওই ঘরের দুই চেয়ারে চন্দ্র-সূর্য দুজনেই বসে থাকেন। অনুপম তখন বাড়িতে নেই, তবু তাঁরা বসে থাকেন। সন্ধ্যা হয়, ঘরের ভিতরে তখন চারটে আলো জ্বলে। কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা আলো। সারা ঘরে যেন কালিমাখানো একটা আভা ছমছম করে। দুটো পাখাও ঘোরে। আর, চাকর রামপ্রসাদ দু' ঘণ্টার মধ্যে অন্তত চার পেয়ালা চা পৌঁছে দিয়ে আসে। যুদ্ধটা একেবারে থেমে না যাওয়া পর্যন্ত বোধ হয় চন্দ্রবাবু আর সূর্যবাবুর চা খাওয়াও থামবে না। কী আশ্চর্য, যখন

.রন বেজে ওঠে, এ আর পি'র হুইসিলের শব্দ ছুটোছুটি করে, তখনও ব্যস্তভাবে ডাক দেন চন্দ্রবাবু—রামপ্রসাদ, তাড়াতাড়ি দু' কাপ চা দিয়ে যাও।

এই বারান্দার আলোটা কিন্তু বেশ নরম। ঘন নীল রঙের ডুম দিয়ে ঢাকা। দোতলার এই বারান্দা যেন রঙীন মোজেয়িকের একটা সড়ক। কত লম্বা! এখান থেকে একটানা পর পর পাঁচটা ঘরের দরজা ছুঁয়ে ছুঁয়ে একেবারে সিঁড়ির কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এক পাশে ফুলের টবের সবই যত চীনে লিলি আর জাপানী হানা। ওদিকে সিঁড়ির মুখের সামনা-সামনি সেগুন কাঠের একটা সিংহের পিঠের উপর মস্ত বড় একটা মিরর। এখানে দাঁড়িয়ে ওই মিররের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়, সিঁড়ি ধরে কে উপরে উঠছে, আর কে-ই বা নেমে যাচ্ছে।

না, কেউ না। ওই মিররে কোন মানুষের যাওয়া-আসার ছবি নড়ছে না। কোন সিগারেটের ধোঁয়ার একটা হালকা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কুণ্ডলীও দুলছে না।

গুপ্তিপাড়ার বাড়ির বারান্দাতে একদিন হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন বড় মাসি। হাঁটুতে খুব ব্যথাও পেয়েছিলেন। ফাটলে ভরতি, বেশ এবড়ো-খেবড়ো একটা বারান্দা। সিমেণ্টের প্রলেপ ভেঙ্গে-চুরে ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছে। বড় মাসি তাঁর হাঁটুটাকে এক হাত দিয়ে চেপে ধরে আর খুবই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—এ কেমন একটা বারান্দা রেখেছিস মলিনা? আমাদের শ্রীনগরের গলির রাস্তাও যে এর চেয়ে...।

বড় মাসির হাঁটুতে হাত বুলিয়ে আর জলপটি বেঁধে দিয়ে মা যেন মুখ লুকিয়ে কথা বললেন—আগে এরকম ছিল না।

বড় মাসি—তাই তো শুনেছিলাম।

কাশ্মীরের শ্রীনগর দেখতে খুব সুন্দর। কত সুন্দর করে কাশ্মীরের কত গল্প বলতেন বড় মাসি। ডাল লেকের অত ঠাণ্ডা জলেও কী চমৎকার পদ্মফুল ফোটে। ঝিলমের জলের বাজে পমফ্রেটও তোমাদের এই গুপ্তিপাড়ার ফলুইয়ের চেয়ে ভাল স্বাদের মাছ। চেনারের পাতা যখন পাকে, তখন দূর থেকে দেখলে মনে হবে যে, গাছের মাথায় আগুন লেগেছে; পাকা পাতার রং যেন গনগনে লালচে আগুনের রং। তোদের মেসো আজকাল আর বাইরে বড় বের হয় না; আমিও না। গাড়িটা গ্যারেজে বন্ধ হয়ে পড়েই আছে। হ্যাঁ, মধু অবিশ্যি মাঝে-মাঝে গাড়ি নিয়ে এদিক-ওদিক একটু দৌড়ে আসে। ওরই বা সময় কোথায়? এত বড় ওষুধের দোকান, বছরে তিন লাখ টাকার বিক্রী। সব ঝঞ্ঝাট সামলাতে গিয়ে ছেলেটা হিমসিম খায়।

—মলিনা, ও মলিনা? গুপ্তিপাড়ার বাড়ি থেকে চলে যাবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ডাক দিলেন বড় মাসি। মা কাছে আসতেই একটা অদ্ভুত কথা বললেন।—না মলিনা, আমি কোন ভরসা দিয়ে যেতে পারলাম না।

—তুমি তো চিঠিতে লিখেছিলে যে, ওঁদের কোন দাবি নেই। শুধু মেয়ে দেখতে ভাল হবে, এ ছাড়া...।

—হ্যাঁ, লিখেছিলাম। কিন্তু তখন তো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, তোমাদের আর কোন কিছুই ভাল নয়। দত্তবাবুর মত টাকা-পয়সার মানুষ, আর কিছু না হোক, তিনি তো অন্তত ঘর বুঝে কাজ করতে চাইবেন।

কে জানে কেন, বাবা আর বড় মাসির কাছে এগিয়ে আসতে পারলেন না। বেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে বড় মাসির কথাগুলিকে শুনলেন, আর দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবার চোখ দুটো কী ভয়ানক শুকনো হয়ে উঠানের চালতে গাছের মাথায় একটা কাকের বাসার দিকে তাকিয়ে রইল। ছেঁড়া ছেঁড়া খড়, মরা কাঁটা-ঝোপের ডাঁটি, পচা বাঁশের কঞ্চি আর টেরা-বাঁকা একটা শুক্নো নেবুডাল দিয়ে তৈরী কাকের বাসাটা এলোমেলো হয়ে ঝুলছে।

তাই তো, এতক্ষণ চোখেই পড়েনি যে, টবের এই জাপানী হানার কুঁড়িটা ফুটেছে! কখন্ ফুটলো? নিশ্চয় আজই, এই সন্ধ্যাতেই, কিছুক্ষণ আগে। আজই বিকালে, স্নান সেরে নিয়ে এই ঘরে ঢোকবার আগে চোখে পড়েছিল, কুঁড়িটা সেই সকাল থেকে তখনও কুঁড়ি হয়েই রয়েছে।

হেসে ফেলে প্রতিভা। আজ ভাবতে গেলে শুধু হাসিই পায়। কে না কে এক দত্তবাবু, শ্রীনগরে থেকে কলকব্জার কারবার করেন, তাঁর ছেলের জন্যে একেবারে সত্যিকারের রাজবাড়ির মেয়ে চাই। বড় মাসি যে সেদিন কোন ভরসা না দিয়ে, আর বেশ একটু বিরক্ত হয়ে চলে গিয়েছিলেন, সেটা তো বলতে গেলে ভগবানের আশীর্বাদ। তা না হলে আজ এখানে এই টবের জাপানী হানার কাছে দাঁড়িয়ে আর হেসে হেসে অনুপমের উপরে রাগ করতে এত ভাল লাগতো কার?

কারও না। আর কারও সে সাধ্যিই হতো না। হতেই পারে না। হ্যাঁ, সব মেয়েই স্বামীকে ভালবাসে। কিন্তু সবাই কি ঠিক এ রকম কাণ্ড করে? সব সময় স্বামীর গা ঘেঁষে বসে থাকতে চায়, আর কিছু চায় না, পৃথিবীতে এমন মেয়ে আরও দুটি-তিনটি সত্যিই কি আছে? বিশ্বাস হয় না, আর কোন মেয়ে কখনও তার বরের ফটোর দিকে তাকিয়ে কথা বলে ফেলেছে, হেসে ফেলেছে, আর সেই ফটোকে বুকের উপর রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। সত্যিই একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার। যার সঙ্গে এক বছর আগে সামান্য একটু চেনা-শোনাও ছিল না, আজ তারই বুকের উপর মুখ রেখে কথা বলতে হয়।

এবেলা গুপ্তিপাড়াতে গেলে ওবেলা ফিরে আসতে হয়। মা রাগ করে বলেন, এটা তোরই একটা বাড়াবাড়ি। শেফালীদি বলেন—আমি তো আমার জীবনে কখনও দেখিনি, কোন মেয়ে বিয়ের পর একটা দিনও পার না হতেই তোমার মত একেবারে...।

একটু থেমে নিয়ে আর চোখ বড় করে শেফালীদি সেই নিতান্ত একটা পুরনো কথাকে এই সেদিনও আবার সবার সামনেই চেঁচিয়ে বলে দিলেন। ঠিকই, এতটা উচিত হয়নি। বিয়ের পরের দিনেই, ওরকম ঝকঝকে একটা সকালবেলাতে, ঘরের জানালাটাও যখন খোলা, তখন নিজের হাতে একটা সিঙাড়া তুলে নিয়ে অনুপমকে খাইয়ে দেওয়া! লোকের চোখে একটু বেশী বাড়াবাড়ি বলে মনে হবেই তো। কিন্তু উপায়ও তো ছিল না। ভদ্রলোকই যে জেদ ধরে ওই কান্ডটা করিয়ে ছাড়লেন। তারপর, তারপর তো এই বাড়ির জীবন। এখানে তো শেফালীদির মত কেউ নেই যে, খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দেবে। অনুপমেরও আর জেদ করে বলতে হয় না, খাইয়ে দাও। বেচারা কতবার একেবারে নিশ্চিন্ত মনে আর চোখ বন্ধ করে খাবার খেয়েছে। খাইয়ে দিয়েছে প্রতিভা। আর...মনে পড়তেই হেসে ফেলে প্রতিভা। একদিন কলার খোসাটাকে অনুপমের মুখের ভিতরে টুপ করে ফেলে দিয়েই সরে গিয়েছিল প্রতিভা। একটা থামের পিছনে লুকিয়েছিল। খোসাটাকে বার তিনেক চিবিয়ে নিয়েই কী ভয়ানক চমকে উঠলো বেচারা। চোখ মেলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রতিভাকে খুঁজলো। তারপর এক লাফে উঠে এসে আর থামের পিছনে লুকানো প্রতিভার একটা হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো, এই ট্রেচারির শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। ক্ষমা নেই, ছাড়াছাড়ি নেই।

ছাই শাস্তি। ওটা শাস্তিই নয়। চোখে মুখে আর কপালে ওই শাস্তি চিরকাল ঝরে পড়ুক। রুমাল দিয়ে কিংবা তোয়ালে দিয়ে মুছলেও যেন মুছে না যায়।

সেটা ছিল শ্রাবণ মাসের একটা দিন। আজ হলো পৌষ মাসের পয়লা। তার মানে চার মাস আগে। তারপর ঠিক ওভাবে আর শাস্তি পাওয়া হয়নি। সকাল বিকেল সন্ধ্যা, সব সময়, যখন তখন, তেষ্টা পাওয়া একটা ঝড়ের বাতাসের মত উতলা হয়ে ওঠা, আর, ঝুর ঝুর করে একগাদা শিউলি ঝরিয়ে দেওয়া। না, ইচ্ছেটা আর ওরকম করে একটা চোখখোলা বিকালবেলার আলোতে একেবারে উঠানের মাঝখানে হুটোপুটি করবার সুযোগ পায় না। কিন্তু সেজন্যে বেচারাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। বাড়িটা আর ফাঁকা বাড়ি নয়। চারদিক থেকে নানা কাজের তাড়া এসে অনুপমের অনেক সময় কেড়ে নিয়েছে। এই আসছি বলে চলে গেলেও তিন ঘণ্টা পরে এসে দেখা দেয়। বেশ রাগ হয় প্রতিভার যখন উপরতলার ঘরের জানালা দিয়ে সড়কের দিকে তাকিয়েই দেখতে পায়, মোটা মোটা কাগজপত্রের ফাইল হাতে নিয়ে চন্দ্র-সূর্য একসঙ্গে এবাড়ির গেটের কাছে এসে পড়েছেন।

এই যে বাড়ির এই বারান্দার চকমকে রঙীন মোজেয়িক, এটাও যেন একটা হঠাৎ-ব্যস্ততার সৃষ্টি। মাস তিনেক আগে হঠাৎ একদিন মিস্তিরী মজুর

আর গাদা-গাদা মালমশলা এসে আর মাত্র একমাস কাজ করে বারান্দার পুরনো সিমেণ্ট উপড়ে ফেলল; আর, একটা রঙীন শোভার প্রলেপ দিয়ে বারান্দাটার চেহারা ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

এই যে আজ এ বাড়ির প্রত্যেক ঘরে পালিশ করা সেগুনের ফার্নিচার ঝকঝক করছে, এ-সবও তো চার মাস আগের আবির্ভাব। প্রতিভার এই ঘরের পাশের ঘরে যে নতুন একটা স্টীলের সেফ নতুন কার্পেটের উপর শক্ত হয়ে বসে রয়েছে, সেটাও মাস দুই আগে এসেছে। আজও দুপুরবেলা, হঠাৎ যখন ঘুমটা ভেঙে গেল, তখন শুনতে পেয়েছে প্রতিভা, পাশের ঘরে চাবির শব্দ কট্ করে বেজে উঠলো, সেফের ডালা বন্ধ হলো। তারপর সে-ঘরের দরজার তালাতেও চাবির শব্দ বাজলো আর থেমে গেল। কাজের দরকারেই ও-ঘরের ওই ইস্পাতের সেফের কাছে এসেছিল অনুপম; আর কাজের দরকারের জিনিস নিয়েই ব্যস্তভাবে চলে গেল। চোখে না দেখলেও সবই বুঝতে পারে প্রতিভা।

ননীকাকা বলেন—তোমাকে দেখে আমার খুব আশ্চর্য লাগে বউমা। ছোট্ট চাঁদ; কিন্তু কত আলো! তুমি তো এ বাড়িতে প্রথম এসে নিজের চোখেই সব দেখেছো। আমার এই ঘরটা কী ছিল, আর হঠাৎ কী হয়ে গেল!

ননীকাকা, অনুপমের কাকা, প্রায় বছর হলো বাতের রোগে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে যে মানুষটা, তাকে দেখেও খুব আশ্চর্য হয়েছে প্রতিভা। খুব বুড়ো হয়েছেন ননীকাকা, দুই ভুরু একেবারে সাদা, চোখেও ঝাপসা দেখেন। সেই প্রথম দিনেই যখন এবাড়িতে এসে খুড়শ্বশুরকে প্রণাম করলো প্রতিভা, সেদিন তিনি প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন—মা'র মুখটি বড় চমৎকার, যেন জ্যোৎস্নায় ভরে রয়েছে। কে জানে, ঝাপসা-দেখা ওই চোখে তিনি প্রতিভাকে এত সুন্দর দেখলেন কেমন করে?

প্রতিভার কাজলবোলানো চোখ দুটো কিন্তু বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পায়, ননীকাকার ঘরের ভিতরে দুটো চামচিকে উড়ছে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, তবু একটা এঁটো থালা ঘরের মেজের একদিকে পড়ে রয়েছে। কেন? এবাড়িতে কি এঁটো থালা সরিয়ে নিয়ে যাবার মত একটা চাকরও কাজ করে না?

বাপ নেই, মা নেই, শুধু এক কাকা বেঁচে আছেন, অনুপমের জীবনের এই পরিচয় গুপ্তিপাড়ার বাড়ির কারও অজানা ছিল না। কিন্তু বাড়িটা ছেলের নিজেরই বাড়ি। আইন পড়ছে ছেলে; পাস করবার পর হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবে। বাপের কালে অবস্থা বেশ ভালই ছিল; এখন একরকম চলেই যায়। কি-যেন ভদ্রলোকের নাম, শেফালীদির ভাসুর, যিনি টালিগঞ্জে থাকেন, যিনি এই চন্দ্রবাবুর ভায়রা, তিনিই তো এই বিয়েটাকে ঘটিয়ে ছাড়লেন।

শেফালীদির বাবা নরেনকাকা, যিনি জ্ঞাতিকাকা হয়েও আপন কাকার চেয়ে কিছু কম আপন নন। নরেনকাকা তাঁর আপন বড়দাকে ডাকেন মেজদা, আর

প্রতিভার বাবা পরেশ চৌধুরীকে ডাকেন বড়দা। এ বিয়েতে নরেনকাকার খুব আপত্তি ছিল।

মা কিন্তু বিয়ের আগের দিনেও খুব কেঁদেছিলেন। আর বিয়ের দিনে বাবাও একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলেন। পা টিপে টিপে ঘরের ভিতরে ঢুকেই বললেন—আমার ওপর রাগ করিস না পতু। এর চেয়ে ভাল ঘর আর পেলাম না।

সেদিন বাবার হাতটা শক্ত করে ধরে হেসে ফেলতেই হয়েছিল, অথচ বুকের ভিতর থেকে যেন একটা অদ্ভুত ভয়ের কান্না ঠেলে উঠতে চাইছিল।

বয়স তো পঁচিশ পার হয়ে গিয়েছে, লেখাপড়া যা শিখেছে তা প্রায় কিছু না-শেখার কাছাকাছি একটা দশা। একটা হাজার টাকা খরচ করতে পারে এমন বাপের মেয়েও নয়। সে মেয়ের জন্য বড় ঘরের ছেলে পাওয়া যে সম্ভব নয়, এই সামান্য সহজ কথাটা বাবা খুব ভাল করে বুঝেও যেন সহ্য করবার শক্তি পাচ্ছিলেন না। কিন্তু ভাগ্যি ভাল, সেদিন খুব বুদ্ধি করে আর জোর করে হেসে ফেলে বাবাকে হাসিয়ে দিতে পারা গিয়েছিল।

আজ কী ভাবছেন বাবা? জানতে তো কিছু বাকি নেই। পুজোর সপ্তমীর দিনে গুপ্তিপাড়ার বাড়িতে যখন মা'র বিছানার উপর শুয়েছিল প্রতিভা, তখন নিজের কানেই কত স্পষ্ট করে শুনতে হয়েছে শুধু এক শানাই পার্টির জন্যই নরেন শেফালীর বিয়েতে সাতশো টাকা খরচ করেছিল। আর, আমার পতুর বিয়েতে মোট খরচ হয়েছে সাতশো তিরিশ টাকা। কিন্তু আজই শুনলে তো, নরেন কত দুঃখ করে কী সব কথা বলে গেল। শেফালীটা ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করবার টাকা চেয়ে বাপের কাছে চিঠি লিখেছে।

হায় ভগবান, এই কি শেফালীদির মত মেয়ের ভাগ্য! চমকে ওঠে বুকটা। শেফালীদির বর সমরবাবুর যে তিন-তিনটে মস্ত বড় অভ্রের খনি ছিল, দুটো গাড়ি ছিল, আর গিরিডি ছাড়া কলকাতাতেও একটা বাড়ি ছিল। দার্জিলিং-এ একটা বাড়িকে যেন চিরকালের ভাড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন সমরবাবু। গরমের অন্তত তিনটে মাস শেফালীদিকে দার্জিলিংয়েই থাকতে হতো। কারণ, গরম বাড়লেই শেফালীদির মাথার সেই পুরনো জ্বালার কষ্টটা বেড়ে যায়; ভেজা তোয়ালে দিয়ে মাথা জড়িয়ে রেখেও ছটফট করে আর কেঁদে ফেলে শেফালীদি। সেই শেফালীদি আজকাল নাকি গিরিডির ওই বাড়িতেই বোশেখ মাসের দুপুরেও নিজেই কুয়োর জল তোলে। শুধু ওই বাড়িটাই আছে, আর সব গেছে।

—কিন্তু আমাদের পতুর কাণ্ডটা দেখলে তো, মলিনা। আমি তো আশা করিই নি, কেউই বোধহয় আশা করেনি যে, এক বছরের মধ্যে তোমার মেয়ের ভাগ্যটা এমন সুন্দর একটা ইন্দ্রাণীর ভাগ্য হয়ে যাবে।

বাবা বলছেন, মা শুনছেন। দুজনেই খুশি হয়ে হাসছেন, কিন্তু মা আজ আর সেই কথাটা বলছেন না, যে-কথাটা কতবার বলে বলে শেফালীদিকে বুঝিয়েছেন—টাকা-পয়সাতে নয় শেফালী, স্বামীর ভালবাসাতেই মেয়েমানুষ ইন্দ্রাণী হয়।

বালিশে মুখ গুঁজে মুখের হাসিটাকে লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে প্রতিভা। মা নিশ্চয়ই জানেন না, জানবেনই বা কেমন করে যে, আজ নয়, সেই সেদিনেই, বিয়ের রাতেই বাসরঘরের বাতির কাছে দাঁড়িয়ে যখন তাঁর মেয়ের স্বামীর হাত দুটো হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে তাঁর মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, তখনই ইন্দ্রাণী হয়ে গিয়েছিল তাঁর মেয়ে। কত ভাল লেগেছিল একেবারে অচেনা একটা মানুষকে।

বাগবাজারের এই বাড়িতে দুপুর বেলার রোদে উঠোনের এককোণের কলতলার কাছে বসে যে-মেয়ে একটা বছরের আটটা মাস রোজই কাপড় কেচেছে, সে মেয়ে কিন্তু সেদিনও নিজেকে একটা দুর্ভাগ্যের অ-ইন্দ্রাণী বলে মনে করেনি। কেউ না জানুক, অন্তত অনুপম জানে, আর ননীকাকাও জানে, কোন সংসারে প্রথম এসেই কোন নতুন বউ কখনও এভাবে খাটে না। অন্তত একটা দুটো মাস একটু বেশি সাজে, একটু বেশি হাসে, আর একটু বেশি বসে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু গুপ্তিপাড়ার পরেশ চৌধুরীর মেয়ে প্রতিভার প্রাণটা যেন এ-বাড়িতে খাটবার জন্যে তৈরী হয়েই এসেছিল। দুদিনের মধ্যেই খুড়শ্বশুর ওই ননীকাকার ঘরের চামচিকা তাড়িয়ে, যত কালি-ঝুলি আর ময়লা নিজের হাতেই ধুয়ে-মুছে সরিয়ে, ঘরের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছিল কে?

বাণীদি সেদিন মুখ টিপে হেসে হেসে যে-মেয়েকে গুপ্তিপাড়ার রাজ-বাড়ির মেয়ে বলে ঠাট্টা করেছিল, সেই মেয়ে।

যে-বাড়িতে কোন মা মাসী খুড়ি জেঠি নেই, একটা বয়স্থা মেয়েও নেই, সে-বাড়িতে নতুন বউ যখন আসবে, তখন বরণডালাটা তুলে ধরবে কে? একটা আলপনা আঁকবার, একটু উলু দেবার জন্যেও তো কাউকে চাই। তাই এসেছিলেন বাণীদি; অনুপমের মামার মেয়ে, বর্ধমানে থাকেন আর মেয়ে-স্কুলে পড়াবার চাকরি করেন, যাঁর স্বামী দু' বছরেরও বেশি হলো যুদ্ধে চলে গিয়েছেন, মাত্র পাঁচটি দিন এবাড়িতে ছিলেন বাণীদি। কিন্তু বাণীদি থাকাতে নতুন বউয়ের কী যে সুবিধা আর কত যে যত্ন হয়েছিল, তা শুধু ভগবানই জানেন। সারা দিনে পাঁচবার চা খাওয়া বাণীদির অভ্যাস। হ্যাঁ, নতুন বউই পাঁচবার চা তৈরী করে বাণীদির ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। বাণীদির সঙ্গে একজন কাজের মানুষও এসেছিল, তাঁর ঝি, কাঞ্চনী। সেই কাঞ্চনীর জন্যেও দিনে তিনবার পান সেজে দিয়েছিল নতুন বউ।

বাণীদি বোধ হয় জানেন না যে, তাঁর সেই ঠাট্টার কথাটা কিন্তু খুব মিথ্যে

একটা ঠাট্টা নয়। গুপ্তিপাড়ার পরেশ চৌধুরীর সেই ভয়ানক ফাটলধরা করুণ চেহারার বাড়িটার পিছনদিকের যে বাগানে আজ শুধু কয়েকটা চালতে গাছ আর মরা খেজুর গাছের ধড় দাঁড়িয়ে আছে, তারই নাম রাজার বাগান। সত্যিই, সেই বিখ্যাত জমিদার রাম চৌধুরী, যিনি গঙ্গার জলে বাইচ খেলার আনন্দে প্রতি বছর পাঁচ হাজার টাকা খরচ করতেন, তাঁরই নাতি পরেশ চৌধুরী। রাম চৌধুরীর ছেলে বিজয় চৌধুরী ছিলেন আরও বড় শখের মানুষ। যে-বছরে কোন লাট সাহেব আসামের জঙ্গলে গিয়ে হাতিখেদার আনন্দ নিতেন, সে-বছরে বিজয় চৌধুরীও তাঁর নিজের দল-বল সঙ্গে নিয়ে আসাম যেতেন, আর হাতিখেদার উৎসবে দশটি হাজার টাকা খরচ করে ফিরে আসতেন।

বাণীদি নিশ্চয় এসব গল্পের একটি কথাও কোনদিন শোনেননি। তাই ঠাট্টা করেছেন। কিন্তু সে ঠাট্টার কথা শুনে চোখ ছলছল করবে, এমন পানসে চোখ নয় প্রতিভার। তাই হেসে হেসে বলতেও পারে—আপনি আরও কয়েকটা দিন থাকুন বাণীদি।

বাণীদি হাসেন। তাহলেই হয়েছে। শেষে আমাকে বিনা চিনির চা খেয়ে বিদায় নিতে হবে। সেটা কি ভাল হবে?

নতুন বউয়ের চোখ দুটো সত্যিই ভয়ানক বোকা দুটো চোখের মত অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে।

বাণীদি বলেন—বুঝলে না?

প্রতিভা—না।

বাণীদি—জিজ্ঞাসা করি, অনুদা কি বিনা পয়সাতে চিনি পেয়ে থাকেন যে, তুমি আমাকে রোজ পাঁচবার মিষ্টি চা খাওয়াবে!

হাসতে চেষ্টা করে প্রতিভা—আপনি কিন্তু আপনার দাদাকেই মিছিমিছি ঠাট্টা করলেন।

কোন কথা বললেন না বাণীদি, শুধু প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাণীদির সেই চমৎকার কালো চোখের তারা দুটো শুধু একবার কেঁপে উঠলো, আর ভুরু দুটোও একটু কুঁচকে গেল।

এই এক বছরের মধ্যে বাণীদি আর এ-বাড়িতে আসেননি। ভুল ক'রে একটা গল্পের বই ফেলে রেখে গিয়েছেন; কিন্তু একবার একটা চিঠি দিয়েও খোঁজ নিলেন না, বইটা আছে কি না। আছে বইটা; প্রতিভারই ঘরের আলমারির একটা তাকের অনেক বইয়ের মধ্যে বাণীদির সেই বই এখনও আছে।

ননীকাকার ঘরের পাশের ঘরটা সত্যিই বইয়ের ঘর। কত রকমের ভাষার বড় বড় বই। এই বইয়ের ঘরের ধুলো-ময়লা সরিয়ে ঘরটাকে একটা জীবন্ত চেহারা এনে দিয়েছিল যে, সেও তো সেই নতুন বউ, যে-মেয়ে ভাল করে লেখাপড়া করতে কোনদিন চায়ও নি, পারেও নি। পুরো দশটা দিন লেগেছিল;

বইগুলোকে রোদে দিয়ে আর ধুলোঝাড়া করে আবার সেই লম্বা-লম্বা কাঠের তাকের উপরে সাজিয়ে দিয়েছে প্রতিভা। আলমারির ময়লা কাচগুলিকে ঘষে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। এখন এই ঘরে আলো জ্বলে উঠলে ননীকাকা তাঁর ঝাপসা-দেখা চোখেই স্পষ্ট দেখতে পান, ঝকঝক করে হাসছে তাঁর সারা জীবনের আদরের সম্পদ এই বইগুলি।

দাদার সঙ্গে হাওড়াতে হঠাৎ একদিন অনুপমের দেখা হতেই অনুপম খুব অনুনয় করে বলেছিল, সময় করে একবার আমার এখানে আসবেন। তাই দাদা একদিন এসেছিলেন। হেসে হেসে অনেক কথা বলেই হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গেলেন দাদা। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর ব্যস্তভাবে বললেন—কই তোর চা? একটু তাড়াতাড়ি কর।

তিন চুমুকে চা শেষ করে দিয়েই দাদা বললেন—খুব নাম কেনবার চেষ্টা করছিস বুঝি?

যে বোন তার দাদার একটা রুমাল শেলাই করে দিতে কুঁড়েমি করে তিনটে দিন পার করে দিত, সে বোন আজ এই বাড়িতে কত মন লাগিয়ে আর কত ব্যস্ত হয়ে মোটা সূঁচ চালিয়ে ছেঁড়া আসন সেলাই করছে; দেখতে পেয়ে দাদার মনে ওরকম একটা সন্দেহ হবেই বা না কেন?

হাসতে চেষ্টা করছেন দাদা। যেন মনের সন্দেহটাকে জোর করে হাসিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু কপালের একটা রগ ফুলেও উঠছে। ওটা হলো দাদার কড়া মেজাজের সেই ভয়ানক রাগের রগ। শেফালীদির বাবা নরেনকাকা বলেন, ওটা হলো গুপ্তিপাড়ার এই চৌধুরীদের বংশধারার একটা মেজাজের রগ।

লিলুয়ার রেল-কারখানার সাহেবটার মুখের উপর ঘুষি চালাবার আগে দাদার কপালের ওই রগটা ঠিক ওইরকম করে ফুলে উঠেছিল। সাহেবটা দাদাকে খুব বিশ্রী একটা কথা বলেছিল—ইউ ড্যাম চীট, ফাঁকিবাজ; ডিউটিসে ভাগ্তা হ্যায়, আওর ছোকরি লে কর ঘুমতা হ্যায়?

ঠিকই, সেদিন কাজে যাননি দাদা। চল পতু, বালীতে জনা পিসিমা'কে একবার দেখে নিয়ে তারপর বেলুড়ের মন্দির দেখে আসি। তাই তো, ঠিক বালী স্টেশনেই সাহেবটার সঙ্গে দাদার একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। দাদারই উপরওয়ালা এক ফোরম্যান সাহেব।

দাদা কিন্তু পরের দিন অফিসে গিয়েও কোন কৈফিয়ৎ দিতে রাজি হননি, মাপ চাওয়া দূরে থাক। চাকরি গেল দাদার, তিন বছরের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের নব্বই টাকা, আর এক মাসের মাইনের পঞ্চাশ টাকা, সবই কেড়ে রেখে দিল—বড়সাহেবের হুকুম। বাড়িতে এসে হাঁপ ছাড়লেন আর হেসে ফেললেন দাদা—দেখলি তো, আমার একটা ঘুষির দাম কত? এক'শো চল্লিশ টাকা।

বাবাও হেসে ফেললেন—ইংরেজের রাজত্বে ইংরেজের মুখের উপর এত চমৎকার একটা দেশী ঘুষি; দামটা কম কেন হবে?

কিন্তু বোনের বাড়িতে এসে দাদার রগ আবার রাগ করে ফুলে ওঠে কেন? কে জানে কেন! দাদার চোখ দেখে তো কিছুই বুঝতে পারা যায় না। সিগারেটে জোরে একটা টান দিয়েই আর গলার স্বর বেশ গম্ভীর করে কথা বললেন দাদা—তোর হাতের আঙুলে অত বড় একটা কাটা দাগ কেন রে? বঁটিতে আঙুল কেটেছিস? মনে হচ্ছে, দু'হাতে ঝাঁটা চালিয়ে উঠোন-টুঠোনও ধুচ্ছিস।...আচ্ছা, আমি এখন চলি।

বোনের ভাগ্যের কথা ভেবে দাদার কপালে সেই কড়া মেজাজের রগ আজ আর নিশ্চয় ফুলে ওঠে না; লজ্জা পেয়ে শান্ত হয়ে গিয়েছে। আজ তো দাদা জানেন যে, এ বাড়িতে এখন ঝি-চাকর-রাঁধুনী নিয়ে মোট চারটে কাজের লোক খাটছে। দাদার সেই বোন আজকাল প্রায় রোজই টবের জাপানী হানার কাছে দাঁড়িয়ে এই এক বছরের জীবনের যত আশ্চর্যের কথা ভেবে ভেবে পুরো একটি ঘণ্টার সময় পার করে দেয়।

কিন্তু দাদাকে বোধ হয় বোঝাতে পারা যাবে না যে, দাদার বোন আজ এ বাড়ির এই মোজেয়িকের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে যেমন সুখী; সেদিন এ বাড়ির সেই অভাবের উঠানে দাঁড়িয়েও এর চেয়ে এমন কিছু কম সুখী ছিল না। হ্যাঁ, একটা কথা ভাবতে খুবই ভাল লাগে যে, তোমাদের মনে আর সেই সন্দেহ ও দুশ্চিন্তার কষ্ট নেই যে, পতু বোধ হয় মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখে আর জোর করে হাসে। দাদার কাছে মুখ খুলে বলা যায় না, তাই সেদিন বলা সম্ভব হয়নি যে, একজনকে মনে-প্রাণে ভাল লেগে গেলে, তার কোন অভাবকেও আর অভাল লাগে না।

তবে বউদির কাছে মন খুলে বলে দিতে পারা যায়; সত্যি বউদি, আজকাল ভদ্রলোকের হাতের কাছে যখন ডিশ ভরতি করে মাছের ফ্রাই তুলে দিই, তখন মনটা যেন নতুন একটা শান্তিতে ভরে যায়। এতদিন তো শুধু পেঁয়াজ ভাজা দিয়ে আটার দুটো রুটি খেত আর কাজের চেষ্টায় বের হয়ে যেত। দেখতে সত্যি খুব কষ্ট হতো, বউদি।

মার কাছে লেখা আমার চিঠি থেকে তুমিও নিশ্চয় জেনেছো বউদি; আমার অনেক নতুন জিনিস হয়েছে। তার মধ্যে একটা জড়োয়া সেটও আছে। খাঁটি মুক্তোর কাজ করা জিনিস। কত খুশি হয়ে কিনে এনেছেন ভদ্রলোক। আমিও খুশি হয়েছি। আশাও করিনি, চাইওনি, তবু পেয়েছি। এত খুশি হয়েছিলাম যে হাসতে গিয়ে চোখ দুটো জলে ভরে গিয়েছিল।

ফুটলি কেন আপন মনে! না, আর গুন-গুন করে গান করবার সময় নেই। জাপানী হানার গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। বারান্দার

ওদিকের ওই সিংহ-আয়নার মাথার কাছে দেয়ালের ঘড়িতে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে; ছ'টা বেজে গিয়েছে।

তবে তো একটু ভুল হয়েই গিয়েছে। ননীকাকা যে ঠিক ছটার সময় এক গেলাস বার্লি খান। সুধার মা'র কি সময়জ্ঞান আছে? ননীকাকার ঘরে বার্লি পৌঁছে দিয়ে এসেছে তো? একবার দেখে আসতে হয়।

কিন্তু ঘরের দরজায় কপাটে টোকা দিয়ে চলে গেলেন যে ভদ্রলোক, তিনি এখন বাড়িতে আছেন তো? না, চন্দ্র-সূর্যের সাথী হয়ে বাইরের কাজের আকাশে পাড়ি দিয়েছেন?

এগিয়ে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় প্রতিভা। হেসে ফেলে, চিরুনিটা হাতেই রয়ে গিয়েছে। চোর ধরা দিল না, চোরের মাথায় চিরুনিটা দিয়ে জোরে একটা টোকা দেবার সুযোগও পাওয়া গেল না।

ঘরে ঢুকে চিরুনিটাকে আয়নার টেবিলে রেখে দিতে গিয়েই বুঝতে পারে প্রতিভা, পাখির বাসার মত ওরকম একটা উসকো-খুসকো মাথা নিয়ে রান্না-ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই রাগ করে কথা বলবে সুধার মা। শুনতে বেশ ভাল লাগে, ঠিক মা'র মত রাগ করে ধমক দেয় সুধার মা—দেখে মনে হয়, যেন ঝড় গিলে খেয়েছো, তা না হলে মাথাটার অমন ছিরি হবে কেন?

কিন্তু শুধু সুধার মা'র কথার ভয়ে নয়, আর-একজনের দুই চোখের একটা আশার ভয়েও একটু সাবধান থাকতেই হয়। কী ভাববেন ভদ্রলোক, যদি দেখতে পান, এত সুন্দর করে সাজানো ঘরের মধ্যে একটা উসকো-খুসকো মাথা ঘুরে বেড়াচ্ছে? দুপুরবেলার পরা শাড়িটা এখনও পরেই আছে। ময়লা নয়, কিন্তু কুঁচকে গিয়েছে তো! যখন-তখন বিছানায় গড়াগড়ি দিলে কোন্ শাড়ি না কুঁচকে যায়?

সাজলে একটু ভাল দেখায়। তবু সাজবে না; অভিযোগের ভাষাটা যেন গুপ্তিপাড়ার বাড়ি থেকে বাগবাজারের এই বাড়িতেও, ওই সুধার মা'র মুখে এসে ঠাঁই নিয়েছে। বউদি বলেন, তোমার মত মেয়েকে সাজতে হলে কি ঢাকাই-বেনারসী দরকার হয়? না, হীরের দুল দোলাতে হয়? না, লিপস্টিক দরকার হয়? তবু বলছি, খোঁপাটাকে একটু ভাল করে বাঁধ। ওতেই হবে, আর বেশি কিছু দরকার হবে না।

তবে অন্তত খোঁপাটাকেই একটু ভাল করে বাঁধা যাক। চিরুনিটাকে হাতে তুলে নেয় প্রতিভা।

ঘরের দরজার কপাটের উপর টোকা পড়ে। টক্ টক্ টক্।

চমকে ওঠে, কিন্তু হেসেও ফেলে প্রতিভা। বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান! না, আর নয়। আর বোকার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়। হাতে হাতে ধরে ফেলাই উচিত।

পা টিপে টিপে দরজার কাছে এগিয়ে এসেই দু'হাতের টানে ভেজানো কপাট দুটোকে খুলে দিয়েই হেসে ওঠে প্রতিভা—গুড ইভনিং স্যার!

হাসির শব্দটা কিন্তু সেই মুহূর্তে ভয় পেয়ে চাপা আর্তনাদের মত গুমরে ওঠে।—এ কি? আপনি এখানে কেন?

—অনেকক্ষণ আপনার অপেক্ষায় বসে বসে, তার পর যখন দেখলাম যে আপনি এলেনই না, তখন মনে করিয়ে দিতে এলাম যে...।

প্রতিভা—আপনি কি কিছুক্ষণ আগেও একবার এখানে এসেছিলেন?

—কিছুক্ষণ আগে নয়। প্রায় আধ ঘণ্টা আগে। আপনি কোন সাড়া দিলেন না দেখে চলে গেলাম।

—কিন্তু আপনি এখানে এলেন কেন? প্রতিভার শান্ত চোখের দুই কালো তারা যেন জ্বলে জ্বলে কাঁপতে থাকে।

—না এসে উপায় কি?

প্রতিভা—খুব উপায় ছিল। আপনি রামপ্রসাদকে বললেই তো সে আমাকে খবর দিত যে, আপনি এসে বসে আছেন।

—রামপ্রসাদকে তো অনেক সময় ডেকেও পাওয়া যায় না।

প্রতিভা—বেশ তো, তাই বলে আপনার এখানে এসে খবর দেবার দরকার হয় না।

—তাহলে বলুন...।

প্রতিভা—না, আমি কিছু বলতে পারবো না। আপনি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন।

—আপনার শরীরটা আজ ভাল নয় মনে হচ্ছে।

প্রতিভা—না, খুব ভাল আছি।

—মন ভাল নয় বোধ হয়।

প্রতিভা—আপনি এখন তাহলে...।

—হ্যাঁ, যাচ্ছি। টবের এই ফুল বোধহয় জাপানী ফুল। নয় কি?

প্রতিভা—আপনি যান।

—লোকে জাপানী মেয়ের খোঁপারও কেন যে এত প্রশংসা করে, বুঝি না। জাপানী খোঁপার মধ্যে একটুও আর্ট নেই; আছে শুধু কারিগরী। ভয়ানক চেষ্টা করা আর বাঁধা-ছাঁদা একটা কায়দার ধাঁধা। বরং বলতে হয়, এই জাপানী ফুলই হলো সত্যিকারের আর্ট। কী চমৎকার একগাদা উসকো-খুসকো শুঁয়ো, পাঁপড়িগুলো এলোমেলো আর রং যেন একটা খেয়ালের রং। কেউ যেন হঠাৎ খুশি হয়ে আর টোকা দিয়ে দিয়ে নানা রকম রঙের ধুলো এই ফুলের গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছে।

প্রতিভা—আপনি কিন্তু...।

—না না, আজকাল আমি আর ছবি-টবি আঁকি না।

প্রতিভা—আপনি মিছিমিছি এখানে এসে এত কথা বলছেন কেন? নীচে যান। আপনার বন্ধুর সঙ্গে যত ইচ্ছে কথা বলুন।

—বন্ধু তো বাড়িতে নেই।

প্রতিভা—তাহলে আপনিও বাড়ি যান।

—আমার অবিশ্যি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে অসুবিধে নেই।

প্রতিভা—অপেক্ষা করতে হয় নীচের ঘরে গিয়ে করুন।

—উপরতলার এই বারান্দাটা কিন্তু নীচের ঘরগুলোর চেয়ে অনেক ভাল। যেমন খোলা হাওয়া তেমনই, হ্যাঁ, সত্যি তো, খুব ফিকে একটা মিষ্টি গন্ধ যেন ফুরফুর করে উড়ছে। এটা কি...।

প্রতিভা—আপনি শিগগির চলে যান।

—এটা কি টবের কোন ফুলের গন্ধ? না, আপনার ঘরের ভিতরের একটা ধূপের গন্ধ?

প্রতিভা—আপনি এত বাজে কথা বলছেন কেন?

—অ্যাঁ? তা হলে কি আপনার এই খোঁপারই গন্ধ?

ফুলবনে সাপ। ভীরু পাখীর চোখ যেন একটা লিকলিকে ঘৃণ্য বিভীষিকার দিকে তাকায় আর ছটফট করে। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছটফট করে প্রতিভা; তার পরেই ছুটে গিয়ে বারান্দার রেলিংয়ের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে—রামপ্রসাদ।

—রামপ্রসাদ বাড়িতে নেই বোধহয়। কোন কাজের দরকার থাকলে আমাকেই বলুন।

—আপনি নীচে যান।

—যাচ্ছি, কিন্তু আপনি কি আমাকে এখন কিছু টাকা দিতে পারবেন?

প্রতিভা—টাকা? কেন?

—অনুপমের সঙ্গে তো দেখা হওয়া আর দুটো কথা বলা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। রোজই অপেক্ষায় বসে থাকি আর চলে যাই। এই তিন মাসের মধ্যে কোনদিন বলবার সুযোগ পেলাম না যে, আমার এখন কিছু টাকা দরকার।

প্রতিভা—কিসের জন্য টাকা চান আপনি?

—সেটা কি আপনি জানেন না?

প্রতিভা—আপনার বন্ধু বলেছিল, আপনি নাকি আমাকে পড়াবেন। কিন্তু আমি তো কবেই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি যে, আমি পড়বো না। আপনার বন্ধু কি সে-কথা আপনাকে বলেনি!

—না।

প্রতিভা—তবু সেটা বুঝে নিতে আপনার কোন অসুবিধে ছিল না।

—হ্যাঁ, বুঝতে অসুবিধে নেই। বুঝেছি। দেখলামই তো, এই তিন মাসের মধ্যে কোনদিনও আপনি পড়তে এলেন না।

প্রতিভা—তবু রোজই আসছেন কেন?

—আপনিও তো সেদিন তখন ওঘরে ছিলেন। আপনার সামনেই সব কথা হলো। মনে নেই আপনার?

প্রতিভা—মনে আছে।

—মনে নেই বোধহয়।

প্রতিভা—সব মনে আছে। আপনার বন্ধু বললে, আমি পড়ি বা না পড়ি, আপনাকে কিছু টাকা দেওয়া হবে।

—অনুপম বলেছিল, আমাকে রোজই আসতে হবে। আপনার যেদিন ইচ্ছে হবে, পড়বেন। যেদিন ইচ্ছে হবে না, পড়বেন না।

প্রতিভা—বেশ তো, উনি না হয় এই কথাই বলেছিলেন; একই কথা।

—আসল কথা হলো, অনুপম আমাকে সাহায্য করতে চায়। আপনি তো জানেন, অনুপম আমার অনেককালের বন্ধু।

প্রতিভা—জানি।

—আমি কিন্তু কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, জীবনে কোনদিন অনুপমের কাছে সাহায্য নেবার সৌভাগ্য আমার হবে।

প্রতিভা—সৌভাগ্য? ঠাট্টা করে বলছেন?

—ছি ছি; ঠাট্টা করবো কেন? আমি কাউকেই ঠাট্টা করি না, অনুপমকে তো নয়ই। আমাদের সেই অনুপম আজ আমাকে সাহায্য করবার মত অবস্থা পেয়েছে, এটা আমার সৌভাগ্য বইকি। তবু; কথাটা কি জানেন? উপায় থাকলে অনুপমের কাছ থেকে সাহায্য চাইতাম না, নিতামও না। অনুপমকে বিরক্ত করতে আমার সত্যিই বেশ খারাপ লাগে, বেশ কষ্ট হয়।

প্রতিভা—মনে হচ্ছে, আপনি আজ বেশিরকম কোন দরকারে পড়ে...।

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। শুনেছেনই তো, কী সাংঘাতিক ফেমিন দেখা দিয়েছে।

প্রতিভা—দুর্ভিক্ষ?

—হ্যাঁ, দুর্ভিক্ষ।

প্রতিভা—কোথায় দুর্ভিক্ষ?

—বাংলা দেশের প্রায় সব জায়গাতেই, এই কলকাতাতেও। লোক মরছে। ছেলে-মেয়ে বাচ্চা-কাচ্চা বুড়ো-বুড়ি, গাঁয়ের মানুষ কলকাতায় ছুটে আসছে। এলে হবে কি? এখানেও যে হাজার হাজার ঘরে উপোষ আর আধপেটা খাওয়া। কে কাকে খাওয়াবে? এর ওপর যদি কোন ভাগ্যবানের ঘরে একটা অদ্ভুত অসুখের মানুষ আধমরা হয়ে মেজের উপর শুয়ে পড়ে থাকে, তবে তাকে আর

কে বাঁচাতে পারে, বলুন?

প্রতিভা—ভগবান বাঁচাবেন। কিন্তু আপনি একটু স্পষ্ট করে বলুন, আপনি কার কথা বলছেন?

—আমার স্ত্রীর কথাই বলছি।

প্রতিভা—কিসের অসুখ?

—বুঝি না।

—ডাক্তার দেখাননি?

—একবার দেখিয়েছিলাম।

—ডাক্তার কী বললেন?

—সন্দেহ করলেন, গলার ভিতরে ঘা হয়েছে।

—চিকিৎসা ঠিক চলছে!

—ঠিক চলবে কি করে? একগাদা টাকা ছাড়া তো চিকিৎসা চলে না।

—টাকার জন্যে আপনি আপনার বন্ধুকে একটু ভাল করে বলুন।

—বলবো, কিন্তু আজই যে, অন্তত পঞ্চাশটা টাকা না হলে আমার কোন কিছুই চলবে না। আপনিই দিন। অনুপম আমাকে যে-টাকা দেবে, তা থেকে যেন এই পঞ্চাশ টাকা কেটে রাখে।

প্রতিভা—আমার কাছে তো টাকা থাকে না।

—তাহলে...সত্যিই যে একটা অদ্ভুত অবস্থায় পড়তে হলো।

প্রতিভা—আপনি অন্য কোথাও গিয়ে চেষ্টা করে দেখুন।

—অগত্যা তাই করতে হবে। কিন্তু তাতে কিছু হবে বলে মনে হয় না।

প্রতিভা—তাহলে আপনার বন্ধুর জন্যে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

—কিন্তু আর বেশি অপেক্ষা করা উচিত হবে না।

প্রতিভা—একথা কেন বলছেন?

—আজ বিকেল থেকেই মানুষটার অবস্থা বেশ সঙগীন হয়ে উঠেছে। কথা বলতে পারছে না। এখন একজন ভাল ডাক্তারকে না ডাকলে খুব ভুল করা হবে।

প্রতিভা—তবে তো আপনার আর এখানে কারও অপেক্ষায় থেকে সময় নষ্ট করা একটুও উচিত নয়।

—একটুও উচিত নয়। আমার আর একটা মিনিটও অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছে না। তাই বলছি; আপনিই বরং চেষ্টা করে কারও কাছ থেকে পঞ্চাশটা টাকা যোগাড় করে আমাকে দিন। আমাকে ধার দিন। এই টাকা আমি নিশ্চয় একদিন আপনাকে ফেরত দেব, যদিও তাতে ঋণ শোধ করা হবে না।

প্রতিভা—আপনি আমাকে খুব বিপদে ফেললেন।

—একবার দেখুন চেষ্টা করে।

প্রতিভা—দেখি। আপনি ততক্ষণ নীচের তলার ঘরে গিয়ে বসুন।

—কাইন্ডলি একটু তাড়াতাড়ি করবেন।

না, আর দেরি করে না প্রতিভা। শুধু একটা মিনিট, চুপ করে সেই মোজেয়িকের বারান্দার উপরে সেখানেই দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, সিংহ-আয়নার চকচকে বুকের উপরে কার্পেটপাতা একটা চমৎকার সিঁড়ির ধাপ ধরে এক-জোড়া রোগা-রোগা পা একজোড়া ছেঁড়া-ময়লা চটিজুতোর সঙ্গে ব্যস্তভাবে নেমে চলে গেল। তারপর প্রতিভার ভাবতে শুধু আরও একটা মিনিট, তার বেশি নয়।

ঘরের ভিতরে ঢুকে একটা বাক্স খোলে প্রতিভা। রেশমী সুতোর লেস দিয়ে ঢাকা ছোট একটা রঙীন স্টীল-ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের ভিতরে তিন-থাক শাড়ির সাজানো স্তূপের তলায় হাত চালিয়ে মোষের শিঙের একটা কৌটা বের করে। বিয়ের সময় পাওয়া যত আশীর্বাদীর টাকা, মোট একচল্লিশ টাকা যে এই কৌটার ভিতরে এখনও আছে, সে-কথা মনে পড়তে ওই এক মিনিটই সময় লেগেছে, তার বেশি নয়।

ও কে? কে এল? ভালই হলো। না ডাকতেই সুধার মা এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। কৌটার ভিতরে একটি টাকা রেখে দিয়েই সুধার মা'র মুখের দিকে তাকায় প্রতিভা।

সুধার মা—ওবেলার দুধ সবই তো পড়ে রয়েছে। আমি বলি, ক্ষীর করে রাখি। নইলে নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি কি বল?

প্রতিভা—বলছি। তার আগে তুমি এখুনি নীচে গিয়ে মাস্টার মশাই অজয়বাবুকে এই চল্লিশটা টাকা দিয়ে চলে এস।

ননীকাকা তাঁর বইয়ের ঘরে একটা চেয়ারে বসে টেবিলের উপরে রাখা একটি খোলা বইয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন।

যুদ্ধের ভয়ে ভীরু কলকাতার একটি নিষ্প্রদীপ রাত। ঘরের ভিতরের আলোটাও যেন একটা মিটমিটে ভীরু তারা। ননীকাকার ঝাপসা-দেখা যে দুই চোখ দিনের বেলার রোদের আলোটাকেও ভাল করে দেখতে পায় না, দিনটাকে একটা মেঘলা দিন বলে ভুল করে, সেই দুই চোখ কত বড়-বড় হয়ে একটা বইয়ের লেখা পড়বার চেষ্টা করছে।

প্রতিভা ডাক দেয়।—বার্লি খেয়েছেন, কাকা?

—খেয়েছি। কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্তঃ।

—আপনি তো বেশ পড়তে পারছেন, কাকা। একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।

—তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি একটু দেখে নিয়ে বলে দাও তো, বউমা; ঠিক বইটা ধরেছি কিনা।

এগিয়ে আসে প্রতিভা। বইটার দিকে তাকায়।—এটা একটা ইংরেজী বই।

—অ্যাঁ? ইংরেজী বই।

—আপনি তবে কী মনে করেছেন?

—আমি মনে করেছি, কেনোপনিষদ।

হেসে ফেলেন ননীকাকা। হাত তুলে চোখ দুটোকে একবার ঘষে নিয়ে যেন একটু লজ্জা-পাওয়া কুণ্ঠিত স্বরে কথা বলেন—ভুল করেছি। আন্দাজটা ভুল করেছে। বইয়ের মলাটের উপর হাত বুলিয়ে কতটুকুই বা বুঝবো, বল? মলাটের মাঝখানে পোকা-খাওয়া একটা গর্ত, তাই মনে হয়েছিল, ওটাই বুঝি কেনোপনিষদ। যাই হোক, ইংরেজী বইটার নামটা কী, বউমা?

বইটার দিকে তাকিয়ে পড়তে চেষ্টা করে প্রতিভা। কিন্তু সারা মুখ যেন একটা করুণ লজ্জায় ভরে গিয়ে লালচে হয়ে যায়। আঁচল দিয়ে মুখ মোছে প্রতিভা।—বুঝতে পারছি না।

—লেখকের নামটা বল।

—বুঝতে পারছি না।

—কী লেখা আছে পড়। অক্ষরগুলি এক এক করে পড়ে যাও।

—এফ আই সি এইচ টি ই।

—ফিখ্‌টে। তাই বল। ওটা জার্মান ভাষার বই। ও বই আর পাওয়া যায় না, বউমা। ভাগ্যি ভাল, খুব বুদ্ধি করে, সেই কবে, প্রথম যুদ্ধের ঠিক এক বছর আগে জার্মানী থেকে বইটা আনিয়েছিলাম। কিন্তু বেচারা ফিখ্‌টেকেও তাহলে পোকাতে কেটেছে।

প্রতিভার মুখের কথাগুলি আরও করুণ হয়ে বিড়বিড় করে।—বোধহয় অনেক দিন ধরে বইগুলি অযত্নে পড়েছিল। তা না হলে পোকাতে কাটতো না।

—খুব সত্যি কথা।

—আপনার চোখ ভাল থাকলে বইগুলির এত অযত্ন হতে পারতো না।

—খুব সত্যি কথা। কিন্তু একটা খুব মজার কথা কি জান? বইগুলির যেদিন একটা ভয়ানক রকমের অযত্ন হয়ে গেল, ঠিক সেদিনই আমার চোখের দৃষ্টিও হঠাৎ বেশ একটু ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন, ছানি পড়ছে। কিন্তু, বুঝতে পারি না, ঠিক সেদিন থেকেই ছানি পড়তে শুরু করলো কেন?

—বইগুলোর হঠাৎ একটা ভয়ানক রকমের অযত্ন হয়ে গেল কেন?

—সে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। আমার এইসব বই এই বাড়ির ওই বারান্দাতে একটা ঢিবি হয়ে প্রায় এক মাস ধরে পড়েছিল। একদিন বাইরে থেকে ঘরে এসে দেখি, বৃষ্টির জলে সব বই ভিজে গিয়েছে।

—কী অদ্ভুত কথা বলছেন!

—হ্যাঁ, তখন এই বাড়ির কোন ঘরে জায়গা ছিল না।

—কেন?

—নীচের তলার সব ঘর কারবারের যত জিনিসপত্রে ভরতি ছিল।

—কিসের কারবার?

—মেজদার, তোমার শ্বশুরের একটা চমৎকার ওষুধের কারবার। সে কারবারের সঙ্গে বড়দা'ও ছিলেন। নীচের তলার এইসব ঘর গাদা গাদা টিনের কৌটা আর শিশি-বোতলে ভরে ছিল। আর ছিল সরষের তেলের বড় বড় পিপে। বোধহয় কলতলার কাছে এখনও নাম-লেখা একটা কাঠের বোর্ড পড়ে আছে।

—হ্যাঁ, দেখেছি ভয়ানক একটা নাম, আত্রেয় বাত-কালান্তক। কী ওটা?

—ওটাই তো বড়দা আর মেজদার কারবারের সেই ওষুধের নাম। এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ওই ওষুধের কথা জানতে পেরেছিলেন মেজদা। আর বড়দা জানতে পেরেছিলেন, ওই সন্ন্যাসী হিমালয়ের একটা গুহাতে থাকেন; গুহাটা হলো সেই অত্রিমুনির গুহা। কারবার খুব ভালই চলেছিল। বর্মা চীন আফ্রিকা থেকেও অর্ডার আসতো। কাজেই আমার বইগুলোকে জায়গা দিতে মেজদার যেমন খুব অসুবিধে হয়েছিল, তেমনই আমারও খুব অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু দোষটা আসলে আমারই; কোন খবর-টবর না দিয়ে হঠাৎ বস্তাবন্দী করা একগাদা বই দুটো ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে কারও বাড়িতে এসে দাঁড়ালে, তাকে খুবই অসুবিধেয় ফেলা হয় না কি?

—বুঝলাম না, কাকা।

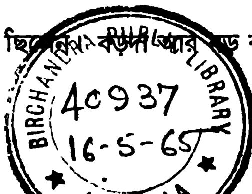
—আমি কানপুরের স্কুলে মাস্টারী করতাম। একটানা পঁচিশটা বছর মাস্টারী করেছি। সে পঁচিশ বছরের মধ্যে কোনদিনও কলকাতায় আসিনি। শুধু চিঠিতে জেনেছি, কলকাতার বাড়ির সবাই একরকম ভালই আছে। হঠাৎ একদিন মনে হলো, এবার বাড়ি ফিরে যাই।

—কাকিমা তখন...।

—না না, তোমার কাকিমা তখন কোথায়? সে মহিলা তো সেই কবেই, বিয়ের পর ছ'টা মাস পার না হতেই ছুটি নিয়ে সরে পড়েছিলেন। শুধু একা আমি, আর আমার এই বইগুলি। কানপুরের জীবনটা ভালই কেটেছিল।

—এবাড়িতে তখন...।

—এবাড়িতে তখন সবাই ছিলেন। বড়দা আর বড় বউঠান ছিলেন। তোমার



শ্বশুর ছিলেন, শাশুড়ী ছিলেন, আর অনুও তখন...হ্যাঁ, আমি যেদিন এখানে এলাম, অনুর বয়স তখন আট-দশ বছর তো হবেই।

—যাকে বলে, বেশ জমাট সংসার।

ননীকাকা হাসতে থাকেন—নিশ্চয়, কিন্তু আমি যেমন হঠাৎ একদিন বোকার মত এখানে এসে উঠেছিলাম, তেমনই হঠাৎ একদিন বোকার মত চলেও যাচ্ছিলাম।

ননীকাকার চোখ দুটো চিকচিক করে। মনে হয়, কান পেতে কি যেন শুনতে চেষ্টা করছেন।—কিসের শব্দ, বউমা? গঙ্গার জলের শব্দ বলে মনে হচ্ছে।

প্রতিভা—হ্যাঁ।

ননীকাকা—ঘরের সব জানালা বোধহয় খোলা।

প্রতিভা—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি শেষে...।

ননীকাকা—কিন্তু চলে যাওয়া আর হলো না, বউমা। দুটো ঘোড়ার গাড়ি ডেকেছিলাম। দু' তিন বস্তাবন্দী বই গাড়িতে তুলেও ফেলেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ উপরতলা থেকে নীচে নেমে এলেন মেজ বউঠান, তোমার শাশুড়ি। মেজ বউঠানের চোখে সে কী রাগ। বললেন—আপনি চলে যাচ্ছেন কেন? কে আপনাকে যেতে বলেছে? আপনি যেতে পারবেন না। কখ্খনো না।

আবার হেসে ফেললেন ননীকাকা।—আমাকে ঠিক এই ভাষাতে ধমকে দিয়ে চলে গেলেন মেজ বউঠান। আমিও চুপ করে এই ঘরেই বসে সেদিন ঠিক এই রকম গঙ্গাজলের শব্দ শুনেছিলাম। মনে হয়েছিল, গঙ্গাজলের শব্দটাই যেন আমাকে ধমকে দিয়ে চলে গেল।...অরেল স্টাইনের লেখা ছোট্ট একটা বই আছে, গ্লেসিয়ার গঙ্গোত্রী। আজ নয়; কাল সকালে এসে বইটাকে একবার খুঁজে বের করে দিও তো।

প্রতিভার চোখে-মুখে আবার সেই করুণ লজ্জার লালচে আভা চমকে ওঠে।—আমি কিন্তু...আমি শুধু চেষ্টা করবো কাকা। কিন্তু খুঁজে পাব কিনা, জানি না।

ননীকাকা—তুমি বোধহয় ভবতোষবাবুর নাম শোননি। এবাড়ির এই পাশের বাড়িটাই তাঁর বাড়ি। তিনি এখন আর নেই। তিনি মেজদার ওপর কেমন-যেন বেশ-একটু অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবু তিনিও এই বাড়ির কত প্রশংসা করতেন। বলতেন, চমৎকার হাওয়া মহল।

প্রতিভা—কেন?

ননীকাকা—দেখছো তো, এবাড়িতে কত জানালা আর কত হাওয়া। গঙ্গাজলের শব্দ কত স্পষ্ট শোনা যায়। ওই শুধু এক বাত-কালান্তকের পাঁচ বছরের রোজগারে কত খুশী হয়ে বড়দা আর মেজদা এই বাড়ি তৈরী

করিয়েছিলেন। কিন্তু, কী আশ্চর্য। আমার এইসব বইয়ের মধ্যে কিন্তু একটা অদ্ভুত বই আছে, বউমা। নাগরী লিপিতে প্রথম ছাপা ঋগ্বেদ ও তার সায়নভাষ্য, ম্যাক্সমুলারের কীর্তি। প্রতাপগড়ের রাজাবাহাদুর আমাকে ওই বই উপহার দিয়েছেন। বড় দুর্লভ বই। হাজার টাকা হাতে নিয়ে ছুটোছুটি করলেও ওই বই আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

প্রতিভা—আপনার কি তবে এবাড়ির জন্যে...।

ননীকাকা—না না না। আমাকে এবাড়ির একটা ইঁটেরও দাম দিতে হয়নি। মামলাতে সাক্ষী দিতে গিয়ে কথাটাকে একেবারে স্পষ্ট করে আর চেঁচিয়ে বলে দিয়েছিলাম। শুনে কত খুশী হয়েছিলেন মেজদা।

চমকে ওঠে প্রতিভা—মামলা?

ননীকাকা—হ্যাঁ, বউমা। বড়দা আর মেজদার মামলা। মাধব রায় ভার্সাস যাদব রায়। এই বাড়ির মালিকানা নিয়ে আর ওই চমৎকার আত্রেয় বাতকালান্তকের স্বত্ব নিয়ে মামলা। ভবতোষবাবু বলেছিলেন, হাওয়া মহলের মাধব রায় একটি খুব বিচক্ষণ মানুষ, যাদব রায় একটি খুব বুদ্ধিমান মানুষ, আর ননী রায় একটি গরু, মানুষই নয়।

ননীকাকা হো হো করে হাসেন, কিন্তু প্রতিভার চোখে যেন একটা আষাঢ়ে গল্পের করুণ আশ্চর্য থমথম করে।

হাসি থামাতে চেষ্টা করেন ননীকাকা—কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্তঃ? কেউ বলতে পারে না, বউমা। বলতে পারেও নি। সবাই শুধু অনুমান করেছে। আমিও তো কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

প্রতিভার মনের করুণ বিস্ময়টাও যেন জোর করে হাসতে চেষ্টা করে।—এত চমৎকার বাত-কালান্তকের শেষে এমন দশা হলো কেন?

ননীকাকা—কি করে বলি, বউমা? লোকে বলে, ওষুধের কারবারটা খুব জমে উঠতেই দুই ভাইয়ের মধ্যে মামলা বেধে গেল। আমি মনে করি, ওই চমৎকার ওষুধের কারবারটা ডুববে বলেই ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা বেধেছিল। জ্ঞান বল আর বুদ্ধি বল, কোনটাই তো বড়রকমের কোন জোর নয়। আসল জোর হলো, ওই প্রথম প্রাণ। শাঙ্করভাষ্যে যা-ই বলুক, আমি মনে করি, প্রথম প্রাণ মানে ভালবাসা, হৃদয়ের কাজ। জগতের সব চেয়ে বড় বিস্ময়। এ বিস্ময়ের কাছে অসীম আকাশটাও কোন বিস্ময় নয়। কিন্তু তুমি যদি জিজ্ঞেস কর, কেন এই বিস্ময়? এর কারণ কি? তা হলে, মাপ করো, বউমা। আমি কিছুই বলতে পারবো না।

কথা বলতে গিয়ে প্রতিভার গলার স্বর কাঁপতে থাকে।—আমি কিন্তু লেখাপড়া কিছুই শিখিনি, কাকা।

—বেশ করেছো। ওতে কিছু আসে যায় না।

—আপনি বলছেন, আমিও শুনছি। কিন্তু কিছু বোঝবার সাধ্যি আমার নেই।

—কার সাধ্যি আছে, বল? কারও সাধ্যি নেই।

—সুধার মা'কে ডাকি তাহলে, আপনার খাবার দিয়ে যাক্।

—হ্যাঁ দিয়ে যাক্। খাবার খাওয়ার জন্যে আমিই তো একা পড়ে আছি। আর সবাই চলে গেল। কত তাড়াতাড়ি সব খালি হয়ে গেল, বউমা। ওষুধের এত বড় কারবারটা কত হঠাৎ পড়ে গেল। আর, মামলার যেদিন রায় বের হলো, দুই ভাই-ই ওই কারবারের সমান লাভের মালিক, তখন আর লাভ বলতে কিছু ছিল না। ছিল শুধু ওই সাইনবোর্ড আর একটা ঘরভরা যত শূন্য শিশি ও বোতল।

খুব জোরে একটা হাঁপ ছাড়লেন ননীকাকা।—ছ'বছরের মধ্যে বিদায় নিলেন প্রথমে বড় বউঠান। তারপর মেজদা আর মেজ বউঠান। বড়দা চলে গেলেন কাশী। তাঁর মৃত্যুর খবর যেদিন পেলাম, সেদিন দুপুরবেলার ঝড়-বাদলের মধ্যে এই কাছেই কোথায় যেন একটা বাজ পড়েছিল। পাড়ার লোকে কিন্তু এই বাড়িতেই বাজ পড়েছে মনে করে ছুটে এসেছিল, ওই উঠানটা লোকের ভিড়ে ভরে গিয়েছিল।

প্রতিভা—কিন্তু তারপর এতদিন কি করে আপনাদের...।

ননীকাকা—কী জিজ্ঞেস করছো, কী করে দিন চললো? কে চালালো?

—হ্যাঁ।

—আমার ষাট টাকা পেনসন।

—তাহলে তো খুব কষ্টেই আপনাদের দিন কেটেছে।

—কিছুই না। আমার কোন কষ্টই ছিল না। তবে হ্যাঁ, অনুর বেশ কষ্টই হতো।

—আপনি বললেও বিশ্বাস করবো না। আপনারও নিশ্চয় খুব কষ্ট হতো।

—না। শুধু একবার সত্যি খুব কষ্ট বোধ করেছিলাম। অনুর কলেজের পরীক্ষার ফী জমা দিতে হবে। কাজেই ভবতোষের কাছে গিয়ে টাকা ধার চেয়েছিলাম। ভবতোষ বললেন, ঠিক আছে, একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। শুনে খুশী হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। আধ ঘণ্টাও পার হয়নি বউমা, রামানুজখানা হাতে নিয়ে সবেমাত্র বসেছি। তুমি তো জান রামানুজের পুণা এডিশন এখন আর পাওয়া যায় না।

—আমি কিছুই জানি না, কাকা। আপনি বলুন, তারপর কী হলো?

—দেখলাম, দুটো লোক এসে একেবারে আমার এই বইয়ের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। কাগজের ঠোঙার কারবার করে, দুটো লোক। ভবতোষ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চমকে ওঠে প্রতিভা—কেন?

ননীকাকা—পুরনো বইয়ের কাগজ ওজন দরে কিনে নিতে চায়।

প্রতিভা—আপনি কী বললেন?

ননীকাকা—বললাম, তোমরা যাও। তারপর বাক্স থেকে আংটিটাকে বের করলাম।

—কিসের আংটি?

—তোমার কাকিমা'র আংটি। শুধু ওটাই তো ছিল, আর কিছু ছিল না। সে মানুষটা ওর একটা ফটোকেও আমার কাছে রেখে যেতে ভুলে গিয়েছে। বুঝলে তো, বউমা।

—খুব বুঝেছি, আপনার আর কিছু বলতে হবে না।

—কী বুঝেছো?

—সেই আংটি বেচে আপনার ভাইপোর পরীক্ষার ফী জমা দেওয়া হলো।

—তা তো হলো। কিন্তু তুমি আসল কথাটাই বুঝতে পারনি।

—কী বুঝতে পারিনি?

—ভবতোষ কেন যে আমাকে মিছিমিছি ওরকম একটা কষ্ট দিল, সেটা বুঝতে পেরেছো কি?

—না।

—তাই বল। আমিও বুঝতে পারিনি।

—আপনি এবার খেয়ে নিন।

—হ্যাঁ। খুব বুঝতে পারছি, ক্ষিদে পেয়েছে। হেসে ফেলেন ননীকাকা, প্রতিভাও হেসে ফেলে।

হেসে হেসেই বাঁ পায়ের হাঁটুটাকে টিপতে থাকেন ননীকাকা।—আরও বুঝতে পারি না, বাত-কালান্তক কেন যাবার আগে রাগ করে আমারই হাঁটুতে বাত রেখে গেল।

—আপনি কি ওই ওষুধ কোনদিন খাননি?

এবার বেশ একটু অদ্ভুতভাবে মাথা নেড়ে আর চেঁচিয়ে হেসে উঠলেন ননীকাকা—না, বউমা।

—খেলে আজ হয়তো ভালই থাকতেন, কষ্ট পেতে হতো না।

—তা হয়তো হতো না। কিন্তু এটা আমার কোন কষ্টই নয়। তুমি এসেছো যখন, তখন আমার কোন কষ্ট থাকতেই পারে না। তুমি মাঝে মাঝে এসে আমার বইগুলোকে একটু পড়ে শুনিয়ে যেও, তাহলেই হবে।

মুখ কালো করে ননীকাকার ঝাপ্‌সাদেখা চোখের চিকচিকে হাসিটার দিকে তাকিয়ে থাকে প্রতিভা। আর, যেন ভীরু দোষীর মত গলার স্বর কাঁপিয়ে কথা বলে—আমি এসব বই পড়তে পারি না। আপনি কিছু মনে করবেন না।

প্রতিভার কথা শুনে ননীকাকার গলার স্বরে যেন আরও অদ্ভুত একটা খুশির আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—বেশ তো, তাতে কী হয়েছে? সে জন্যে আমার আর চিন্তা নেই, বউমা। আমার নাতিরা তো পড়বে।

প্রতিভার মাথাটা হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে। সারা মুখে যেন রাঙা আবীরের ঝড় লুটিয়ে পড়েছে। বুকের ভিতরটাও কেমন করছে। ননীকাকার সঙ্গে এখন আর একটিও কথা বলবার সাধ্যি নেই।

ভাগ্যিস চোখে ঝাপ্‌সা দেখেন ননীকাকা। তাই আস্তে আস্তে আবার মাথা তুলে ননীকাকার মুখের দিকে তাকায় প্রতিভা। ননীকাকা বলেন—তুমি এখন সুধার মা'কে একটু খবর দাও, বউমা। আমার খাবার দিয়ে যাক্।

রাত আটটা। তার মানে রাতটা শুরু হয়েছে। কানে কানে কথা বলবার, কিংবা একেবারে নীরব করিয়ে দেবার মত রাত নয়। পাশের বাড়ির রেডিও বেশ গলা খুলে যুদ্ধের খবরও শোনাতে শুরু করেছে। নীচের তলা থেকে উপরে উঠে গিয়ে প্রতিভা আবার তার নিজের ঘরের সেই আয়নাটির কাছে দাঁড়িয়েছে।

ঘরের দরজার কপাট আর ভেজানো নয়। দুই কপাট যেন খোলা-মেলা একটা বুকের দু'পাশের দুটো আগবাড়ানো হাত। বুকে জড়িয়ে ধরতে যেন একটুও দেরি না হয়, তারই জন্য তৈরি হয়ে থাকা দুটো হাত। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরে হাওয়া ঢুকছে আকুল হয়ে। ঝুলছে ঘরের ভিতরের আলনায় একটা তোয়ালে আর পাঁচটে রুমাল। নড়ছে এক বছর আগের নতুন বরবধূর একটি ফটো। কাঁপছে বিছানার বালিশের ঢাকা। ঘরের ভিতরটা সত্যিই হাওয়া-খুশি পাখির মত যেন পাখা মেলে উড়তে চায়।

প্রতিভার চোখ-মুখের দশাও হাওয়া-খুশি একটা পাখির দশা। পাখিটার শুধু চেহারার ডানা নয়, প্রাণের ডানাও নড়ছে কাঁপছে দুলছে। জীবনে কোন-দিনও ইচ্ছে করে নিজেকে এরকম একটা চমৎকার রূপের প্রজাপতির মত এত রঙীন করে সাজাবার চেষ্টা করেনি প্রতিভা।

না, একটা হঠাৎ-খেয়ালের আনমনা ব্যস্ততার কাণ্ড নয়। প্রতিভার মনও আজ আর লজ্জা পেয়ে চমকে ওঠে না, এ কি? এত সাজবার কী দরকার ছিল? প্রতিভা জানে, প্রতিভার এঘরের আয়না-টেবিলের উপরে ছড়িয়ে পড়ে থাকা যত ক্রীম পাউডার আর চামেলী আরকের ছোট শিশিটাও জানে, একটা রঙীন প্রজাপতির প্রাণ সত্যিই আজ পরাগ নিতে চায়; তাই একজনের বুকের উপর লুটিয়ে পড়তে চায়।

একবার মনে হয়েছিল, ঘরের ভিতরের চার দেয়ালের চারটে আলো জেবলে রাখাই ভাল। আলো-ঝলমল এই ঘরের আভা এ-আর-পি'র লোকগ্বলোর চোখেও পড়বে না। এই ঘর তো রাস্তার দিকের মাথায়ওঠা বারান্দাটার গা-ছোঁয়া একটা ঘর নয়। পাশের বাড়ির বাগানের নারকেলের পাতার ঝালরের ফাঁক দিয়ে আকাশের অত রোগা চাঁদের ফিকে আলো এই বারান্দার আর এই ঘরের দরজার কাছে ল্বটিয়ে পড়ে ঝিরঝির করছে। এই ভাল। তাই, ঘরের শ্বধ্ব টেবিল বাতিটাকেই জেবলে দেয় প্রতিভা। ম্বদ্ব নিবিড় নীলচে এই থমথমে আলোতে কারও চোখ-ম্বখ-ব্বকের সব কিছ্ব দেখে নেবার পরেও মনে হবে, আরও যেন কিছ্ব দেখবার বাকি রয়ে গেল।

সত্যি, মনটা তখন কী ভয়ানক কষ্ট পেয়ে ছটফটিয়ে উঠেছিল, ননীকাকা যখন বললেন, তুমি মাঝে মাঝে আমার বই একট্ব পড়ে দিও। লেখা-পড়া না শেখবার লজ্জাটা যে একদিন এরকম একটা দ্বর্ভাগ্যের লজ্জা বলে মনে হবে, কোনদিন কোন ভুল স্বপ্নেও এমন ভয়ের কথা ভাবতে হয়নি। কত খ্বশি হতেন ননীকাকা, ঝাপসা-দেখা চোখের সব দ্বঃখ ভুলে যেতেন, যদি প্রতিভা তাঁর ওই যত আদ্বরের বইয়ের অন্তত দ্ব-চারটে বই ভাল করে পড়ে শোনাতে পারতো। কাকা নিশ্চয় ভাবতেই পারেননি যে, এত বড়-বড় দ্বটো চোখের মেয়ে হয়েও বই পড়তে পারে না, তাঁর ভাইপোর বউ, যার বয়স ছাব্বিশ পার হয়ে সাতাশ পার হতে চলেছে।

কিন্তু কী অদ্ভুত ননীকাকার ওই ঝাপ্সা-দেখা চোখের চিকচিকে হাসি। নাতিরা পড়বে! ননীকাকার চোখে চিকচিকে আশার হাসিটা যেন একটা খ্বশির আলো উথলে দিয়ে নির্ভাবনায় ভরে গেল। আর, উথলে উঠলো প্রতিভার ব্বকের ভিতরে এক ঝলক রক্তের জ্যোৎস্না। বলতে ইচ্ছে করেছিল, নিশ্চয় কাকা, বিশ্বাস কর্বন, আপনার নাতিরা ওই বই পড়বে। নিশ্চয় পড়বে। আজ আপনি আমাকে মাপ করে দিন।

কী যেন সেই গল্পটা—ভাল কথা করালি স্মরণ। এক পাগল মাঝির ভীষণ নিষ্ঠ্বর একটা পাগলামির বাতিক ছিল। মান্বষকে খেয়া পার করাতে গিয়ে মাঝগাঙে ডিঙি ডুবিয়ে দিত। একদিন, খেয়ার ডিঙি তখন মাঝ-গাঙ প্রায় পেরিয়ে যেতে চলেছে। ডিঙির যাত্রীরা খ্বশি হয়ে জিজ্ঞেস্ করে—কী মাঝি, মেজাজ খ্বব ভাল নাকি? আজ যে ডিঙি ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করলে না। চমকে ওঠে পাগল মাঝি—ভাল কথা করালি স্মরণ। তখ্বনি ডিঙিটা ডুবিয়ে দিল পাগল মাঝি।

ননীকাকাও যেন এক পাগল মাঝির ভোলা মনটাকে খ্বঁচিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে। শেফালীদি সত্যিই একদিন বেশ ধমক দিয়ে বলেছিলেন, তুমি এতদিন ধরে কী করছো বল তো? বরের সঙ্গে কি শ্বধ্ব কথা বলে বলে গল্প করেই দিন কাটাচ্ছো?

—তা তো করছিই।

—তাই তো মনে হয়। তা না হলে এতদিনে একটা প্রমাণ পাওয়াই যেত।

—কোন দরকার নেই।

—কী দরকার নেই?

—এরকম প্রমাণ দেবার কোন দরকার নেই, তুমি যে-রকম প্রমাণ দিয়েই চলেছ।

সত্যিই তো মনে হতো, ওরকম প্রমাণ দেবার জন্য ব্যস্ত হওয়ার কোন মানে হয় না। এ যেন সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়ার জন্যে ছটফট করা। যা ভাল লাগে তা তো সবই পাওয়া হয়ে গিয়েছে; একটুও অভাব নেই, কোন অভাব নেই।

আজ এখন যদি শেফালীদি হঠাৎ এখানে এসে জিজ্ঞেস করে বসেন, এ কী প্রতিভা, আজ তোমার চোখ-মুখ এরকম হয়ে গেল কেন? এত সেজেছো কেন? কিসের জন্যে আজ এরকম একটা মোহিনী রূপ ধরবার ইচ্ছে হলো?

শেফালীদির কথার জবাব দিতে পারা যাবে না। মুখের ভাষাটা অত বেহায়া হতে পারবে না। কিন্তু, তাতেই তো ধরা পড়ে যেতে হবে। শেফালীদি বুঝেই ফেলবেন, কেন আজ জবাব দিতে পারছে না সেই মেয়ে, যে-মেয়ে একদিন চেঁচিয়ে জবাব দিয়েছিল, কোন দরকার নেই।

নাতিরা পড়বে। কাকার কথাটা যেন বালীর জনা পিসিমার বাড়ির দক্ষিণ-বাগানের হাওয়া। সেদিন, যেদিন দাদার সঙ্গে বালী হয়ে বেলুড়ের মন্দির দেখতে যাওয়া হয়েছিল, সেদিন জনা পিসিমার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে হাওয়ার কাণ্ডটা দেখেছিল আর চমকে উঠে হেসে ফেলেছিল প্রতিভা। ঠিকই, কেন যেন, দেখতে খুব ভাল লেগেছিল। দক্ষিণ-বাগানের দিক থেকে হঠাৎ একটা হাওয়া ছুটে এসে উঠানের উপর থেকে শুকনো-ঝরা আমপাতার একটা গাদা উড়িয়ে নিয়ে গেল। আর, উঠানের মাটিতে আঁকা একটা আলপনা যেন মুখ তুলে হেসে উঠলো।

আগে তো ঠিক এমন করে বুঝতে পারা যায়নি, এই প্রায়-সাতাশ বছর বয়সের বুকের ভিতরে লুকিয়ে থাকা একটা উঠানের উপরে একটা আলপনা শুকনো আমপাতায় ঢাকা পড়েছিল। কী আশ্চর্য, ইচ্ছেটা আজ আর একটুও লজ্জা পাচ্ছে না। লজ্জা করতে চায়ও না।

ননীকাকার মুখের ওই কথাটা মনে পড়লে বুকের ভিতরটা এখনও সেই কথা উতলা হয়ে হেসে ওঠে। আর চোখেও যেন একটা মিষ্টি ছবি ভেসে ওঠে। স্বপ্নে দেখা মধুমালার দেশের ছবি কি এর চেয়েও বেশি মিষ্টি?

ভদ্রলোক যখনই বাড়িতে ফিরে আসুক না কেন, খেতে যাবার আগে একবার তো এঘরেই আসবে আর ডাকবে। না, আজ আর ওভাবে চলবে না। ভদ্রলোকও একটু আশ্চর্য হবে নিশ্চয়। হোক। খেতে যেতে যত দেরি হয়, হোক। ভদ্রলোক

বোধহয় বুঝেও ফেলবে, আজ নিশ্চয় এক পাগল মাঝির মতলব ভাল কথা স্মরণ করে ফেলেছে। বুঝুক। যদি জিজ্ঞেস করেই ফেলে, তবে স্পষ্ট বলে দেওয়াই হবে—হ্যাঁ।

কী ভাবলো সুধার মা? আজ এসময়ে নীচের তলার সব কাজ ফেলে রেখে উপরতলার ঘরে চলে গেল কেন বউদি? রোজই এ সময়ে সুধার মা'কে বলে দিতে হয়, কাল সকাল বেলার চায়ের সঙ্গে কী খাবার করা হবে? রোজ রোজ লুচি ভাল নয়। তুমি কি এত ঘি না দিয়ে সুজির মোহনভোগ করতেই পার না, সুধার মা? রামপ্রসাদকে বলবার ছিল, কাল আবার বাজার থেকে এক গাদা বেগুন নিয়ে এস না। এক ডালা বেগুন শুকিয়ে পড়ে রয়েছে। শুধু মাছ নিয়ে এস। ভানুর দোকানের পাঁউরুটি আর কখ্‌খনো আনবে না। কিন্তু বেচারা যে বলেছিল, আমার মাইনেটা আজই দিন, মা। দেনা-টেনা শুধে দিয়ে যা থাকবে, কালই মনি অর্ডার করে দেশের ঘরের মানুষটার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। ঘরের খবর ভাল নয়, মা। ঝি দুর্গাবালাও রোজই এই সময় একটা আশা করে রান্নাঘরের দরজার কাছে চুপ করে বসে থাকে, দোক্তা খাওয়ার জন্য চারটে পয়সা ওকে দিতে হয়।

সব হবে, সব হবে। আজ এখন আমাকে একটু রেহাই দাও। সকলকে এক কথায় বুঝিয়ে আর চুপ করিয়ে দিয়ে উপরতলায় চলে এসেছে প্রতিভা। আজ সব কাজের আগে প্রতিভার যেন একটা পরম কাজ আছে। একটা দুর্বার আশার উৎসবের কাজ।

নারকেলের পাতার ঝালরের ফাঁক দিয়ে ফালি চাঁদের আলো আর ঝিরঝির করে না। তার মানে, সেই ফালি চাঁদ সরে গিয়েছে, রাত বেড়েছে। কত রাত? সিংহ-আয়নার মাথার ওপরের ঘড়িটা শব্দ করে বাজে, রাত দশটা।

তা হলে তো, বেশ রাত। বাড়ি ফিরতে কোনদিনও এত রাত করে না অনুপম।

সিঁড়ির মুখের কাছে, উপরতলার বারান্দায় উঠে ডাক দেয় চাকর রামপ্রসাদ—মা, শুনছেন?

চমকে ওঠে প্রতিভা—কি?

রামপ্রসাদ—নীচে এসে টেলিফোন ধরুন। বাবু ডাকছেন।

ডাকাচ্ছি তোমাকে। বাড়ি ফিরতে দেরি করবার আর রাত পেলে না। এখনও ফিরে না এসে দূর থেকে টেলিফোনে কথা বলতে চাইছো? দেখাচ্ছি মজা।

নীচের তলার ঘরে প্রতিভার টেলিফোনী ভাষাটা হাসতে গিয়েও যেন রাগ করে একটা ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে।—না, আমি কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি এখনি বাড়ি চলে এস।

—আজ বিকালে কি টেলিফোনের লোক এসেছিল? উপরতলায় তোমার ঘরে টেলিফোন দিয়ে গেছে?

—না।

—বাথরুমে দিয়ে গেছে?

—আসেইনি তো দিয়ে যাবে কেমন করে?

—আসেনি?

—না।

—তবে বোধহয় কাল সকালেই আসবে।

—এসব কথা আমাকে জানিয়ে লাভ কি?

—তুমি নিজেই সামনে থেকে কাজটা করিয়ে নিও।

—আমি কেন? তুমিই দেখে শুনে কাজ করিয়ে নেবে।

—আমি তো কাল সকালবেলাতে বাড়িতে থাকবো না।

—কেন?

—নৈহাটি থেকে ফিরতে প্রায় দশটা হয়ে যাবে।

—তার মানে? তুমি কি আজ বাড়ি ফিরবে না।

—না। সূর্যবাবুর সঙ্গে এখুনি নৈহাটি যেতে হচ্ছে। না গেলেই নয়।

—কেন?

—কাজ আছে। খুব জরুরি কাজ। তুমি বিশ্বাস কর। একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

—বেশ।

—তুমি আর আমার অপেক্ষায় থেকে......।

—বলেই তো দিলে, বাড়ি ফিরবে না। তবে আর অপেক্ষায় থাকবো কেন?

—রাগ করো না বলছি, তুমি এখন খেয়ে নাও। রাত দশটা হয়ে গিয়েছে।

—তুমি খাবে না?

—খেয়েছি। সূর্যবাবুর বাড়িতেই খেয়ে নিয়েছি। ভালই খেয়েছি, প্রতিভা। বিরিয়ানি পোলাও আর ইলিশ ভাজা।

—ভাল করেছ। এখানে আজ পোলাও নেই, ইলিশ-ভাজাও নেই। শুধু মুগের ডাল আর কইমাছের ঝোল। খেতে তোমার একটুও ভাল লাগতো না।

হেসে ফেলে অনুপম—সত্যিই যে রাগ করেছো, দেখছি।

প্রতিভা—মিথ্যে কথা বলো না।

—মিথ্যে কথা?

—নিশ্চয়। কিছুই দেখতে পাচ্ছ না, তবে আর দেখছি দেখছি বলছো কেন? তুমি তো দূর থেকে শুধু কথা বলছো।

—কিন্তু তুমিও কি আমাকে দেখছো? দেখলে আর এত রাগ করে কথা বলতে না।

—আমি কিন্তু খুব দেখতে পাচ্ছি। হেসে ফেলে প্রতিভা।

—অ্যাঁ? কী দেখতে পাচ্ছ?

—তুমি এখন কাগজপত্রের একটা ফাইল এক হাতে শক্ত করে একেবারে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রয়েছো।

—উঃ, কী ভয়ানক তোমার চোখ! ঠিকই বলেছো, এই ফাইল-হাতে নিয়েই এখন আমাকে নৈহাটি ছুটতে হবে। কিন্তু তুমি দুঃখ করো না। তুমি এখন খেয়ে নাও। আর...একটা কথা...কিন্তু কী করে বলি? সূর্যবাবু যে গ্যাঁট হয়ে এখানেই বসে রয়েছেন।

—চুপ কর। আর একটি কথাও বলো না। কিন্তু বেশি রাত জেগো না। ঘুমোতে চেষ্টা করো। আচ্ছা, এখন তাহলে...।

—হ্যাঁ, রেখে দাও।

হোক্ দুপুরবেলা। বেলা একটা। সে ইচ্ছেটা তো ক্লান্ত হবার মত একটা সামান্য পিপাসার অভিমান নয়। উপরতলার এই কপাটবন্ধ ঘরের ভিতরেও নীলচে জ্যোৎস্না থমথম করে। এখনি ঘুমিয়ে পড়বার সাধ্যি নেই অনুপমের, প্রতিভার মুখের দিকে তাকালে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছেও করে না। অনুপমের বরং জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, তুমি কি আজ ইচ্ছে করেই খোঁপা বাঁধনি? তুমি কি আগে থেকেই জেনে বসে আছ যে, আজ এই এত শান্ত একটা বিনাঝড়ের দুপুরবেলাতে, একটা কপাটবন্ধ ঘরের হাওয়া উতলা হয়ে উঠবে আর তোমার শক্ত করে পরা শাড়ির সাজ এলোমেলো করে দেবে? তাই কি শাড়িটাকে এরকম না-পরার মত করে পরেছ? এটা কি কাল রাত্রিতে ঘরে না আসার জরিমানা?

তা না হলে এরকম কাণ্ড করছে কেন প্রতিভা? সেই যে মাথাটাকে অনুপমের বুকের উপর রেখে এলানো চুলের গন্ধভরা মায়া লুটিয়ে দিয়েছে, আর নড়ছে না। কোন কথাও বলছে না। অনুপমের গলাটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে যেন একটা স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু কী কথা বলে বোঝানো যায় এই মেয়েকে, রাতটা ঘরের বাইরে কাটিয়ে দিতে আমারও যে একটুও ভাল লাগেনি। নৈহাটির কারখানার ম্যানেজারের বাড়ির সেই ঘরের জানলাতে চমৎকার লতার ফুল দোলে, কিন্তু ঘরের ভিতরে মশার সে কী ভয়ানক গুনগুনে রাগের আওয়াজ। মশারির ভিতরেও ভয়-ভয় করে, শুয়ে থাকা যায় না, উঠে বসতে হয়। জেগে থাকতেও

হয়। তখন বার-বার শুধু মনে পড়েছে, এই ঘরটিরই কথা, যেখানে অনুপমের জীবনের সারাদিনের ছুটোছুটি আর চিন্তার সব ক্লান্তি এসেই যেন ছায়ানিবিড় একটা তৃপ্তি খুঁজে পায়। এক-এক সময় সত্যিই বেশ আশ্চর্য মনে হয়। ঠিক যা চেয়েছিল অনুপমের প্রাণের ইচ্ছাটা, তাই পেয়ে গিয়েছে অনুপম। ঘরে ফিরে এসে আর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই, আগে বুকের কাছে চলে আসে, তারপর কথা বলে। প্রতিভার প্রাণটা যেন অনুপমের জীবনের এই দাবির কথাটা একদিন ওর ঘুমের স্বপ্নে শুনে ফেলেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় বলেও ফেলেছিল, হ্যাঁ, তুমি যা চাও, আমারও ঠিক তাই হতে ইচ্ছে করে। শুধু তাই হতে পারি। তার বেশি কিছু হবার যোগ্যতা নেই, ইচ্ছেও নেই। আর কিছু হতে না পারি, অন্তত তোমার ঘরের সুখ হয়ে থাকতে পারবো নিশ্চয়।

না, আজ আর অনুপমের কল্পনা করে বুঝতে হয় না। একদিন তো নয়, অনেকবার, প্রতিভা এ-সব কথা একেবারে মন খুলে বলেই দিয়েছে। প্রথম কবে বলেছিল? হ্যাঁ, সেই বিয়ের রাতেই বাসর-ঘরে। বলেছিল—আমাকে জিজ্ঞেস করবার কোন মানে হয় না।

—আমার যে সত্যিই জানতে ইচ্ছে করছে, প্রতিভা।

—বিশ্বাস কর, আমি নিজেও আশা করিনি যে, তোমাকে দেখেই এত ভাল লেগে যাবে'

—কিন্তু আমার কথা শুনেছো তো? সামান্য মাইনের কেরানীগিরি করছি। আইন পাস করা কপালে আছে কিনা, তাও জানি না।

—সব শুনেছি।

—ভয় করছে না?

—একটুও না।

—আমি যদি তোমাকে সুখী করতে না পারি।

—খুব পারবে।

—আর তুমি?

—আমি লেখাপড়া জানি না; তবু আর কিছু না পারি, অন্তত তোমার ঘরের সুখ হয়ে থাকতে পারবো।

এই তো, সে মেয়ে এখন অনুপমের ঘরের সুখের একটা ব্যাকুল আশাকে তৃপ্তি দিয়ে ভরে দেবার জন্য অনুপমের গলা জড়িয়ে ধরেছে। না, আর কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না। বলবার দরকারও নেই। দুহাতে প্রতিভার মাথা জড়িয়ে ধরে বুকের উপর চেপে রাখে অনুপম। প্রতিভার মাথার উপর অনুপমের তপ্ত চঞ্চল নিঃশ্বাসের বাতাস ঝরে পড়তে থাকে।

কিন্তু বেজে ওঠে টেলিফোন। এক লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে, আর টেলিফোনের মুখের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলে অনুপম।—কে? চন্দ্রবাবু এসে

পড়েছেন নাকি? আচ্ছা, যাচ্ছি। না না, এখুনই যাচ্ছি।

এইবার আলনাটার দিকে তাকিয়ে কথা বলে অনুপম।—যাচ্ছি প্রতিভা। মনে হচ্ছে, খুব জরুরী কাজের কোন কথা নিয়ে চন্দ্রবাবু এসেছেন।

আলনার উপর থেকে একটা চাদর তুলে নিয়ে আর গায়ে জড়িয়ে তারপর সত্যিই একটা খুব-ব্যস্ততার আবেগ নিয়ে চলে গেল অনুপম।

ঘরের দরজা খোলা। দরজার কাছে মেজের উপর রোদ। সেই রোদের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে প্রতিভার চোখের তারা দুটো যেন শুকিয়ে দুটো কাঁকর হয়ে যাবে। জরুরী কাজ? পৃথিবীতে তাহলে এমন জরুরী কাজও আছে, যে-কাজের ডাকে দুপুরবেলার দরজাবন্ধ ঘরের নীলচে জ্যোৎস্নার কাছ থেকে তড়বড় করে আর ব্যস্ত হয়ে কেউ চলে যেতে পারে।

রাজপুতের ছেলে বরের সাজে সেজেছে। বিয়ের আঙিনায় দাঁড়িয়ে কনের গলায় মালা দেবার জন্য সবে মাত্র মালাটি তুলে ধরেছে। কিন্তু দুর্গের দ্বারে দামামা বেজে উঠলো। শত্রু হানা দিয়েছে। তখুনি তলোয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে ছুটে চলে গেল রাজপুতের ছেলে। কনের গলায় মালা দেওয়া আর হলো না। গল্পটা জানা আছে প্রতিভার। কে বলেছিল গল্পটা? বোধ হয় বউদি বলেছিলেন। এ তো তার চেয়েও ভয়ানক একটা দুর্ভাগ্যের কাণ্ড। কিন্তু চন্দ্রবাবুর ডাক কি একটা যুদ্ধের ডাক?

শুধু মনটা নয়. মনের ভিতরে একটা কথাও হাঁসফাঁস করছে। কিসের কাজ? শুধু জরুরী কাজ বললে তো স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যায় না। সে কাজটার কি প্রাণ বলে কিছু নেই? দুর্গাবালা বলে, ওর স্বামী একদিন মেলাতলার মন্দিরের সামনে মাথার উপর ধুনি জ্বালিয়ে নিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর নেচেছিল। চারদিকের ভিড়ের সঙ্গে দুর্গাবালাও সেখানে দাঁড়িয়েছিল। কেঁদে আকুল হয়েছিল দুর্গাবালা। তবু দুর্গাবালার স্বামীর সে কী নাচন, কী ফুর্তি! মাথার চুল পুড়ছে, পা ঝলসে যাচ্ছে, তবু নেচেই চলেছে। দুর্গাবালার কান্নার চোখ দুটোকে দেখতে পেয়েও নাচ থামায়নি লোকটা। দুর্গাবালা বলে—উপায়ও তো ছিল না, মা। ওটা মানতের নাচ। ফাঁকি দিলে তো চলবে না।

ভদ্রলোকের জীবনের জরুরী কাজও কি একটা মানতের নাচ? কিন্তু কিসের মানত? যেকথা অনুপমকে কোন দিনও জিজ্ঞাসা করে জানতে ইচ্ছে করেনি, সে-কথা আজ জানতে ইচ্ছে করে। কী কাজ, কিসের কাজ, কেমনতর কাজ কর তুমি?

অনুপমের একটা কামিজ ঘরের মেজের উপর লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। রোদ লেগে ঝিকমিক করছে কামিজের সোনার বোতাম। যাবার আগে জামা ঝোলাবার হুক থেকে কামিজটাকে তুলে নেবার জন্য বোধহয় হাত বাড়িয়ে একটা টান

দিয়েছিল অনুপম। কামিজটাকে গুছিয়ে দেবারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ির মাথায়, একেবারে ছটফটিয়ে ব্যস্ত হতে হয়েছিল বলেই কামিজটাকে গায়ে দিতে পারেনি। বোধহয় হাত ফসকে পড়ে গিয়েছে কামিজটা। আবার তুলে নিতে একটু চেষ্টাও করেনি ভদ্রলোক। শুধু একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়েই চলে গিয়েছে। জরুরী কাজের ব্যস্ততা তাহলে নিজের জিনিসকেও ঘরের মেজের উপর ফেলে দেয় আর ছুটে চলে যায়। ধুলো লাগবে জেনেও ভয় করে না। মায়া করে তুলে নিতে আর ধুলো ঝেড়ে দিতে ভুলে যায়।

মণ্টুর একটা বুড়ো আছে। তুলো দিয়ে তৈরী একটা পুতুল বুড়ো। বুড়োর চোখ-মুখ-মাথায় কয়লার গুঁড়ো, হাতে-পায়ে সুরকির ধুলো, আর পেটের ফুটো থেকে তুলো বের হয়ে পড়েছে। সে বুড়োর গলাটাকে হাতের মুঠোয় খুব আলগা করে ধরে রেখে যখন ঘুমিয়ে পড়ে মণ্টু, তখনও কি কারও সাধ্যি আছে, মণ্টুর আদুরে বুড়োকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে খাটের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে? অসম্ভব! বুড়োকে ছুঁতে গেলেই ঘুমন্ত মণ্টুর চোখ দুটো খুলে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে মণ্টু।

জরুরী কাজের ভদ্রলোকেরা মণ্টু নয়, ঠিকই। মণ্টু ওর একটা খেলনা জিনিসকে ঘুমের মধ্যেও হাতে ধরে রাখে। আর, জরুরী কাজের মানুষেরা জাগার মধ্যেই তার বুকে ধরে রাখা একটা জ্যান্ত জিনিসকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে।

ছন্নছাড়া এলানো চুলের গোছাটাকে শক্ত করে একটা গিঁট দিয়ে খোঁপা বেঁধে নিয়েও বুঝতে পারে প্রতিভা, মনটা তবু একটুও শক্ত হতে পারছে না।

এ ছাই মনেরও কোন দোষ নেই। শক্ত হওয়ার জন্যে তো গুপ্তিপাড়ার পরেশ চৌধুরীর মেয়ের জীবনটা এবাড়িতে আসেনি। শক্ত হতে হয়, যদি পাথরের সঙ্গে ঠোকাঠুকির ভয় থাকে। এই মানুষটি তো একটি...সত্যিই কাজল মেঘ, ত্রিবেণীর বড়-মামা'র বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়ালে যেমন দেখা যায়, নদীর ওপারের একটা বাগানের বড়-বড় তালের মাথার উপর ভেসে এলেই সেই মেঘ গলে যায়। মাথা খারাপ না হলে এই কাজল মেঘটাকে কেউ কাজল পাথর বলে সন্দেহ করবে না। প্রতিভার কাছে এসে দাঁড়ালেই যে প্রতিভার হাত ধরে ফেলে অনুপম, একটুও দেরি করে না।

টেবিলের উপর কী এটা? মেঘ রঙের মখমলের খুব ছোট একটা বাক্স-ধরনের ডিবে। কে জানে, জিনিসটাকে কখন এখানে এই টেবিলের উপর রেখে দিয়েছে অনুপম।

ডিবেটাকে হাতে তুলে নিয়ে খুলে ফেলতেই চমকে ওঠে প্রতিভা, আর দুই চোখ অপলক হয়ে ডিবের ভিতরের একটা ঝকঝকে বিস্ময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। এক জোড়া হীরের দুল।

বুঝতে পারে না প্রতিভা, চোখ দুটো কখন এমন করে ভিজে গেল। ভালবাসার উপহার আজ হীরে হয়ে প্রতিভার মত মেয়ের ভাগ্যের কাছে চলে এসেছে। এ যে স্বপ্নে দেখা আশ্চর্যের চেয়েও বড় আশ্চর্য। পরের চিঠিতে মা'কে যখন লেখা হবে, এক জোড়া হীরের দুলও হয়েছে মা, তখন মা নিশ্চয় আবার খুশী হয়ে আর হেসে হেসে বাবাকে ওই কথাটাই বলবে—ভগবান যাকে দেন, তাকে এমনি করেই দেন।

কিন্তু মা'কে তো আর একথা লেখা যাবে না, আমার যেন কী হয়েছে মা। হীরের দুল দেখেই চোখ ভিজে গেল কেন, ভাল লাগলো না কেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

দোষটা কি তবে আমার চোখেরই দোষ? দুটো পানসে চোখ? কিন্তু গুপ্তিপাড়ার অনেক মেয়ে আজও জানে আর বলেও থাকে নিশ্চয়, প্রতিভার চোখে পাথর আছে। তা না হলে চোখের সামনে ওরকম একটা কাণ্ড দেখে কোন মেয়ের চোখ না কেঁদে থাকতে পারে না।

সেদিন দাদাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে দশজন পুলিস এসে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। পুলিসের এক কর্তা-অফিসারও এসেছিল; মাথায় টাক আর রোগা ঝিরকুটে চেহারা। বাবা তাকে চেনেন, শ্রীনগরের বড় মেসোর ছোট ভাই বসন্ত দত্ত। বসন্তবাবুর রোগা কোমরের বেল্টের সঙ্গে চেন-বাঁধা একটা মস্ত-বড় পিস্তল ঝুলছিল।

দাদা বলেন—তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা করে দে, পতু।

বসন্তবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—নো নো, নেভার।

দাদার কপালের রগ ফুলে ওঠে—কেন?

প্রতিভা বলে—এক কাপ চা করে দিতে কতটুকুই বা সময় লাগবে? পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন।

বসন্তবাবু—না।

প্রতিভা—কেন?

বসন্তবাবু—আপনার চা যে সত্যিই চা, বিষ নয়, তার কি কোন গ্যারাণ্টি আছে?

প্রতিভা—কী বললেন? দাদা চা খাবেন, সেই চায়ে বিষ মেশাবো আমি?

বসন্তবাবু—অসম্ভব নয়। পুলিসের আর আইনের চেষ্টাকে জব্দ করে দেবার জন্যে আপনারা এমন কাণ্ডও করতে পারেন, সব পারেন। চলুন মশাই, কুইক!

দাদার আর চা খাওয়া হলো না। বসন্তবাবু নিজেই দাদার হাতে হাত-কড়া পরালেন। চলে গেলেন দাদা। যাবার সময় কিন্তু দাদা হেসে ফেলেছিলেন—তুই রাগ করিস না পতু; কাঁদিস-টাঁদিস না।

না, কাঁদেনি প্রতিভা। বাবা চুপ করে আর শুকনো শান্ত চোখ তুলে চালতে গাছের কাকের বাসাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মা ঘরের ভিতরে বসে কাঁদলেন। আর প্রতিভা শুধু দুটো শক্ত চোখ অপলক করে দেখতে থাকে, চলে যেতে যেতে দাদা তাঁর হাত-কড়া লাগানো হাত দুটোকে তুলে নিয়ে কপালটাকে টিপছেন।

জয়া সুলেখা আর বীণা, যারা এই পাড়ারই তিন মেয়ে, বলাইদার গ্রেপ্তার দেখতে যারা ছুটে এসেছিল, তারা কিন্তু কেঁদে ফেলেছিল, আর যাবার আগে ফিস-ফিস করে বলেওছিল, বলাইদা তো বোনকে বলে গেলেন, কাঁদিস-টাদিস না, কিন্তু বোনের চোখে তো এক ফোঁটা জল দেখছি না।

ছি-ছি, কামিজটা যে এখনও ঘরের মেজের উপর তেমনই লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। লজ্জা পেয়ে চমকে ওঠে প্রতিভার চোখ। এ বাড়িতে আজ এই প্রথম ভুল, এমন ভুল কোনদিনও হয়নি। অনুপমের কামিজটা একটা অবহেলার জিনিসের মত মুখ থুবড়ে মেজের উপর পড়ে আছে, এমন কাণ্ড চোখের সামনে দেখতে পেয়েও এতক্ষণ ধরে শুধু যত বাইরের ছবি দেখেছে প্রতিভা।

কামিজটাকে মেজের উপর থেকে তুলে নিয়ে দেখতে চেষ্টা করে প্রতিভা, ধুলো লাগেনি তো? এ ঘরের মেজেতে অবিশ্যি ধুলো নেই। দুর্গাবালা চমৎকার ঘর মুছতে পারে। কিন্তু তবু তো...। কামিজটাকে বার বার ঝাড়া দিয়ে নিয়ে আবার হুকের গায়ে ঝুলিয়ে দেয় প্রতিভা।

হাত দুটো এবার যেন লজ্জা পেয়ে মুখ ঢাকতে চেষ্টা করে। ছি-ছি, মানুষের একটা দুঃখকে চিনতে ও বুঝতে এত ভুল হয়? চন্দ্রবাবুর ডাক শুনেই চলে যেতে হলো, কামিজটাকেও গায়ে দেবার সময় হলো না, এ তো ভদ্রলোকের জীবনের একটা কষ্ট। সে কষ্টটা চাপা থাকে, মুখ খুলে কথা বলে না, আক্ষেপও করে না। বরং যেন জোর করে হেসে থাকতে চেষ্টা করে। এটুকু বুঝতে এত দেরী হলো কেন? নিজের সাধের অভিমানে চোখ ভিজিয়ে দিলে, সেই চোখ বোধ হয় আর-একজনের কষ্টের মুখচাপা অভিমানের কিছুই দেখতে ও চিনতে পারে না।

কামিজটাকে হাতে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় প্রতিভা। তারপর বারান্দার সিঁড়ির মুখের কাছে এসে বেশ ব্যস্তভাবে ডাক দেয়—রামপ্রসাদ।

—হ্যাঁ, মা।

—এখানে এস, এই কামিজটাকে নীচের ঘরে বাবুর কাছে দিয়ে এস। তাড়াতাড়ি এস।

খুব জোরে পাখা ঘুরছে নীচের তলার ওই ঘরে; দুটো বড়-বড় পাখা। ঘরটা কিন্তু লম্বাতে কিংবা চওড়াতে এমন-কিছু বড় নয়। একটা বড় টেবিলে ও চারটে চেয়ারে ঘরের প্রায় অর্ধেক ভরে গিয়েছে। কুড়ি বছর আগে এখানে একটি টেবিলের উপরে আত্রেয় বাত-কালান্তকের শিশি-বোতলের লেবেল স্তূপ হয়ে পড়ে থাকতো। অনুপমের বাবা যাদব রায় যে চেয়ারে বসে কারবারের হিসেব লিখতেন, আজ যাদব রায়ের ছেলে অনুপম রায় ঠিক সেখানেই অন্য একটি চেয়ারে বসে আছে। চীনে ছুতোরের হাতে পালিশ করা বর্মা সেগুনের নতুন টেবিল আর নতুন চেয়ার।

টেবিলের উপর আর সেই পুরনো ভাগ্যের জঞ্জাল নেই। একেবারে ফাঁকা একটা টেবিল। হ্যাঁ, টেবিলের উপরে এদিকে-ওদিকে অবশ্য চায়ের দুটো শূন্য পেয়ালা পড়ে আছে।

একেবারে আদুড়-গা হয়ে বসে আছেন চন্দ্রবাবু; গায়ের গেঞ্জি ও কামিজ, দুটো বস্তুকেই চেয়ারের হাতলের উপর ফেলে রেখে দিয়েছেন। সূর্যবাবু তাঁর গায়ে শুধু গেঞ্জিটাকে রেখেছেন, আর মটকার পাঞ্জাবিটাকে দেয়াল-ঘেঁষা আলমারিটার কাঁচের হাতলের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। অনুপমের গেঞ্জি-পরা গায়ে অবশ্য একটা চাদর জড়ানো রয়েছে, বেশ মিহি ও নরম একটা বিষ্ণুপুরী সিল্কের চাদর।

চন্দ্রবাবু বলেন—অনন্ত চাটুজ্জে কী বললে, শুনবেন? শুনলে আপনি চমকে উঠবেন, সূর্যবাবু।

অনুপম—কোন্ অনন্ত চাটুজ্জে? নিশিকান্তবাবুর......।

চন্দ্রবাবু—হ্যাঁ, নিশি উকীলের শালা অনন্ত চাটুজ্জে। বৈজু কালয়ারের দোকানে খাতা লিখতো যে অনন্ত। সেই অনন্ত বললে, ওর নাগপুর অফিসের জন্যে একজন ম্যানেজার চাই।

অনুপম—তার মানে?

চন্দ্রবাবু—তার মানে তাই। অনন্ত ওর নাগপুর অফিসের জন্য একজন ম্যানেজার খুঁজছে। পাঁচশো টাকা মাইনে দিতে রাজী আছে।

সূর্যবাবু—আমাকেও কে যেন বললে, অদ্ভুত উন্নতি করে ফেলেছে অনন্ত। কিন্তু বুঝতে পারি না, পুরনো লোহার হিসেব লিখে হাত পাকিয়েছে যে অনন্ত সে কি করে কাঁচা চামড়ার এত বড় একটা কারবার জমিয়ে তুললো।

চন্দ্রবাবু—বুঝতে না পারবার তো কিছু নেই। যুদ্ধের বাজারে কারবার করতে তো কোন অভিজ্ঞতার দরকার হয় না। একবার ধরতে পারলেই হলো।

সূর্যবাবু—খুব খাঁটি কথা। তা না হলে অবিনাশের মত একজন প্রফেসর মানুষ, যে-মানুষ জীবনে কোনদিন ধান-চালের চেহারা চোখে দেখেছে কিনা সন্দেহ, সে-মানুষ হঠাৎ কেনই বা চালের কারবার ধরবে আর এক মাসের মধ্যে

দুটো গাড়ি কিনে ফেলবে? সবই কেমন-যেন ওলট-পালট হয়ে গেল।

চন্দ্রবাবু—ব্যাপার দেখে সত্যিই এক-এক সময় আমার বেশ হাসি পায়। হেসেও ফেলি। দেখতে পেয়ে গৃহিণী কেমন-যেন একটু সন্দেহ করে বসেন আর জিজ্ঞাসাও করেন—হাসছো কেন? এ কী রকমের হাসি!

হেসে ফেলে অনুপম।—আপনি কী জবাব দেন?

চন্দ্রবাবু ঘাড় নাড়েন—বলতে পারতাম অনুপম; কিন্তু বলা কি উচিত হবে? তুমি যে বয়সে আমার চেয়ে অন্তত পনের বছরের জুনিয়র।

সূর্যবাবু হাসেন—অন্তত এটুকু তো বলতে পারেন যে, আপনার জবাবের পর ভদ্রমহিলা খুব সন্তুষ্ট হয়ে হেসে ফেলেন।

চন্দ্রবাবু—হ্যাঁ, এটুকু স্বীকার করতে আর বলতে আমার কোন আপত্তি নেই, বয়সটা যা-ই হোক না কেন।

অনুপম—আমিও এই সেদিন অনন্ত চাটুজ্জের মত একজনের দেখা পেয়ে গেলাম।

সূর্যবাবু—কে? কে?

অনুপম—আমারই সঙ্গে পড়তো, বোধ হয় রিষড়ে কিংবা বৈদ্যবাটিতে বাড়ি। মানিক মজুমদার সেই সেকেন্ড ইয়ারেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কোথায় যে চলে গেল, কিছুই জানতাম না। কোনদিন আর দেখা-সাক্ষাতও হয়নি। দেখা হলো এই সেদিন। সন্ধ্যেবেলা হেদুয়ার কাছে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ একটা গাড়ি এসে আমার কাছেই থেমে গেল। গাড়ির ভেতর থেকে নেমে এল মানিক মজুমদার। বললে, চিনতে পারছো? চিনতে অবশ্য একটু দেরি হয়েছিল।

চন্দ্রবাবু—রিষড়ের অক্ষয়বাবুর ভাই, সেই মানিক নয় তো?

অনুপম—তা জানি না, হতে পারে। যে-ই হোক, বোম্বাইয়ে একটা আর, কলকাতায় দুটো বাড়ি কিনেছে। বছরের ছ' মাস বোম্বাইয়ে থাকে মানিক। মিলওয়ালার মেয়ে, এক গুজরাটি মহিলাকে বিয়ে করেছে।

সূর্যবাবু—বুঝলাম। কিন্তু এর মধ্যে খুব বেশী আশ্চর্য হবার কী আছে?

অনুপম—মানিক মজুমদারের কারবার হলো, যুদ্ধের অর্ডারের খুব সাধারণ রকমের একটা জিনিস সাপ্লাই করা।

সূর্যবাবু—ব্যাং-ট্যাং নয় তো? শুনেছি হানিফ মিঞা শুধু এক রামগড়ের ক্যাম্পে ব্যাং সাপ্লাই করে লাখ টাকা লাভ করেছে।

অনুপম—না। মানিক মজুমদারের কাজ হলো ব্যান্ডেজের কাপড় সাপ্লাই করা।

চন্দ্রবাবু হাসতে থাকেন।—ভাগ্য! একেই বলে ভাগ্য!

সূর্যবাবু—ভাগ্য নয় মশাই। বলুন সুযোগ। সুযোগ সব সময় আসে না। যারা সুযোগ বুঝে কাজ করতে জানে, তারাই এগিয়ে যেতে পারে।

চন্দ্রবাবু—আরে মশাই, ওই সুযোগেরই নাম ভাগ্য। টাইম অ্যান্ড টাইড বুঝে কাজ করে যাও, বাস্।

অনুপম হেসে ফেলে—আমিও তাই বলি।

চন্দ্রবাবু মাথা নাড়েন—একটু বুঝে বল, অনুপম। ভাগ্য বলে একটা ইয়ে...একটা অদ্ভুত কিছু না থাকলে গিরিডির সমর ঘোষের অবস্থাটা এক সপ্তাহের মধ্যে ঝলমল করে উঠতো না।

অনুপম—আমি তো শুনেছি, ভদ্রলোকের অবস্থা এখন খুবই কাহিল।

চন্দ্রবাবু—এখন কাহিল; সেটাও ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আগে কী ছিল? কী থেকে হঠাৎ কী হয়ে গিয়েছিলেন সমর ঘোষ?

সূর্যবাবু—অভ্রের একটা খনি ধরেছিলেন।

চন্দ্রবাবু—দু' শো দশ টাকা দিয়ে জমিদারের কাছ থেকে জঙ্গলের একটা গর্তের উপরচালা করবার ইজারা নিয়েছিলেন, মাত্র এক বছরের জন্য। গর্তের মাটি খুঁড়তে আর পাথর ফাটাতে মজুর আর বারুদের জন্য সমর ঘোষের দেড়শো টাকাও খরচ করতে হয়নি। পাঁচটাও দিন পার হয়নি, হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো স্পেশ্যাল ফার্স্ট ক্লাস ঝকঝকে অভ্রের বিরাট একটা পকেট। এক লট মালেই দেড় লক্ষ টাকা পেয়ে গেলেন সমর ঘোষ।

অনুপম—কিন্তু ভদ্রলোকের অবস্থাটা আবার কাহিল হয়ে গেল কেন? সেটা জানেন কি?

চন্দ্রবাবু—খুব জানি। জমিদারের সঙ্গে মামলা বেধে গেল। তিন বছর মামলা লড়ে শেষে হেরে গেলেন সমর ঘোষ, খাদটা হাতছাড়া হয়ে গেল।

অনুপম—কিন্তু হেরে গেলেন কেন?

চন্দ্রবাবু—শুনেছি, মামলা চালাতে কি-যেন বেশ বোকারকমের একটা ভুল করে ফেলেছিলেন ভদ্রলোক।

হেসে ওঠে অনুপম—তাই বলুন। ভুল করেছিলেন সমরবাবু; ঠিক সুযোগ বুঝে কাজ করতে পারেননি। কিন্তু সুযোগ বুঝে, সময় বুঝে, একটু সাবধান হয়ে আর একটু বুদ্ধি খরচ করে যদি কাজ করতেন, তবে মামলাতে ভদ্রলোকের ও-রকমের একটা বিশ্রী হার হতো না।

ঘরে ঢোকে রামপ্রসাদ। অনুপমের হাতের কাছে একটা কামিজ এগিয়ে দেয়।

হেসে ফেলেন সূর্যবাবু।—আমিও বয়সে অনুপমের চেয়ে দশ বছরের সিনিয়র। নইলে একটা কথা এখনই বলে দিতে পারতাম।

চন্দ্রবাবু—বলতে আর কী বাকি রাখলেন?

সূর্যবাবু—সত্যিই, লজ্জা পেলে নাকি অনুপম?

অনুপম হাসে—পাইয়ে দিলেন যখন, তখন তো আর না পাওয়ার কোন কথা উঠতে পারে না।

চায়ের দুটো শূন্য পেয়ালার দিকে হাত বাড়ায় রামপ্রসাদ।

চন্দ্রবাবু বলেন—ভাই রামপ্রসাদ, দুই অতিথিকে এখন দু' পেয়ালা চা এনে দিলে তোমার অনেক পুণ্যি হবে।

চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে হাসে আর চলে যায় রামপ্রসাদ। সূর্যবাবু তাঁর হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাঁফ ছাড়েন—কিন্তু কই? সে ভদ্রলোক তো এখনও...।

সূর্যবাবুর চিন্তার কথাটা শেষ হলো না। সে ভদ্রলোক এসেই পড়েছেন। ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছেন। চমৎকার কোষ্ঠী-বিচার করেন যিনি, সেই নাম-করা জ্যোতিষী কুলদা পণ্ডিত।

ঘরে ঢুকেই হাতের ঝোলার ভিতর থেকে দুটি কোষ্ঠীপত্র বের করে টেবিলের উপর রাখেন কুলদা পণ্ডিত। একটি চন্দ্রবাবুর, একটি সূর্যবাবুর কোষ্ঠীপত্র।

সূর্যবাবু বলেন—তোমার কোষ্ঠীপত্রটা একবার নিয়ে এস, অনুপম। পণ্ডিত মশাই একবার দেখুন আর বলুন।

অনুপম হাসে—আমার কোষ্ঠীপত্র নেই।

চন্দ্রবাবু—তবে শিগগির করিয়ে ফেল।

অনুপম—পণ্ডিত মশাইকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, কিছু যদি মনে না করেন।

কুলদা পণ্ডিতের শান্ত ও সৌম্য চেহারার মধ্যে তাঁর মুখের হাসিটা অদ্ভুত রকমের স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।—বলুন, আমি কিছুই মনে করবো না।

অনুপম—কোষ্ঠীপত্র করিয়ে আমার কি কোন সুবিধা হবে? কোন লাভ হবে?

কুলদা পণ্ডিত—হবে।

—কী সুবিধা? কী লাভ?

—আপনি আপনার ভবিষ্যৎ আর ভাগ্যটাকে খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারবেন।

—কিন্তু ওটা বুঝেও কোন লাভ হবে কি?

—সেটা আপনি বুঝে দেখুন। আমি যা করতে পারি, শুধু তাই বললাম।

চন্দ্রবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন।—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি অনুপমের একটা কোষ্ঠীপত্র করে দিন, পণ্ডিত মশাই।

সূর্যবাবু—যুদ্ধের ফল শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে, পণ্ডিত মশাই? হিটলার জিতবে?

কুলদা পণ্ডিত—বলতে পারতাম। কিন্তু আমার মনে একটা খটকা আছে। হিটলারের জন্মকালের রাশি-নক্ষত্রের যে খবর কাগজে বের হয়েছে, সেটা ঠিক নয় বলে আমার বিশ্বাস। আমার হিসাবে মিলছে না। তবু চেষ্টা করছি, দেখি, ধরতে পারি কি না।

চন্দ্রবাবু—আমাদের ইণ্ডিয়ার অবস্থা কী দাঁড়াবে? স্বাধীন হতে পারবে কি?

কুলদা পণ্ডিত—এটা বলা যায় গ্রহবিচার করে। সেটা করছি। এখনও শেষ হয়নি।

সূর্যবাবু—আপনি তো কররেখাও বিচার করেন।

কুলদা পণ্ডিত—হ্যাঁ।

চন্দ্রবাবু—তবে আমাদের অনুপমের হাতটা এখুনি একবার দেখে দিন।

হেসে ফেলে অনুপম, কিন্তু ডান হাতটাকে টান করে টেবিলের উপরে পেতে দিতেও দেরী করে না। অনুপমের হাতের রেখাগুলির দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন কুলদা পণ্ডিত।—অদ্ভুত হাত। ভাল হাত।

অনুপম—কী দেখছেন, বলুন।

কুলদা পণ্ডিত—অনেক কিছুই দেখছি। মেঘও আছে তারাও আছে। তবে মেঘ খুব কম, তারাই বেশী।

অনুপম—খুব খারাপ মেঘ?

—না। দু-তিনবার একটু দুশ্চিন্তার কষ্ট সহ্য করতে হবে, এই মাত্র। কিন্তু যে-কথাটা আগেই বলতে চাই, সেটা বলে ফেললে লজ্জা পাবেন না তো?

চন্দ্রবাবু ব্যস্তভাবে চেয়ার থেকে উঠেই দাঁড়ালেন, আর, হাসতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—আপনি বলেই ফেলুন পণ্ডিত মশাই; অনুপম যদি লজ্জা পায় তো পাক।

খুব লজ্জাকুণ্ঠিত স্বরে কথা বলেন কুলদা পণ্ডিত—যাকে বলে, অনবদ্য অনবচ্ছিন্ন ও অপরাহত গৃহসুখ।

সূর্যবাবু—কী আশ্চর্য, এই কথাটা বলতে আপনি একেবারে লজ্জায় ভেঙে পড়লেন, পণ্ডিত মশাই?

কুলদা পণ্ডিত—ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারলাম না বোধ হয়।

চন্দ্রবাবু—তবে একটু বুঝিয়েই বলুন।

কুলদা পণ্ডিত—অর্থাৎ স্ত্রী-সুখ।

সূর্যবাবু হাসে—অ্যাঁ, সেটা আবার কী?

কুলদা পণ্ডিত—ঐকান্তিকী অনুরাগিণী স্ত্রীর বিশুদ্ধ প্রণয়ের ভোক্তা হোয়ে এ'র জীবন নিয়তসুখে চমৎকৃত হবে।

চন্দ্রবাবু—তাহলে আমরা দুজনে কি স্ত্রীর অশুদ্ধ প্রণয়ের ভোক্তা?

হেসে ফেলেন কুলদা পণ্ডিত—ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারলাম না বোধ হয়। আপনাদেরও অপরাহত স্ত্রীসুখ। শুধু দু'একবার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সামান্য একটু ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার, একটু ক্ষণভ্রান্তিযোগ আছে।

সূর্যবাবু—আপনি কী এমন নতুন কথা বললেন, পণ্ডিত মশাই। ক্ষণ-ভ্রান্তিযোগ তো লেগেই রয়েছে, প্রায় রোজই। মন দিয়ে একটা নভেল পড়ছি দেখতে পেলেই মহিলা সন্দেহ করেন, লোকটার চরিত্তির বুঝি খারাপ হয়েছে।

কুলদা পণ্ডিত—ওই ওই, ওই রকমই সামান্য একটু-আধটু ভুল উষ্মা; তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু অনুপমবাবুর জীবনে ওটুকুও নেই। অনুপম-বাবুর জীবনে স্ত্রী হলেন রসশাস্ত্রের মুগ্ধা নায়িকার মত নারী।

চন্দ্রবাবু—তার মানে, স্বামী রাত করে বাড়ি ফিরলেও কখনও জিজ্ঞেস করবে না, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

কুলদা পণ্ডিত—হ্যাঁ তাই। কিন্তু আপনারা আমার কথাগুলিকে এত লঘুভাবে নিচ্ছেন কেন? স্বামিভাগ্যে চিরকাল সুখী থেকে, শেষে স্বামীর কোলে মাথা রেখে, আর স্বামীরই মুখের দিকে একবার হাসিমুখে তাকিয়ে নিয়ে মরে যাবেন, এরকম এক সৌভাগ্যবতী নারীর স্বামীর কররেখার মধ্যে... এই দেখুন একবার অনুপমবাবুর হাতের দিকে একবার তাকিয়ে, ঠিক যব-শীর্ষের মত দেখতে এইরকম একটি রেখা থাকে।

সূর্যবাবু হাসেন—বোঝা গেল, অনুপমের একদিন বিপত্নীক হতে হবে, আর আমরা দুজনে চিরকাল সপত্নীক থেকে মরে যাব। এই তো?

কুলদা পণ্ডিত হাসেন—হ্যাঁ।

সূর্যবাবু—মন্দ কি? আপনি কী বলেন, চন্দ্রবাবু?

চন্দ্রবাবু—একটুও মন্দ নয়। খুব ভাল।

অনুপমের হাত ছেড়ে দিয়ে এইবার অনুপমের মুখের দিকে তাকান কুলদা পণ্ডিত।—আপনার হাতে যা দেখলাম, ঠিক তার উল্টোটি দেখেছিলাম আর একজনের হাতে।

অনুপম—বেচারা!

কুলদা পণ্ডিত—প্রায় তিন বছর আগে একদিন পার্ক-সার্কাসে ইউ পি'র করমপুর স্টেটের কুমারসাহেবের বাড়িতে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কুমারসাহেবের ছেলেদের পড়াতেন ওই ভদ্রলোক। বেশ বিদ্বান মানুষ, গুণী মানুষ, ছাত্রজীবনে দুবার সোনার মেডেল পেয়েছেন। বয়সেও, ধরুন, আপনার চেয়ে কিছু ছোট কিংবা বড়। দেখতে শুনতেও বেশ। খুব সুখী আর খুশি

চেহারা। সে ভদ্রলোকের হাত একবার দেখে নিয়েই আমি বলে দিয়েছিলাম—আপনার সব হবে, শুধু স্ত্রীসুখ হবে না। আপনি বিয়ে করলে ভুল করবেন। কারণ, আপনি কোনদিন হয়তো একটা নতুন কোহিনুর কুড়িয়ে পেতে পারেন, কিন্তু নারীর ভালবাসা কোনদিন পাবেন না।

অনুপম—কথাটা মুখের ওপর বলে দিতে পারলেন?

কুলদা পণ্ডিত—আমি প্রথমে কিছুই বলতে চাইনি। কিন্তু ভদ্রলোক যখন নিজেই বেশ একটু গর্ব করে বললেন, যা বলতে চান, বলেই ফেলুন না কেন, ভয় করছেন কেন, তখন বলেই দিলাম।

চন্দ্রবাবু—আপনার কথা শুনে ভদ্রলোক কী বললেন?

কুলদা পণ্ডিত—শুধু হাসলেন আর বললেন, আমি বিয়ে করেছি।

সূর্যবাবু—ভুলটা তাহলে আগেই করে রেখেছিলেন ভদ্রলোক।

কুলদা পণ্ডিত—হ্যাঁ, কিন্তু আমার গণনার ভুল ধরতে চেষ্টা করবেন না, সূর্যবাবু। কালই সন্ধ্যাবেলা সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা হয়ে গেল। বুঝলাম, আমার গণনা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন?

চন্দ্রবাবু—কী বললেন ভদ্রলোক?

কুলদা পণ্ডিত—ভদ্রলোক ভাঙেন তো মচকান না। বিষণ্ণ হতাশ শুকনো একটা মুখ: তবু জোর করে হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে; আপনি অনেকদিন আগে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। বলতে বলতে আর পাগলের মত হাসতে হাসতে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

অনুপমের হাতের কলম যেন অনুপমের চোখেরই মত খুব খুশি হয়ে আর ব্যস্ত হয়ে চেক লিখে ফেলে, এক'শো এক টাকা। কুলদা পণ্ডিতের হাতে চেকটা ধরিয়ে দিয়ে অনুপমের গলার স্বরও নিবিড় হয়ে হাসে—আসুন, পণ্ডিত মশাই।

কুলদা পণ্ডিত উঠে দাঁড়ান—আমি এখন তবে আসি।

ঘরের মেজেতে একটা মাদুরের উপরে স্তব্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে রুগ্না এক নারীর শরীর। তারই কাছে এগিয়ে এসে আর তারই মাথাটাকে খুব মৃদুভাবে একবার ছুঁয়ে নিয়ে ডাক দেয় অজয়—সরযূ, ডাক্তার এসেছেন।

চোখ মেলে তাকায় সরযূ। ডাক্তারও এগিয়ে আসেন। মেজের উপর নিজেও লুটিয়ে বসে পড়েন, আর রোগিণীর মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ

তাকিয়ে থাকেন। রোগিণীর গলার শুকনো পেশীর উপর আস্তে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন ডাক্তার। তারপর ব্যাগ থেকে একটা তরল ওষুধের শিশি আর ছুঁচমুখো সিরিঞ্জ বের করলেন। ইঞ্জেকশন দিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—দু' ঘণ্টা পরে আমার ডিসপেন্সারিতে এসে পেশেণ্টের অবস্থার কথা জানিয়ে দিয়ে যাবেন, মশাই।

দুটো ঘণ্টা শেষ হবার আগেই কথা বলে সরযূ—কোথায় গিয়েছিলে? কেন এত ছুটোছুটি করছো?

সরযূর কথার কোন জবাব না দিয়ে সেই মুহূর্তে ঘরের ভিতর থেকে যেন ছুটে বের হয়ে যায় অজয়। ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে গিয়ে খবর জানায়—কথা বলছে পেশেণ্ট।

ডাক্তার খুশি হয়ে হাসেন।—সুখবর। তবু বলছি, পেশেণ্টকে বেশি কথা বলতে দেবেন না। যা বলবার, তা ওই স্লেট-পেন্সিলেই লিখে বলা ভাল।

ঘরে ফিরে এসে সরযূর হাতের কাছে একটা স্লেট রাখে অজয়। স্লেটের উপর সরযূর ডান হাতটাকে তুলে দিয়ে, হাতের কাছে একটি পেন্সিলও রেখে দেয়।

সরযূর রোগা শুকনো হাতটা কাঁপতে কাঁপতে লেখে—পাপিয়া কোথায়?

অজয় বলে—পাপিয়া ঘুমিয়ে আছে। ঘুম ভাঙুক, তারপর ওকে খাওয়াবো। আমিও খেয়ে নেব।

সরযূ লেখে—ঘরে খাবার আছে?

অজয়—খুব আছে। অনেক আছে। তুমি সেজন্যে একটুও চিন্তা করবে না। আজই সকালবেলা একটিন বিস্কুট এনেছি। দুটো পাঁউরুটি এনেছি। আর একটু পরেই বের হব, আধ সের গরম দুধ কিনে নিয়ে আসবো। তা ছাড়া, তোমারও একটা খাবার আনতে হবে।

সরযূ লেখে—না।

অজয়—না বললে চলবে কেন? ডাক্তার রাগ করবেন। ডাক্তার বলেছেন, তোমাকে এখন গ্লুকোজ খেতে হবে।

মদনমোহনতলার কাছে ঠাকুরবাড়ি লেন। এই লেনের পথে রাত্রির অন্ধকারে কোন-কালেও আলোর উৎপাত ছিল না। শুধু লেনের মুখের কাছে একটা ল্যাম্পপোস্ট আছে। মাসখানেক আগে একটা রাত্রিতে, মাতাল গুণ্ডার মারামারির চোট ওই ল্যাম্পপোস্টের উপরেও পড়েছিল। একটা সোডার বোতল ছুটে গিয়ে ল্যাম্পপোস্টের মাথার উপর আছড়ে পড়েছিল। তাই বাতিটা ভেঙে আর টুকরো-টুকরো হয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে।

ঠাকুরবাড়ি লেনের এই পথে কলকাতার আকাশের চাঁদও এককুচো আলো ছড়িয়ে দিতে পারে না। পথটা খুবই সরু, আর দুপাশের বাড়িগুলির মাথা

খুব কম উঁচু নয়। অজয়ের মেয়ে, চার বছর বয়সের ওই পাপিয়াও এই গলির রাত্রির অন্ধকারে গুটগুট করে হাঁটতে পারে। কালও সন্ধ্যাবেলায় একবার হেঁটে হেঁটে গলির মুখের কাছে ওই অন্ধ ল্যাম্পপোস্টের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল পাপিয়া। দেখতে চেয়েছিল, বাবা বাড়ি ফিরে আসছে কিনা। আর, দেখতে পেয়েই হেসে ফেলেছিল, সত্যিই বাবা আসছে।

—ছি পাপিয়া, তুমি আবার এখানে এসে দাঁড়িয়েছ কেন? হেসে হেসে আর মিষ্টি করে একটা ধমক দিয়েই পাপিয়াকে কোলে তুলে নেয় অজয়। পাপিয়ার পায়ের ধুলো এক হাতে মুছে দিয়ে আবার সেই পায়েরই উপর হাত বোলায় অজয়। মেয়েটার পায়ের পাতা দুটো কেন যে এই একটা মাস ধরে এরকম ফোলা-ফোলা হয়ে রয়েছে, কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। অনেক দিন আগে ডাক্তার বলেছিলেন, এ মেয়ের পুষ্টির খুব অভাব। এখুনি আপনার একটু সাবধান হওয়া দরকার, মশাই। ফল আর দুধ একটু বেশি করে খাওয়াবেন।

চেষ্টা তো করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে পাপিয়ার ফল আর দুধও যোগাড় করতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু মনে হয়, আরও চাই।

কিন্তু ওই ফল আর দুধ যেন মেয়েটার চক্ষুর বিষ। খেতেই চায় না। খাওয়াতে গেলে চেঁচিয়ে ওঠে। ওর লোভ শুধু ভাতের উপর। বেগুনভাজা হলে তো রক্ষেই নেই; মাঝ রাতেও ঘুম থেকে জেগে উঠে ভাত খাওয়ার জন্যে বায়না ধরে।

ঠাকুরবাড়ি লেনে আর যারা থাকে, তাদের চোখে এই অজয়বাবু একটি অদ্ভুত রহস্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেই তো বোঝা যায়; বেশ শিক্ষিত বিদ্বান মানুষ। সুমন্ত নামে ছেলেটি, কলেজে পড়ে যে ছেলে, সে তো অনেক-দিন আগে অনেকেরই কাছে বলে বলে একটা অদ্ভুত সত্য কথার বিস্ময় ছড়িয়ে দিয়েছে। এই অজয়বাবু একজন ভাল স্কলার, গোল্ড মেডালিস্ট।

কী আশ্চর্য, এরকম একজন বিদ্বান মানুষ এত গরীব হয়ে ঠাকুরবাড়ি লেনের সব চেয়ে রোতো একটা ঘরের ভাড়াটে হয়ে পড়ে আছে কেন?

একটা সন্দেহকেও সুমন্ত রটিয়েছিল। ভদ্রলোক বোধহয় একজন খুব বড়-লোকের পলাতক ছেলে। বাপের উপর রাগ করে এমন এক জায়গায় এসে লুকিয়েছে, যেখানে চোখ পড়লে পুলিসের বাবাও সন্দেহ করতে পারবে না যে, মোষের খাটালের পাশে একটা ঘরে কোন বড়লোকের ছেলে লুকিয়ে থাকতে পারে।

সুমন্তর বাবা ইন্দ্রবাবু কিন্তু অন্যরকমের একটা সন্দেহ রটিয়েছেন। ওরা কি সত্যিই সত্যিকারের স্বামী আর স্ত্রী?

না মশাই, না। হতেই পারে না। ব্যাপারটা নিশ্চয়, ওই যাকে বলে, ঠেকে

গেছি প্রেমের দায়ে। আগে ফে'সেছে, তারপর বেধেছে, তারপর পালিয়ে এসে লুকিয়েছে।

ইন্দ্রবাবুর রূঢ় সন্দেহটা নিজের ইচ্ছামত কল্পনা করে অনেক বাজে কথা রটিয়েছে বটে; কিন্তু সব সত্যি কথা জানতে পারলেও তিনি বোধহয় বলবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই একই ব্যাপার; এমন কিছু ভুল কথা বলিনি।

পুলিসের সেই চমৎকার অফিসার বসন্ত দত্ত, আর, তাঁর দাদা আশু দত্ত, শ্রীনগরে যাঁর ওষুধের দোকানের লাভের হিসাবের খাতাটাকে চমৎকার একটা টাকাভারি ভাগ্যের হিসাব বলা যায়; তাঁদের দুজনের কেউই আজ বলতে পারবেন না, এখন কোথায় আছে আর কী অবস্থায় আছে, তাঁদের একমাত্র বোন, যার নাম সরযূ। তাঁরা শুধু জানেন যে, নিতান্ত একটা অপদার্থকে বিয়ে করেছে সরযূ, আর কলকাতাতেই আছে। কত করে বোঝানো হলো, তবু বুঝলো না। আদর করে বলা মিষ্টি কথার যত অনুরোধ; সবই বিফল হলো। ধমক দিয়ে আর ভয় দেখিয়েও কোন লাভ হলো না। করমপুর স্টেটের এক কুমারসাহেব, কীই বা তার আয়! দেনার দায়ে সাতপুরুষের সাতটা তরবারির সোনার খাপ বেচে দিয়েছে, তবু দেনা শোধ হয়নি। এহেন অপদার্থ এক কুমারসাহেবের বাড়িতে বাচ্চা ছেলেদের প্রাইভেট টিউটর, এক'শো টাকা মাইনে পায়, এরকম একটা মানুষকে বিয়ে করতে কেমন করে যে রুচি হলো সরযূর মত মেয়ের, সেটা বোধহয় পাগলের চিকিৎসার ডাক্তারেরাই ঠিক-ঠিক কিছুটা বলতে পারেন।

ছাত্রজীবনে দু'বার দুটো সোনার মেডাল পেয়েছে আর খুব লেখা-পড়া শিখেছে; এ ছাড়া অজয় সরকারের জীবনের আর সবই যে ফাঁকা আর ফাঁকি। বাপ নেই, মা নেই, ভিটে-মাটি নেই; একটা অনাথ গে'য়ো ছেলে কলকাতাতে এক কুটুমবাড়ির দয়াতে ভাত খেয়ে বে'চেছে আর খুব ভাল করে বি-এ পাস করেছে। ওর ছাত্রজীবনের সেই সোনার মেডাল দুটো কি এখনও আছে? নেই; মেসের বকেয়া পাওনার টাকা শোধ করতে গিয়ে সেই অপদার্থের জীবনের ওই সামান্য ও ছোট্ট দুটো সোনার টুকরোও কবেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

অজয়ের বিদ্যের রূপ দেখে সরযূর মত মেয়ের মুগ্ধ হবারই বা কী আছে? সরযূও তিনবার ফার্স্ট হয়েছে। সোনার মেডাল না-ই বা পেল সরযূ, ওর কানের একজোড়া সোনার দুলের দাম যে অজয়ের দুটো মেডালের সোনার দামের চেয়ে অন্তত দুই গুণ বেশি হবে।

কলকাতাতে যতদিন কলেজ খোলা থাকে, ততদিন কলকাতাতে; আর, কলেজ বন্ধ হলেই কাশ্মীরের শ্রীনগরে; সরযূর জীবনটা যেন একটা শখের নিয়মে চলাফেরা করে। ঠিকই, একটা শখ বইকি! সেটা কিন্তু বড় দাদা আর

ছোট দাদার দুজনের একজনও ঠিক বুঝতে পারেন না। তাই ছোট দাদা, রায়সাহেব বসন্ত দত্ত বলেন,—এত ভাল ভাল সাবজেক্ট থাকতে তুই বোটানি নিতে গেলি কেন?

—তুমিই বল, কী সাবজেক্ট নিলে ভাল হতো।

—রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্।

—ওরকমের কোন সাবজেক্ট নেই।

—নেই? সিলেবাসের মধ্যেও কি ওরা ঢুকে বসে আছে?

—জানি না। আমি কিন্তু ছুটিতে কাশ্মীর যাবই।

—কাশ্মীরেই বা এত দেখবার কী আছে?

বড়দাদা আশু দত্ত বলেন—তুই যদি এখানে এসেও ঘরে বসে থাকিস, আর, যত কবিতার বই পড়ে সময় নষ্ট করিস, তবে এখানে এলি কেন? একটু বেড়িয়ে আয়।

বেড়িয়ে আসতে ভালই লাগে। চশমাশাহী আর নিশাতবাগের নতুন-ফোটা ফুলগুলিকে দেখতেও ভাল গালে। সিটি থেকে বেশ দূরে, ঝিলমের স্রোতের কাছে দাঁড়িয়ে নিকটের একটা পাহাড়ের গায়ে আপেলের ফুলের সাদাটে শোভা দেখতেও মন্দ লাগেনি। কিন্তু আর কত ভাল লাগবে? তার চেয়ে অনেক বেশি ভাল লাগে ঘরে বসে কবিতার বই পড়তে। কলকাতাতে গিরিজাবাবু, যিনি বাড়িতে এসে সরযূকে পড়িয়ে যান, তিনি সরযূর টেবিলের উপরে একদিন একটা ছড়ার বই দেখতে পেয়েই খুব রাগ করেছিলেন।—তুমি তবে বোটানি নিলে কেন, যখন কাব্যে-টাব্যে তোমার এত শখ?

সরযূ—এটা ভুলুর ছড়ার বই, আমার নয়।

গিরিজাবাবু তখনি টেবিলের একপাশে রাখা সরযূর কলেজের পড়ার বইয়ের একটা গাদার ভিতর থেকে টেনে টেনে আর বেছে বেছে চারটে বই বের করেন। থেরীগাথা, বলাকা, লাইট অব এশিয়া, শকুন্তলা।

—এগুলোও কি ভুলুর বই?

শখটা যেন সরযূর রক্তমাংসেরই একটা মরজি। কবিতা মুখস্থ করবার জন্যে রাত জাগতেও সরযূর ভাল লাগে।—গগনে অব ঘন মেহ দারুণ, সঘন দামিনী ঝলকই। তখন সত্যিই মাঝরাতের বৃষ্টির জল ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা লেগে রায়সাহেব বসন্ত দত্তের কলকাতার বাড়ির একটি ঘরের বন্ধ জানালার কাচের উপর আছড়ে পড়ছে। রাউন্ড থেকে ফিরে এসে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে রায়সাহেব বসন্ত দত্তের দুই চোখ ওই বন্ধ জানালার কাচের আলোর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে, তাঁর খামখেয়ালী বোনের মাথায় এতদিনে একটু দায়িত্ববুদ্ধি জেগেছে; রাত জেগে পরীক্ষার পড়া পড়ছে সরযূ।

সে মেয়ের খামখেয়াল যে একদিন এত ভয়ানক রকমের একটা চেহারা নিয়ে

দেখা দেবে, সেটা দুই দাদার একজনও কখনও কল্পনা করতে পারেননি। কলকাতা থেকে শ্রীনগরে বেড়াতে এসেছিল সরযূর কে-না-কে এক বান্ধবী। কিন্তু সেই বান্ধবী বেচারীর কোন দোষ নেই। এক মাস হলো বিয়ে হয়েছে, তাই বরের সঙ্গে বেড়াতে বের হয়ে শ্রীনগরে এসে ডাল লেকের একটা হাউস-বোটে ছিল। সরযূ তখন শ্রীনগরে ছিল বলেই চিঠি দিয়ে সরযূকে হাউসবোটের ঠিকানা দিয়েছিল আর চা খেতে নেমন্তন্নও করেছিল। বাস্, তারপর কেমন করে কী যে হলো, কিছুই ধরতে বুঝতে পারা গেল না। শুধু জানতে পারা গেল, সরযূ ওর ভাগ্যের মাথা চিবিয়ে খাওয়ার জন্যে গোঁ ধরে বসেছে। ওই হাউসবোটেই তো অপদার্থটার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল সরযূর।

আজ সেই সরযূর জন্যে গ্লুকোজ কিনতে যাবে বলে এখন কলকাতার ঠাকুরবাড়ি লেনের খাটাল-ঘেঁষা একটা ঘরে, খাটের বিছানার একটা বালিশের তলা থেকে টাকা বের করেছে, তবু সরযূর মুখের দিকে তাকিয়ে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে কিন্তু সবই জানে, কিছুই ভুলে যায়নি। সবচেয়ে আশ্চর্য, আজও একবার ভোর হতেই সরযূ যখন কোনমতে হাত নেড়ে ইশারায় বলেছিল, জানালাটা খুলে দাও; ঠিক তখন জানালাটা খুলে দিয়েই আর সরযূর মাথায় হাত বুলিয়ে গল্প করতে চেষ্টা করেছে অজয়—মনে আছে তো তোমার, সেদিন তখন......কী যেন সেই হাউসবোটের নামটা, হ্যাঁ, হামেশা বাহার; আকাশে একটুও কুয়াশা ছিল না।

হামেশা বাহার, একটি চমৎকার সৌখীন হাউসবোট। সেই হাউসবোটের এদিকের ঘরের অতিথি ছিলেন যাঁরা, তাঁরা হলেন সরযূর বান্ধবী রমলা ও তার স্বামী সঞ্জয়বাবু। ওদিকের ঘরে অতিথি ছিলেন চারজন; একজন অবাঙালী কুমারসাহেব, তাঁর দুই বাচ্চা ছেলে আর ঢিলে-ঢালা ফ্লানেলের পায়জামা পরা একজন। ওই ঢিলে-ঢালা পায়জামা পরা লোকটি তখন হাউসবোটের লাউঞ্জের একটি সোফায় বসে হিন্দী খবর-কাগজ পড়ছিলেন। আর, দূরের সোফাটার উপরে রমলার পাশে বসে ফিস-ফিস করে গল্প করছিল সরযূ। গল্প করতে করতেই চেঁচিয়ে হেসে উঠলো সরযূ।—খোঁপার ফুল কি হাতে ধরিয়ে দিতে হয়? বুকে না হোক, অন্তত বুক-পকেটে গুঁজে দিতে পারতে।

তারপর আর অত জোরে না চেঁচিয়ে, বরং গলার স্বর একটু মৃদু করে নিয়ে সরযূ বলে—বরও যখন নিজেই যেচে তোমাকে বর দিতে চাইছেন, তখন তুমিই বা চাইতে ছেড়ে দেবে কেন?

রমলা—কিন্তু কী যে ছাই চাইবো, বুঝতে পারছি না।

সরযূ—তবে বলবো? শিখিয়ে দেব, কী চাইতে হবে?

রমলা—বল।

সরযূ—এই বর দেহ মোরে, সদা যেন দেখু তোরে, আর কোন নাহিক

বাসনা। এই সুখমণি দিবা, আপন নিকটে নিবা...। এ কী হলো, শেষটা মনে আসছে না কেন?

ঢিলে-ঢালা ফ্লানেলের পায়জামা, সেই লোকটা হাতের হিন্দী খবর-কাগজ নামিয়ে রাখে, আর হেসে-হেসে সরযূর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে।—এই সুখমণি দিবা, আপন নিকটে নিবা, তোমা মিলায় তোমার করুণা।

চমকে ওঠে সরযূ, লজ্জা পায়; সে লজ্জায় মুখটাও লাল হয়ে যায়। তারপর অজয়ের সঙ্গে কথাও বলে। সে কথাও যেন নিজেরই মনের একটা বিস্ময়ের মত এলোমেলো কথা।—আপনি এরকম আশ্চর্যভাবে এখানে কেমন করে এলেন?

অজয়—আমি এই কুমারসাহেবের ছেলেদের টিউটর। কলকাতা থেকে এসেছি।

সরযূ—কলকাতাতেই থাকেন?

অজয়—হ্যাঁ।

তারপর কেমন করে কী যে হলো, তার অনেক খবর রমলা আর রমলার স্বামী সঞ্জয়ও জানে। এরা দুজনেও সরযূকে বুঝিয়ে বলতে আর নিরস্ত করতে কিছু কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু কিছুই বুঝতে চায়নি সরযূ। শ্রীনগর থেকে কলকাতাতে ফিরে এসে সরযূ ওই অজয়েরই কাছে পুরো দুটি বছর ধরে ওর যত স্বপ্নের চিঠি পাঠিয়েছে।

খুব ভয় পেয়েছিল রমলা, যেদিন রমলারই বাড়িতে অজয় আর সরযূর বিয়ে হয়ে গেল। সঞ্জয়, সঞ্জয়ের ভাই নির্মল আর রমলা, তিনজনেই মুখ কালো করে রেজিস্ট্রারের সামনে বসে বিয়ের সাক্ষী হয়ে খাতায় নাম সই করেছিল। তখন শ্রীনগরের আশু দত্ত আর কলকাতার লেক রোডের বসন্ত দত্ত, দুজনের কেউই জানতেও পারেননি যে, তাঁদের একমাত্র বোনের বিয়ে হয়ে গেল।

রায়সাহেব বসন্ত দত্ত জানতে পারলেন, বিয়ের দশ ঘণ্টা পরে, সরযূ নিজেই যখন টেলিফোনে খবরটা জানিয়ে দিল আর ক্ষমা চাইতে গিয়ে কেঁদে ফেললো। শ্রীনগরের আশু দত্ত জানলেন, বিয়ের সাত দিন পরে।

না, দুই দাদার কেউই আর সরযূকে ক্ষমা করতে পারেননি। দুজনেই বলেছিলেন, আর যেন ওর মুখ দেখতে না হয়। রমলার স্বামী সঞ্জয়ও খুব দুঃখিত হয়ে আক্ষেপ করেছিল, কবিতা নিয়ে ভালবাসাবাসি চলতে পারে, কিন্তু পেট চলতে পারে না। তোমার বন্ধু কিন্তু এই সোজা কথাটা একেবারেই বুঝতে চাইল না, রমলা।

রমলার অবশ্য আরও কয়েকবার সরযূর মুখ দেখতে হয়েছে। এক বছরের মধ্যে তিনবার দেখা হয়েছিল। শেষ যেবার দেখা হলো, সেবার সরযূর মুখের একটা কথা শুনে যেমন একটু আশ্চর্য তেমনই একটু খুশিও হয়েছিল রমলা।

সত্যিই, যেন একটা গর্বে ভরা উল্লাসের কথা—আমি চাকরি করছি, রমলা। মেয়ে-স্কুলের টিচার।

রমলা—কোথায় আছ এখন?

সরযূ—বেলেঘাটা।

বলা ভাল, কপালঘাটা। দুটো ছন্নছাড়া বাতিক এক ঠাঁই হয়ে থাকতে পারলেই বেলেঘাটার কোন ঘর একটা স্বর্গ হয়ে যেতে পারে না। প্রাইভেট টিউটর হয়ে ছেলে পড়ানো ছাড়া অজয় সরকারের কপালে আর কোন কাজ জোটেনি। আর, একবছর বয়সের পাপিয়ার কাকলি একটু বেশি মিষ্টি হয়ে উঠতেই সরযূর চাকরিটাও গেল। এক বছরের মধ্যে একশো এগার দিন কামাই, এমন একটা অকর্মণ্যতাকে ভাল-ভাল মায়ার কথা দিয়ে আর কবিতা করে বোঝাতে চেষ্টা করলেও কেউ বুঝবে না, ক্ষমাও করবে না। বেলেঘাটার সেই মেয়ে-স্কুলও ক্ষমা করতে পারেনি। তার পর থেকে সরযূর গলার ভিতরে একটা ব্যথা। এই ব্যথাটাকেও বুঝতে ও চিনতে কোন চেষ্টা না করে পুরো দুটো বছর কাটিয়ে দেবার পর; আজ এই এক মাস হলো ডাক্তার দেখাবার পর বুঝতে হয়েছে; ওটা বোধহয় ক্যান্সারের লক্ষণ।

পাপিয়ার জন্য আধসের গরম দুধ, আর সরযূর জন্য এক বোতল গ্লুকোজ এখন এনে ফেললেই তো হয়। আর দেরি করবার তো কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু একটু দেরি হয়েই গেল। কারণ, মেজের মাদুরের উপর সরযূর শয়ান শরীরটা আস্তে আস্তে উঠে বসে। অজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সরযূর চোখ দুটো হাসতেও থাকে। তারপর স্লেটের উপরে লিখেই ফেলে সরযূ—আজ বাইরে যাবার আগে পাপিয়াকে চুমো খেয়েছিলে?

অজয়—হ্যাঁ।

সরযূ লেখে—আমাকে?

অজয় হাসে—নিশ্চয়। তুমি টের পাওনি। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

সরযূর চোখে যেন একটা ধূর্ত হাসির ছায়া কাঁপে।—কপালে খেলে কেন?

অজয়—তাই বল। কপট নিদ্রা।

সরযূ লেখে—আমার কথার জবাব দাও।

অজয়—তোমার ঘুম ভেঙে যাবে বলে ভয় ছিল, তাই শুধু...।

অজয়ের কথা শেষ না হতেই সরযূ লেখে—সত্যি তো?

অজয় হাসে—বাঃ, তোমার কপট ঘুমের জন্য আমিই ঠকলাম; আর উল্টো আমাকেই তুমি জেরা করছো? সন্দেহ করছো, আমার ভুল?

সরযূ লেখে—ভুল তো একবার করেছিলে।

অজয় আশ্চর্য হয়—কবে? কোথায়? ও হ্যাঁ। বেলেঘাটার বাড়িতে, যেদিন তুমি হাসপাতালে চলে গেলে, সেদিন। তাই না?

সরযূ মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।

অজয়—উপায় ছিল না। তুমি দেখতে পাওনি, আমি দেখতে পেয়েছিলাম, পাশের বাড়ির মহিলা তখন একেবারে দরজার কাছে এসে পড়েছিলেন।

সরযূ লেখে—রাত হলো।

বাইরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে অজয়। বোধ হয় হঠাৎ বুঝতে পেরেছে দুজনেই, এখন এভাবে জীবনের যত চুমোর হিসেব করতে থাকলে রাত আরও বেড়ে যাবে। দোকান বন্ধ হয়ে গেলে গ্লুকোজ পাওয়া যাবে না, আধসের গরম দুধও পাওয়া যাবে না।

ঘুমন্ত পাপিয়ার গলার স্বর ঘড়ঘড় করছে। জাগলো নাকি মেয়েটা? এগিয়ে যেয়ে পাপিয়ার বিছানার মাথার কাছে দাঁড়ায় অজয়।—এ কি? পাপিয়া যে সত্যিই চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। কিন্তু এ কী রকমের অদ্ভুত চোখ। আর গলা থেকে ওরকম একটা অদ্ভুত শব্দই বা কেন বের হচ্ছে?

অজয় ডাকে—পাপিয়া!

একটা হেঁচকি তোলে পাপিয়া। খোলা চোখ দুটোও হঠাৎ সাদা হয়ে কাঁপতে থাকে।

অজয় বলে—তুমি একটু চেষ্টা করে হেঁটে এসে পাপিয়ার কাছে একটু বসো, সরযূ। পাপিয়া কেঁদে উঠলে ওকে একটু মিষ্টি কথা বলে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করো। আমি এখনই আসছি।

ঠাকুরবাড়ি লেনের অন্ধকার গায়ে মেখে, আর প্রায় ছুটে ছুটে চলতে থাকে অজয়। আধসের গরম দুধ কেনবার জন্যে নয়; এক বোতল গ্লুকোজ কেনবার জন্যেও নয়। একজন ডাক্তার ডেকে আনবার জন্য। আর-একটু হলে অন্ধ ল্যাম্পপোস্টের গায়ের উপর পড়ে একটা ধাক্কা খেত অজয়। কিন্তু সামলে নিয়েই আবার চলতে থাকে।

গুপ্তিপাড়ার চৌধুরীদের বাগান, যার নাম রাজার বাগান, তার চারদিকে, আজ নতুন কাঁটাতারের বেড়া। হাজরা মশাই কিনে নিয়েছেন ওই বাগান। লোকে বলে, বাগানটাকে একেবারে জলের দামে পেয়ে গিয়েছেন হাজরা মশাই। কিন্তু হাজরা মশাই বলেন—ডাহা ঠকে গিয়েছি, মশাই।

গুপ্তিপাড়ার বাড়ির বড় ঘরে; দেয়ালের এক জায়গায় খসে পড়া পালেস্তারার মাঝখানে এখনও সেই বিখ্যাত মেজাজের মানুষ বিজয় চৌধুরীর শক্ত চেহারার রঙীন অয়েল পেণ্টিং ঝুলে রয়েছে। বন্দুক হাতে নিয়ে আর

হাতীর পিঠের উপর বসে বিজয় চৌধুরী হাসছেন। তিনি যদি আজ ওই ছবির চোখেই দেখতে ও বুঝতে পারতেন যে, তাঁর ছেলে পরেশ চৌধুরী এই দশদিন হলো তিনপুরুষের রাজার বাগান বিক্রী করে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে, তবুও তিনি হাসতেন। তিনি নিজেও যে ঠিক এই কাণ্ডটি করতেন, যদি আজও বেঁচে থাকতেন।

দেনার দায় মেটাতে গিয়ে পরেশ চৌধুরীর ওই পাঁচ হাজার টাকার সাড়ে চার হাজারই ব্যাঙ্কের ঘরে চলে গিয়েছে। তিনশো টাকা খরচ করতে হয়েছে আর একটা কাজের দায় মেটাতে গিয়ে। এটাও বলতে গেলে গুপ্তিপাড়ার এই চৌধুরীদের তিন পুরুষের জীবনের একটা মেজাজের কাজ। হাজরা মশাই সবই জানেন, তাই মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলেও থাকেন—সাহেব পিটিয়েই ফতুর হয়ে গেল চৌধুরীরা।

এমন কিছু মিথ্যে কথা বলেননি হাজরা মশাই। একটু বাড়িয়ে বলেছেন, এই মাত্র। ওই কর্মটি বিজয় চৌধুরীও করতেন। এই পরেশ চৌধুরীও অনেক করেছেন। আর বলাই চৌধুরী তো এখনও করেই বেড়াচ্ছেন। ধর্মতলাতে একটা রাগী গোরা সোলজারকে চড় মেরে বেহুঁস করে দিয়েছিল বলাই, এই বছরেই পুজোর একটা দিনে। গ্রেপ্তার হয়েছিল, জামিনে ছাড়া পেয়েছিল, আর দাঙ্গার মামলার আসামী হয়েছিল বলাই। বলাইকে কড়া ওয়ার্নিং দিয়েছেন আর তিনশো টাকা জরিমানা করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট। কালই কলকাতায় গিয়ে জরিমানার টাকা আদালতে জমা করে দিয়েছে বলাই। সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এসে আর একডালা মুড়ি খেয়ে নিয়েই টাটানগর চলে গিয়েছে। আজকাল টাটানগরে থাকে আর চাকরি করে বলাই। দিন প্রতি মেহনতের দাম পাঁচ টাকা; একটা কারখানার লেদ-মেশিনের ঘরে কাজ করে; ওভারম্যান বলাই চৌধুরী।

পরেশ চৌধুরী যে স্কুলের ফোর্থ ক্লাসেই পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার আসল কারণও হলো এই মেজাজ, সাহেব দেখলেই যে-মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আর কপালের রগ ফুলে ওঠে। স্কুলের সাহেব ইনস্পেক্টর ছেলেদের ড্রিল দেখছিলেন; আর দেখছিলেন, ড্রিলের সারির মধ্যেই দাঁড়িয়ে একটা ছেলে বার বার হাসছে আর সামনের ছেলেটার পিঠে চিমটি কাটছে। সাহেব ইনস্পেক্টর রুষ্ট হয়ে তেড়ে এলেন, ছেলেটার কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। ছেলেটাও সেই মুহূর্তে হাত তুলে সাহেবের গায়ে একটা ঠেলা দিল। হেড মাস্টার বললেন, মাপ চাও। ছেলেটা বললে—না। বই হাতে তুলে নিয়ে স্কুল থেকে সেই যে চলে এলেন ছেলে, তিনি জীবনে আর কোনদিন স্কুলমুখো হতে পারেননি। হতে চানও নি। তিনিই আজ পঁয়ষট্টি বছর বয়সের পরেশ চৌধুরী হয়ে আর বিক্রী-করা রাজার বাগানের নতুন কাঁটাতারের বেড়ার দিকে

তাকিয়ে ভাবছেন, ইংরেজ না গেলে, আর দেশ স্বাধীন না হলে কিছুই হবে না। যেমন অদ্ভুত যুদ্ধ, তেমনই অদ্ভুত দুর্ভিক্ষ। পাপগুলো দূর হবে কবে?

দূর হবেই একদিন। কিন্তু ততদিন কি···। বলাই তো বলে, তুমি ভেব না বাবা, তুমি স্বাধীনতা দেখেই যাবে।

ঘরের ভিতরে বসে মলিনা চৌধুরীর মনের অন্য একটা চিন্তা বেশ করুণ হয়ে কথা বলে—টাটানগরেও তো অনেক সাহেব আছে, শুনলাম।

রাণু—কোথায় শুনলেন?

—বীণা এসে বলে গেল।

—তা আপনি আর ভেবে কি করবেন?

—না ভেবে যে পারি না। ছেলে যদি আবার ওখানেও একটা কাণ্ড করে বসে, তাহলে তো এ চাকরিটাও যাবে। তোমার চিঠিতে বলাইকে একটু দিব্যি-টিব্যি দিয়ে লিখে দিও, রাণু; বলাই যেন একটু বুঝে-সুঝে চলে।

কিন্তু শাশুড়ির চিন্তার এরকম একটা করুণ স্বরের অনুরোধ শুনেও রাণুর চোখের শক্ত ভাবটা একটুও নরম হয় না। রাণু বলে—তাতে কোন ফল হবে কি? আপনিও এই বাড়ির মেজাজকে কত দিব্যি-টিব্যি দিয়ে কত বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়েছিল কি?

মলিনা—ঠিকই বলেছ। শ্বশুরকে বোঝাতে পারিনি, শ্বশুরের ছেলেকেও পারিনি। এখন কি সোয়ামীর ছেলেকেও কিছু বোঝাতে পারবো? অসম্ভব। বলে বলে শুধু হয়রানই হয়েছি রাণু। এদের মেজাজের মন কোনদিনও একটু নরম হলো না।

জাঁতিটাকে হাতে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে সুপুরি কাটেন মলিনা। রাণুর কোলে ঘুমিয়ে পড়া মণ্টুর মুখের দিকেও একবার তাকিয়ে নিলেন—ষোল বছর বয়সে বউ হয়ে এবাড়িতে এসেছি, রাণু। সব কিছু বুঝবার মত বয়স নয়, তবু অনেক কিছু বুঝেছিলাম। শ্বশুরের হাত ধরে কথা বলতে গিয়ে কতবার কেঁদে ফেলেছি—আপনি আর হাতীশিকারে যাবেন না, বাবা। আমার খুব ভয় করে। শ্বশুর তো হেসেই আকুল হলেন। বুঝতে পারলেন না যে, আমি বুনো হাতীর ভয়ের জন্য কাঁদছি না, কাঁদছি পাঁচ-দশ হাজার টাকা নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে।

মলিনাবালা চৌধুরী যেমন করে জানেন, তেমন করে আর-কেউ জানেন কিনা সন্দেহ, এই চৌধুরীদের মেজাজ কত সহজে কত টাকা নষ্ট করে দিতে পারে। বিদেশ থেকে বোমা-বন্দুক আনবার জন্যে স্বদেশীদের হাতে এক-কথায় একবার দশ হাজার টাকা দিয়ে ফেলেছিলেন যিনি, তিনি এই পরেশ চৌধুরী, যিনি এখন ঘরের বাইরের বারান্দায় পায়চারী করছেন আর নতন

কাঁটাতারের বেড়ার দিকে বার বার তাকাচ্ছেন। ওই যে হাজরা মশাই, উনিই তো তাঁর ভাগ্নীকে, বাপ-মা-মরা এক মেয়েকে একটা রুগী বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। এই পরেশ চৌধুরীই গোঁ ধরে আর জেদ করে সেই বিয়ের ব্যবস্থা ভণ্ডুল করে দিয়েছিলেন। আর, একটা মাস পরেই কোন্নগরের হৃদয়বাবুর ছেলের সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়ে দিলেন। বরপণ আর গয়নার জন্যে তিন হাজার টাকা, বিয়ের খাওয়া-দাওয়া আর আতসবাজির জাঁক করতে আরও দু'হাজার টাকা, পুরো পাঁচটি হাজার টাকা খরচ করে সেদিন মেজাজ খুশি করেছিলেন এই পরেশ চৌধুরী।

মলিনা বলেন—একবার এক সাহেবের সঙ্গে রাগারাগি করে ট্রেনের গোটা একটা ফাস্ট কেলাসের ঘরই রিজার্ভ করে তোমার শ্বশুর একগাদা টাকা···।

রাণু বলে—থামুন মা। শুনতে একটুও ভাল লাগছে না।

আজ এসব কথা শুনতে রাণুর একটুও ভাল লাগবার কথা নয়। রাণুর কোলের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে আর ঘুমিয়ে পড়েছে যে মণ্টু, তারই পিঠের উপর হাত বোলাতে গিয়ে রাণুর হাতটা যেন মেয়ের পিঠের হাড়-গুলিকে গুণতে পারছে। কত রোগা হয়ে গিয়েছে মেয়েটা।

দিনের আলো। খোলা জানালার কাছে কোন অন্ধকার জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, আর কলাগাছের পাতাটাও কোন বিভীষিকার হাত হয়ে দুলছে না। তবু যেন হঠাৎ-ভয়ে ভীরু হয়ে আর চমকে উঠে ডাক দিয়ে ফেলে রাণু—মা।

মলিনা—কি?

রাণু—বাগবাজারের খবর কি? চিঠি এসেছে?

—হ্যাঁ, এসেছে।

—কী বলে প্রতিভা?

—ভাল আছে। কিন্তু কী জানি কেন, কেমন একটু আবোল-তাবোল করে লিখেছে, আবার কবে যে তোমাদের দেখতে যেতে পারবো, জানি না।

—আর কিছু লেখেনি?

—একজোড়া হীরের দুল হয়েছে, সেকথাও লিখেছে। কিন্তু কী জানি কেন, কথাটা এত লজ্জা করে লেখার কী দরকার ছিল? ভগবানের দয়াতে সুখের ভাগ্য পেয়েছে, চিরকাল সুখী হয়েই থাকুক।···ও কি? তুমি কাঁদছো কেন রাণু?

রাণু—আপনি বুঝে দেখুন, মা। যে মেয়ে মণ্টুর ঘামাচির কথা ভেবে মন খারাপ করতো আর চিঠিতে উপদেশ দিয়ে লিখতো, ঘামাচিতে গোলাচন্দন লেপে দিও, সে মেয়ে আজ হীরের দুলের কথা লিখতে গিয়ে মণ্টুর কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছে।

মলিনা—হ্যাঁ, ভুলই করেছে। কিন্তু এটা প্রতিভার শুধু একটা ভুলই,

রাণু। আর কিছু নয়। তুমি কিছু মনে করো না।

রাণু—আমি কিন্তু মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিলাম, মন্টুকে প্রতিভার কাছে পাঠিয়ে দেব।

মলিনা চমকে ওঠেন—কেন?

রাণু হেসে ফেলে—আমি তো জানি, মন্টু আমার চেয়ে ওর পিসিকে কত বেশি ভালবাসে।

—ঠিক কথা। কিন্তু তুমিই বা মন্টুকে পিসির কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আর একেবারে খালি হয়ে থাকতে পারবে কেন?

—পারবো।

—না না; ঝোঁকের মাথায় ওসব কান্ড করতে চেয়ো না।

—ঝোঁক নয় মা। আমি খুব ভেবে আর ইচ্ছে করেই···।

মলিনা এবার রাগ করে কথা বলেন—তুমি কেমনতর মা হয়েছ, রাণু? নিজের বুক খালি করে বাচ্চা মেয়েকে পরের বাড়িতে পাঠাতে তোমার একটুও ভয় করছে না? আশ্চর্য।

—ভয় করছে বলেই তো বলছি, আমি অচল হলে মন্টুকে সামলাবে কে? আপনি পেরে উঠবেন? আপনি কি কিছু বুঝতে পারেননি? আঁচল তুলে চোখ মোছে রাণু।

এইবার মলিনাবালার চোখের রাগ-করা বিস্ময়টা ছল ছল করে।—তাই বল। বীণা এসে আজ সন্দেহ করে যে-কথাটা বলে গেল, সেটা তাহলে সত্যি।

এতক্ষণ যিনি শুধু নীরব ছায়ার মত বাইরের বারান্দায় পায়চারী করে ঘুরছিলেন, তিনিই এইবার হঠাৎ সরব হয়ে আর বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে একেবারে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ান।—সবই শুনলাম। কিন্তু মন্টু এখানেই থাকবে। পিসির কাছে যাবে না।

মলিনা—কেন?

পরেশবাবু—মন্টুর পিসি কি আদর করে মন্টুকে ডেকেছে? না ডাকলে গুপ্তিপাড়ার চৌধুরীবাড়ির কোন মানুষ কোন ব্রহ্মা-বিষ্ণুর বাড়িতেও যায় না। তুমি তোমার ওসব বাজে ইচ্ছের কথা ভুলে যাও রাণু। বলাই শুনতে পেলে তোমার রক্ষা থাকবে না।

ঠিক কথাই বলেছেন পরেশ চৌধুরী। এমন কথা না বলতে পারলে তাঁকে একজন পরেশ চৌধুরী বলে মনে হবেই বা কেন? প্রতিভা কতবার তো চিঠিতে লিখেছে, এখানে এসে আমাকে একবার দেখে যেতে কি তোমার ইচ্ছেই করে না, বাবা? মেয়ে লিখলে হবে কি? জামাই তো লেখেনি। হাজরা মশাইয়ের কাছে বেশ-একটা গর্ব করে জামাইয়ের নামে অনেক কথা বলতে পরেশ চৌধুরীর কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু বিনা আহ্বানে জামাইয়ের

বাড়িতে যাওয়া? না, ওটা চৌধুরীদের জীবনের নিয়ম নয়।

এতক্ষণ ধরে মুখ লুকিয়ে আর চুপ করে শ্বশুরের কথা শুনেছে যে রাণু, সে রাণু হঠাৎ মুখ তুলে আর শ্বশুরের দুই চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে কথা বলে—কিন্তু আপনি একটু বুঝে বলবেন তো; মেয়েটা এত রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন?

পরেশ চৌধুরী—নিশ্চয় একটা কারণ আছে।

মলিনা বলেন—ঠিকই, মেয়েটা কেমন-যেন মনমরা হয়ে মাঝে মাঝে চুপ করে বসে থাকে। ছুটোছুটি করে না। খেলাধুলো করবারও কোন চাড় দেখা যায় না।

পরেশ চৌধুরী—এটা একটা অসুস্থতা। ডাক্তার দেখানো চাই; ওষুধ খাওয়াতে হবে; কড লিভার তেল খাওয়ালে স্বাস্থ্যটা তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পারে।

রাণু—সবই তো টাকার ব্যাপার। আপনি কি পারবেন?

চমকে ওঠেন পরেশ চৌধুরী; চোখ দুটো যেন ধোঁয়াতে ভরে গিয়েছে—কি বললে?

জবাব দেয় না রাণু। কথাগুলি যেন রাণুর বুকের ভিতর থেকে ঠিকরে বের হয়ে গিয়েছে। জীবনে এই প্রথম, এর আগে কোনদিনও শ্বশুরকে কিংবা স্বামীকে এরকম একটা স্পষ্ট কথা বলতে পারেনি রাণু।

কিন্তু স্পষ্টকথা তো নয়; যেন ভয়ানক স্পষ্ট একটা আঘাত। সে আঘাতে চৌধুরীবাড়ির পুরনো মেজাজের যত ইঁট ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু না বলে তো উপায় নেই, রাণুর পেটের ভিতরেও যে একটা নতুন যন্ত্রণা, বুকের ভিতর তো আছেই। মন্টুর পিঠের হাড়গুলিকে গুণতে পারা যাচ্ছে।

ঘরের দরজা ছেড়ে আর আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেলেন পরেশ চৌধুরী। বারান্দার উপর গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বারান্দার ছায়াতে দাঁড়িয়ে থাকলেও দুপুরের ওই কাঠফাটা রোদের তেজ যেন আগুনের আঁচের জ্বালার মত গায়ে এসে লাগছে।—ওঃ, কী কড়া রোদ্দুর! পরেশ চৌধুরীর মুখে যেন অদ্ভুত একটা চাপা-ভয়ের ভাষা বিড়-বিড় করে। পঁয়ষট্টি বছর বয়সের একটা মানুষের আদুড় শরীরটা বাইরের ওই রোদের তেজ দেখে আজ যেন একটু ঘাবড়ে গিয়েছে। বেশি দূরে নয়, পুরনো দোলমঞ্চের ওদিকের ওই চারবিঘের উপর শুকনো বাঁশপাতা আর ধুলোর ঘূর্ণি নিয়ে একটা বাতাস ভুতুড়ে ফুর্তির মত ছুটে বেড়াচ্ছে।

হাজরা মশাই তো ওই চারবিঘেও কিনতে চেয়েছিলেন। এখনও বোধ হয় কিনতে চাইবেন, যদি জানতে পারেন যে, ওটাও এবার বিক্রী করে দেওয়া

হবে। কাউকে পাঠিয়ে হাজরা মশাইকে এখনি একটা খবর দিতে হয়। কিন্তু কে যাবে? কা'কে পাঠানো যায়?

সামনের পুকুরের ওপারের ঘাটের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলেন পরেশ চৌধুরী—ও বিশ্বনাথ, একবার এসে একটা কথা শুনে যাও।

বীণার দাদা বিশ্বনাথ তখন চৌধুরীপুকুরের পানাঢাকা ঠাণ্ডা জলে স্নান করে, একটা ভেজা তোয়ালে মাথায় দিয়ে, আর ঘাটের মাথার চাতাল পার হয়ে চলেই যাচ্ছিল। পরেশবাবুর ডাক শুনে তখনই মুখ ফিরিয়ে তাকায়। কিন্তু, যেন একটা অনিচ্ছায় কুণ্ঠিত হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসে।—বলুন।

পরেশ চৌধুরী—হাজরা মশাইকে এখনি একটা খবর দাও বিশ্বনাথ। বল, আমি ডেকেছি।

বিশ্বনাথ বলে—আমার সময় নেই। আপনি আর-কাউকে বলুন।

পরেশ চৌধুরী—তোমার এখন কাজ আছে?

—আছে বইকি। কলকাতায় গিয়ে ঠিক সময়মত নীলামে হাজির হতে না পারলে আমার বেশ ক্ষতি হয়ে যাবে।

—কত ক্ষতি হতে পারে?

—পঁচিশ টাকা।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে পঁয়ষট্টি বছর বয়সের ঘোলাটে চোখের তারা—আমি তোমাকে একশো টাকা দেব। যাও, এখনি গিয়ে হাজরা মশাইকে খবর দিয়ে এস। যাও, দেরি করো না।

বিশ্বনাথ ব্যস্ত হয়ে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, এখনি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে বসুন। এরকম একটা পোড়া দুপুরের বাতাস গায়ে লাগাবেন না।

গাঁথুনি শুরু হয়ে গিয়েছে। দোতলার উপরে তেতলা। একটা নক্সা হাতে নিয়ে আর দেয়ালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কণ্ট্রাক্টর গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা বলছে অনুপম।—আপনি অন্তত সিঁড়িটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু একটা করুন।

গাঙ্গুলী—করবো।

অনুপম—কী করবেন, একটু আভাস দিতে পারেন?

গাঙ্গুলী—স্টেপ হবে একেবারে সাদা মাকরানা মার্বেল; কিন্তু রেলিং হবে ফতেপুর সিক্রীর আকবরী ড্রিম-প্যালেসের জাফরির মত, ফিকে লালচে বিকানীর স্টোনের ওপর খুব মিহি ফুলকারির কাজ।

অনুপম—জানলা-কপাটের রং যেন ম্যাটমেটে না হয়।

গাঙ্গুলী—না না। সেজন্যে একটুও চিন্তা করবেন না। দেখিয়ে দেব, রং কাকে বলে।

বাড়ির গা-ঘেঁষা বাঁ-পাশের পড়তি জমির সেই ফাঁকা চেহারাটা আর নেই। বেশ লম্বা-চওড়া একটা গ্যারেজ-ঘর উঠছে। বাড়ির পুরনো কাঠের গেট আর পুরনো থাম ভেঙে ফেলা হয়েছে। নতুন ফটকের দু'পাশের থাম দুটো হবে দুটো ছোট পিরামিড, কুচকুচে কালো কষ্টিপাথরের রং, আর তেমনই মসৃণ।

চলে গেলেন কণ্ট্রাক্টর গাঙ্গুলী। ঘরের ভিতর থেকে হাসতে হাসতে বের হয়ে আসে প্রতিভা।—কই, তুমি তো আমাকে বললে না?

অনুপম—কী বললাম না?

প্রতিভা—ভুলে গেলে? বাঃ!

—সত্যিই মনে পড়ছে না।

—বেশ মন! কালকেও তো, সন্ধ্যেবেলা, ঠিক এখানে দাঁড়িয়েই তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মনে নেই?

হেসে ফেলে অনুপম—তাই বল! এই কথা! কিন্তু ওটা কি তোমার জিজ্ঞাসা করে জানবার মত একটা কথা?

চমকে ওঠে প্রতিভা।—এ কী রকমের কথা হলো। স্ত্রী জানবে না স্বামী কী করে? কেন এত খাটো? কিসের জরুরী কাজ?

অনুপম—জানলেও কি সে-কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে? আমার খাটুনি একটু কমিয়ে দিতে পারবে?

প্রতিভা—কেন পারবো না? তুমি বললেই পারবো।

অনুপম—আমি যদি যুদ্ধে যাই, তবে তুমিও যুদ্ধে যাবে?

প্রতিভা হাসে—নিশ্চয় যাব; যদি নিয়ে যেতে চাও আর নিয়ে যেতে পার।

বলতে গিয়ে হেসে ফেলে প্রতিভা। আর, অনুপমের একটা হাত ধরে যেন দুরন্ত একটা আবদারের মূর্তির মত ছটফট করে।—না না, হাসির কথা নয়। আমি হাসছি না। তুমি বল।

অনুপম—বলবার কিছু নেই, প্রতিভা।

প্রতিভা—কী যে বলছো, বুঝতে পারছি না। তোমার উন্নতি দেখে সব চেয়ে খুশি হয়েছে যে, সে বেচারীই জানবে না, কিসে এত উন্নতি হলো? তোমার ভাগ্য কি আমারও ভাগ্য নয়?

প্রতিভার হাতে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে অনুপম—তোমার ভাগ্য কিন্তু আমার ভাগ্যের চেয়ে অনেক ভাল।

প্রতিভা—একথার মানে?

অনুপম—কুলদা পণ্ডিত আমার হাত দেখে কী বলেছেন, শুনবে?

প্রতিভা—শুনবো।

—স্বামীকে শুধু ভালবেসেই সুখী হয়, আর কিছু তার কামনা নেই, তুমি নাকি সেই রকমের স্ত্রী। মুগ্ধা নায়িকার মত। একদিন স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আর স্বামীর কোলে মাথা রেখে বিদায় নেয়, সেইরকম এক সৌভাগ্যবতী।

অনুপমের হাতটাকে শক্ত করে ধরে প্রতিভা। দুই চোখে যেন নিশ্চিন্ত প্রাণের একটা তৃপ্তি গভীর হয়ে টলমল করে।—চমৎকার কথা বলেছেন পণ্ডিত মশাই।

অনুপম—এটা আমার যেমন একটা দুঃখ, তেমনই একটা সান্ত্বনা।

প্রতিভা—কী বললে?

অনুপম—তুমি একদিন থাকবে না, শুধু আমি একাই থাকবো, এটা ভাবতে কষ্ট হয়। কিন্তু তোমাকে কখনও একা থাকতে হবে না, এটা ভাবলে মনে হয়, তাই ভাল।

প্রতিভা—নিশ্চয় ভাল।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় অনুপম।—ন'টা বেজে গিয়েছে।

প্রতিভা—এবার তাহলে, বল।

অনুপম—কী?

প্রতিভা—তুমি কী কাজ করে এত উন্নতি করলে?

—আমি যা করি, সেটা হলো একটা কাজ। যেমন, কোন কোন উকীল তাঁর মক্কেলকে শুধু পরামর্শ দেন, সেটা কি একটা কাজ নয়?

—তুমিও কি তবে···

—হ্যাঁ। ধরে নিতে পার, আমার কাজও প্রায় ওরকমেরই একটা কাজ।

—চন্দ্রবাবু আর সূর্যবাবুও কি এই কাজ করেন?

—হ্যাঁ।

জোরে একটা হাঁফ ছাড়ে প্রতিভা। অনুপম হাসে—মনে হচ্ছে, তোমার বুকের ভিতর থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল।

প্রতিভা—উঃ, সত্যি।···কিন্তু তুমি আমার কাছে এই সামান্য একটা কথা একটু স্পষ্ট করে না বলে আমাকে এত ভোগালে কেন? অনুপমের পিঠে আস্তে একটা চড় মেরে আর ছটফটিয়ে হেসে ওঠে প্রতিভা। অনুপম বলে—এই সাবধান! এটা বারান্দা। পাশের বাড়ির জানালা খোলা। সেই জানালার কাছে কে দাঁড়িয়ে আছে, দেখ।

দেখতে পেয়েই চমকে ওঠে প্রতিভা। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এক বিধবা, যিনি হলেন এই বাড়ির উপর খামকা আক্রোশের সেই অদ্ভুত মানুষ ভবতোষবাবুর স্ত্রী।

জিভ কেটে, দুরন্ত হাতটাকে সামলে নিয়ে, আর একেবারে শান্ত মূর্তিটি হয়ে অনুপমের মুখের দিকে তাকায় প্রতিভা।—কিন্তু যে-কাজে তুমি পরামর্শ দাও, সেটা কী কাজ?

অনুপম—বলবো, নিশ্চয় বলবো। তোমাকে না বলে পারবো কেন? কিন্তু আজ নয়। আজ না বলবার অনেক কারণ আছে। আজ বললেও তুমি বুঝতে পারবে না। আমি ঠিক সময় বুঝেই তোমাকে বলবো, বিশ্বাস কর। সেদিন তুমি নিজেই ভেবে লজ্জা পাবে যে, কেন একদিন···।

—তুমি থাম তো। বলতে গিয়ে প্রতিভার গলার স্বরে একটা লজ্জা যেন ব্যথা পেয়ে কেঁপে ওঠে।

অনুপম বলে—আমি চলি।

—নীচের ঘরে গিয়ে বসছো? না, বাইরে বের হবে?

—এখন নীচের ঘরে। পরে বাইরে বের হতেও পারি।

—ফিরতে বেশি দেরি করো না।

—না। চলে যেতে যেতেই মুখ ফিরিয়ে তাকায়, আর মুখ টিপে হেসেও ফেলে অনুপম।

প্রতিভা—হ্যাঁ, শোন। একটা কথা।

থামে অনুপম। এগিয়ে আসে প্রতিভা।—তোমার বন্ধু অজয়বাবুও তো ইচ্ছে করলে ওরকম কাজ করতে পারেন।

আশ্চর্য হয়ে প্রতিভার মুখের দিকে তাকায় অনুপম।—হঠাৎ এখন অজয়ের কথা মনে পড়লো কেন তোমার?

প্রতিভা—ভদ্রলোকের টাকা-পয়সার খুব অভাব আছে মনে হলো।

—তা তো আছেই।

—আমার কাছে টাকা ধার চেয়েছিলেন।

—দিয়েছ নিশ্চয়।

—দিয়েছি।

—কত টাকা?

—চল্লিশ টাকা।

—ভালই করেছো।

—তোমারই অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে ছিলেন, কিন্তু···।

—হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়েছে। ওকে টাকা দিতে ভুলেই গিয়েছিলাম। নানা কাজের তাড়ায় সব কথা সব সময় মনেও পড়ে না।

—অজয়বাবু নিশ্চয় খুব বিদ্বান মানুষ।

—তা বইকি। অজয়ই তো আমাদের ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিল। এককালে খুব ভাল ছবিও আঁকতো।

—তাহলে অজয়বাবুকে একবার বলেই দেখ না!

হেসে ফেলে অনুপম।—আমি বললেও কোন ফল হবে না, প্রতিভা। অজয়ের দ্বারা কিছুই হবার নয়। ওর হাত কুঁড়ে, পা কুঁড়ে, মন-প্রাণ সবই কুঁড়ে।

—কেন?

—গায়ের ওপর একটা কাঁকড়াবিছা পড়লে লোকে সেটাকে টোকা দিয়ে ফেলে দেয়। আর, অজয় সেই কাঁকড়াবিছার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হবে, যেন একটা টাটকা গোলাপফুল গায়ে পড়েছে।

—মাথায় দোষ আছে?

—আছে বৈকি। তা না হলে এরকম একটা অদ্ভুত ভাগ্য হবে কেন? যাই হোক্, অজয় নিশ্চয় আবার সাহায্য চাইতে আসবে, আসবেই, না এসে পারবে না। কিন্তু এলেও হয়তো আমার দেখা পাবে না। তুমিই ওকে দশ-বিশ কিছু দিয়ে দিও।

—কিন্তু আমার কাছে তো টাকা থাকে না।

অনুপম—আচ্ছা, সে ব্যবস্থা এখনই করে দিচ্ছি। তোমার কাছে আমার সবই যখন আছে, তখন টাকাও থাকবে।...এই নাও।

স্টীল-সেফের চাবিটাকে প্রতিভার হাতে তুলে দিয়ে আর হাসতে হাসতে চলে গেল অনুপম। অনুপমের মুখের সেই হাসি যেন বারান্দার সিংহ-আয়নার ঝকঝকে বুকটাকে ছুঁয়ে দিয়ে চলে গেল।

ছুঁয়ে গেল প্রতিভারও বুকের ভিতরে লুকোনো একটা মিথ্যা কণ্টকে; এই মানুষের জীবনটাকে এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর জিজ্ঞেস করে করে বুঝতে চেষ্টা করবার কোন দরকার ছিল না। প্রতিভার কাছে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলেই যার প্রাণ খুশি হয়ে এত হেসে ওঠে, তার কাজের খবর জানবার জন্যে এত ছটফট করবার কোন মানে হয় না।

প্রতিভার মনের লজ্জাটাও চমকে ওঠে। একা একা দাঁড়িয়ে থাকলেও মুখ লুকোতে ইচ্ছে করে। ছি ছি, এ যেন নিজেরই ভাগ্যের সঙ্গে কোঁদল করা। রাজার সুখ-শান্তি সহ্য করতে পারতো না সেই সুয়োরানী; হীরের খাটে শুয়েও নিজের গায়ে চিমটি কেটে কেটে নিজেকে কাঁদাতো, আর রাজাকেও জ্বালাতো। বলতো, তোমার রানী হয়েও আমার কোন সুখ হলো না।

সত্যিই যে হীরের দুল এবার পরতে ইচ্ছে করছে। আয়নার টেবিলের দেরাজের ভিতরে হীরের দুলের ছোট বাক্সটা পড়ে আছে। অনুপম যদি জিজ্ঞাসা করে বসে, কবে এনে রেখেছি জিনিসটাকে, কিন্তু এতদিনের মধ্যে একদিনও ওটাকে তোমার পরবার সময় হলো না? তবে যে সত্যি কথা বলে জবাব দিতে ভয় করবে। না, আর দেরি করা উচিত নয়। এখনই পরে ফেললেই হয়।

তার চেয়ে ভাল হয় সন্ধ্যাবেলার স্নানের পর, ঘরের বড় বাতির আলোটাকে ঝলমলিয়ে জাগিয়ে দিয়ে আর আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে যদি তাড়াতাড়ি পরে ফেলা যায়। না, তাড়াতাড়ি কেন? একা ঘরে আয়নার সামনে আবার চক্ষুলজ্জা কিসের? মুখ লুকিয়ে হাসবারও কোন দরকার হবে না।

এখনই একবার নীচে না গেলে নয়। সুধার মা নিশ্চয় ভাবছে, দাদাবাবু তো নেমেই এসেছেন, তবে বউদির আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? রামপ্রসাদ হয়তো ভুল করে পচা মাছ নিয়ে এসেছে। ননীকাকাও বোধ হয় দু-একবার ডাক দিয়েছেন, বউমা তুমি কি নীচে এসেছ?

ননীকাকার শরীর একটুও ভাল যাচ্ছে না। সব সময় হাঁপাচ্ছেন। কাছে গেলেই জিজ্ঞাসা করেন, দেখ তো বউমা, জানালাগুলো খোলা আছে কিনা। হাওয়া পাচ্ছি না কেন? রাতের খাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন ননীকাকা। দিনের বেলাতেও যা খান, তা না-খাওয়ারই মত। দু মুঠো ভাত কোনমতে এলোমেলো করে মুখে তোলেন। আর দুধের বাটিতে একটা চুমুক দিয়েই বলে ওঠেন, নাঃ, অনেক বেশি হয়ে গেল।

—আপনি তো কিছুই খেলেন না, কাকা।

—না বউমা, মনে হচ্ছে খুব বেশি হয়ে গিয়েছে। এর বেশি আর ভাল নয়।

মিস্তিরী আর মজুরদের কাজের ঠকাস-ঠকাস আর ধুপধাপ শব্দ সারাদিন বেজেই চলেছে। ননীকাকার দুপুরের ঘুমের শান্তি নিশ্চয় নষ্ট হয়ে যায়।

এক-এক সময় হঠাৎ ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েন ননীকাকা। দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বারান্দার উপর হেঁটে বেড়ান। পা টলমল করে। রামপ্রসাদ দৌড়ে এসে ননীকাকাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আবার ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়। ননীকাকার মুখে ওই এক কথা—ঘরের ভেতরে হাওয়া পাই না।

—আপনি রামপ্রসাদকে সঙ্গে না নিয়ে কখ্খনো একা-একা হাঁটতে চেষ্টা করবেন না, কাকা। কতবার ননীকাকাকে বলেছে আর বুঝিয়েছে প্রতিভা। কিন্তু ননীকাকার মনের ভিতরেই কী যেন হয়েছে। জেগে বসে আছেন, চুপ করে, অনেকক্ষণ। হঠাৎ চমকে ওঠেন, ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান। তারপরই, ওই ভাঙ্গা-ভঙ্গুর শরীর নিয়েই দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বারান্দার এদিকে ওদিকে হাঁটতে থাকেন।

নীচে নেমে এসেই চমকে ওঠে প্রতিভা। হ্যাঁ, ঠিক, কাকা আবার সেই ভুল করেছেন। রামপ্রসাদকে ডাকেননি, নিজেই একা-একা হেঁটে বারান্দার একেবারে ওদিকে......ইস কতদূরে চলে গিয়েছেন ননীকাকা, অনুপমের সেই ঘরের দরজার কাছে, যেখানে একটা সবুজ পর্দা দুলছে।

ফিরে আসছেন ননীকাকা, কী ভয়ানক চমকে চমকে কাঁপছে ননীকাকার সাদা মাথাটা। দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে টলতে টলতে আসছেন। এগিয়ে যেয়ে ননী-

কাকার হাত ধরে প্রতিভা।—কী হলো, কাকা? ওরকম করছেন কেন?

ননীকাকা—ঘরটা কোন্ দিকে?

প্রতিভা—এই তো আপনার ঘর, ঘরের দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

ঘরের ভিতরে ঢুকেই বিছানার উপর বসে পড়েন আর হাঁফ ছাড়েন ননীকাকা।—তোমার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, বউমা?

—সুধার মা দাঁড়িয়ে আছে।

—অনুকে একবার ডাক।

অনুপমকে ডাকতে চলে যায় সুধার মা। ঘরের পাখা ঘুরছে। তবু হাত-পাখা তুলে নিয়ে ননীকাকার মাথার উপর জোরে জোরে বাতাস দিতে থাকে প্রতিভা। অনুপম ঘরে ঢুকতেই ননীকাকা তাঁর ঝাপসা-দেখা চোখ দুটোকে টান করে তাকিয়ে নিয়ে কথা বলেন।—অনু এসেছো, বোধহয়।

অনুপম—হ্যাঁ।

ননীকাকা—এ ঘরের টেবিলের দেরাজে আমার এ মাসের পাওয়া পেনসনের ষাট টাকা আছে। আমার জন্যে ডাক্তার ডাকবার খরচ আর ঘাটখরচ, সবই ওই টাকার মধ্যেই সেরে নিতে হবে। তুমি একটি পয়সাও দিও না।

অনুপম—আপনি আজ হঠাৎ এরকম কথা বলছেন কেন?

ননীকাকা—আমি চোখে ঝাপ্‌সা দেখি, এটা আমার সৌভাগ্য। কানে ঝাপ্‌সা শুনতে পেলেও সেটা একটা সৌভাগ্য হতো। তা হলে তোমার ওই ঘরের ভিতরের কথাগুলোকে এত স্পষ্ট করে কানে শুনতে হতো না।

অনুপম—আপনি কি আরও কিছু বলতে চান?

ননীকাকা—না। হ্যাঁ, শুধু একটা ইচ্ছের কথা। তুমি জাঁক করে দানসাগর-টাগর করো না, তোমার টাকা নষ্ট করো না। আমার এই পেনসনের ষাট টাকার কিছু যদি থাকে, তবে তাই দিয়ে, কয়েকটা কাঙালীকে পেট ভরে ভাত খাইয়ে দিও, বাস্, সেটাই হবে আমার শ্রাদ্ধ।

অনুপম—আপনি আজই এসব কথা না বললেও পারতেন, কাকা।

ননীকাকা—আমার আর কিছু বলবার নেই, অনু।

প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে কথা বলে অনুপম—আমি এখনি ডাক্তারকে খবর পাঠাচ্ছি।

চলে যায় অনুপম। প্রতিভার হাতের পাখাটা ধপ্ করে মেজের উপর পড়ে যায়। ভাঙ্গা-ভঙ্গুর শরীরটাকে একটু টান করে নিয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়েন ননীকাকা। প্রতিভা ডাকে—কাকা!

ননীকাকা হাসেন—তুমি এখনও আছ নাকি?

—হ্যাঁ কাকা।

—তা হলে একটা গল্প-টল্প বল।

—কিসের গল্প?

—তোমাদের দেশের বাড়িতে আমবাগান নেই?

—ছিল।

—কখনও ঝড়বৃষ্টির রাতে আমবাগানে ঢুকে আম কুড়োওনি?

—কত কুড়িয়েছি। সেবার, তখন শেফালীদিরই বয়স হবে পনর কি ষোল; আমি তো শেফালীদির চেয়ে সাত বছরের ছোট; অনেক রাতে ঝড় শুরু হলো। শেফালীদি বললে, ওঠ পতু। আমিও উঠলাম। মস্ত বড় একটা কাঁচা-মিঠে ছিল গরুর ঘরের ঠিক পেছনে। শেফালীদি কোঁচড় পাতে, আমি আম তুলে তুলে কোঁচড় ভরে দিই। তারপর ফিরে যাবার জন্যে যেই না দু'পা এগিয়েছি, অমনি চালতে গাছের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল কী বিশ্রী চেহারার একটা ভূত। বললে, আঁম দেঁ। ভূতটার মাথা মুখ হাত-পা সবই চট দিয়ে ঢাকা; শুধু চোখ দুটো বেরিয়ে রয়েছে। মাগো বলে শেফালীদি তো আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকে, কোঁচড়ের সব আমও ভয় পেয়ে ঝুরঝুর করে কাদার ওপর পড়ে যায়।...শুনছেন কাকা?

ননীকাকা হাসেন—হুঁ।

প্রতিভা—আমি কিন্তু একটুও ভয় পাইনি, কাকা। সেই কাদামাখা শক্ত কাঁচা আম এক-একটা করে হাতে তুলে নিই আর ভূতের মাথায় ছুঁড়ে মারি। ভূতটা দু-তিনবার উঃ আঃ করেই শেষে চেঁচিয়ে উঠলো—কি করছিস, পতু? থাম একটু। চটের ঢাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাদা এগিয়ে আসে আর হাসতে থাকে—আশ্চর্য তোদের লোভ, এই মাঝরাতের অন্ধকারে আম চুরি করতে বাগানে ঢুকেছিস?

ননীকাকা হাসেন—হুঁ। বেশ গল্প।

খুব আস্তে, যেন একটা ক্লান্তির ঘুম-ঘুম আবেশে ননীকাকার গলার স্বর নরম হয়ে গিয়েছে। ননীকাকা বোধহয় এখন একটু ঘুমোতেই চাইছেন। তাই আশি বছর বয়সের বুড়ো মানুষ যেন ছেলে মানুষের মত বায়না ধরে একটা রূপকথা শুনে নিলেন।

ডাক্তার এলেন। ননীকাকার বুক পরীক্ষা করে চলে গেলেন। ভালমন্দ কিছুই বললেন না ডাক্তার। শুধু বললেন, দেখা যাক।

বিকাল হতেই ডাক্তার একবার এলেন। সন্ধ্যা হতেই আবার একবার এলেন। বললেন—হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছেন।

একবার মনে হলো জেগেছেন ননীকাকা। প্রতিভা কাছে এগিয়ে যেয়ে বলে—বার্লি দেব, কাকা? খাবেন?

হাত তুলে ইসারায় জানালেন ননীকাকা—না।

উপরতলায় উঠে নিজের ঘরের আয়নার সামনে যখন একবার দাঁড়ায় প্রতিভা,

তখন মনে পড়ে, আজ এখন হীরের দুল পরবার কথা ছিল। চোখ দুটো হাসতে গিয়ে জ্বলতে থাকে।

মাঝরাতেও একবার নীচে নেমে গিয়ে আর ননীকাকার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কান পাতে প্রতিভা। হ্যাঁ, নিঃশ্বাসের শব্দটা বেশ স্পষ্ট শোনা যায়।

সকাল হতেই আবার ডাক্তার এলেন। ননীকাকার মুখের দিকে তাকিয়ে আর হাতের নাড়ি টিপে ধরেই বলে উঠলেন—আহা! চলেই গিয়েছেন।

রামপ্রসাদ ফুঁপিয়ে ওঠে—হে রাম! হে রাম!

সুধার মা ডুকরে ওঠে—শান্তি! শান্তি!

আর, প্রতিভা শুধু দুটো অপলক চোখ তুলে অনুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভেজা চোখ, কিন্তু কী অদ্ভুত শক্ত চোখ।

কী যেন বলতে চায় অনুপম, তাই ওরকম করে প্রতিভার একটা হাত ধরে রেখেছে। প্রতিভাকে কী যেন বোঝাতে চায় অনুপম, তাই প্রতিভার হাতের আংটিপরা আঙুলটার উপর বার বার হাত বোলায়। ভবতোষবাবুর বাড়ির জানলার কাছে আড়াল হয়ে কে-যেন দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয় ভবতোষবাবুর বিধবা স্ত্রী, জগদম্বা দেবী। থাকুক দাঁড়িয়ে; দেখতে পায় তো দেখতেই থাকুক। এই বারান্দা ছেড়ে আবার এখন ঘরের ভিতরে ঢুকতে চায় না অনুপম। টবের জাপানী হানার ছোট শরীরটা ফুলে-ফুলে ভরে গিয়েছে। ফুলের উপর সকাল-বেলার রোদ পড়েছে।

এখনই নীচে নেমে গিয়ে কাজের ঘরে ঢুকতে হবে। কাজের ডাকে হয়তো বাইরেও বের হতে হবে। ফিরে আসতে হয়তো অনেক দেরি হবে। বেলা একটা-দুটো কিংবা তিনটেও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ততক্ষণ কি অনুপমের অপেক্ষায় না-খেয়ে বসে থাকবে প্রতিভা? কোন মানে হয় না।

মেদিনীপুর জেলের ভিতরে রাজনীতিক বন্দীরা খাওয়া বন্ধ করেছে। ওটা একটা প্রতিবাদ। কারণ, জেলর বলেছেন, বন্দীদের খবর-কাগজ পড়তে দেওয়া হবে না। কিন্তু দমদম জেলের বন্দীদের খবর-কাগজ পড়তে কোন নিষেধ নেই। তবু ওরাও খাওয়া বন্ধ করেছে। এটা নাকি মেদিনীপুরের বন্দীদের জন্য সিমপ্যাথির অনশন। প্রতিভা যা করছে, সেটাও প্রায় ওইরকমেরই একটা এক-রোখা ও অবুঝ সিমপ্যাথির কাণ্ড। সেদিন হঠাৎ একবার বারাসত চলে যেতে হয়েছিল। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। কী আশ্চর্য, দেখে বেশ রাগই

হয়েছিল অনুপমের; প্রতিভা তখনও খায়নি। সুধার মা বললে, আমি তো বউদিকে শত কথা বলেও কিছু বোঝাতে পারলুম না।

তাই প্রতিভাকে একটু বুঝিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, তুমি তো জেলবাড়ির বন্দী নও; তোমার এরকম বেলা দুটো-তিনটে পর্যন্ত না-খেয়ে-থাকা সিমপ্যাথির কোন মানে হয় না। আমাকে বাইরের কাজ নিয়ে থাকতে হয়; আমার কথা আলাদা। তুমি ঘরের মানুষ; তোমার জীবন ঘরের নিয়মেই চলবে। আমার বাইরের ঝঞ্চাটের সঙ্গে তুমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে কেন?

তিন মাসেরও বেশি হয়ে গিয়েছে, ননীকাকা চলে গিয়েছেন। বাড়ির তেতলার কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গ্যারেজ ঘরের কোন কাজ আর বাকি নেই। গাড়িও এসে গিয়েছে। কিন্তু প্রতিভা যেন এখনও মনমরা চেহারার একটা চলন্ত পুতুল। ঘরের কাজে অবিশ্যি কোন শ্রান্তি-ক্লান্তি নেই। ঝি দুর্গাবালার অপেক্ষায় না থেকে এক-একদিন নিজের ঘরের মেজে নিজেরই হাতে ধোয়ামোছা করে। রামপ্রসাদের কিনে আনা একসের আলুর মধ্যে তিনটে পচা আলু চোখে পড়লে রামপ্রসাদের কাছে তিনবার কৈফিয়ত চায়, আলু কেনবার সময় তুমি কি চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিলে, রামপ্রসাদ?

অনুপম—তুমি আর আমার অপেক্ষায় থেক না।

প্রতিভার দুই চোখ যেন চমকে ওঠে, দুই ভুরু শিউরে ওঠে—কী বললে?

অনুপম—তুমি খেয়ে নিও, আমার অপেক্ষায় থেক না।

প্রতিভা—অপেক্ষায় তো থাকতেই হবে। তুমি 'না' বললেই বা শুনবো কেন?

আশ্চর্য হয় অনুপম। অনুপমের এই আশ্চর্যের চোখ দুটোও যেন একটু ধোঁয়াটে হয়ে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরকম একটা কথাকে কেমন করে একটুও না হেসে বলতে পারলো প্রতিভা? আগে তো এরকম কত কথাই বলেছে প্রতিভা, বলতে গিয়ে হেসেও ফেলেছে। হেসে হেসে লুটোপুটি করেছে।

সেই প্রতিভা আজ এখন কিন্তু একটুও বুঝতে পারছে না যে, ওই কথাটাকে এত গম্ভীর হয়ে বললে কথার অর্থটা অন্যরকমের হয়ে যায়।

অনুপম হাসে—একটা হাসির কথাকে এত গম্ভীর হয়ে বলছো কেন?

হেসে ফেলে প্রতিভা।—তোমার কাছে হাসির কথা হতে পারে, আমার কাছে নয়।

বুঝতে তো কোন অসুবিধে নেই, ঘরের এত কাজের মধ্যে থেকেও প্রতিভার প্রাণটা কেন আনমনা হয়ে রয়েছে, একটা হাসির কথাকেও হেসে বলতে পারে না, আর না হেসে গম্ভীর হয়ে থাকতে পারলেই যেন শান্তি পায়। ননীকাকার কথা সব সময় মনে পড়ছে, তাই যেন মনে-প্রাণে আর চোখে-মুখে একটা থমথমে বিষাদ ও বিস্বাদের ভাব নিয়ে বসে থাকে, কাজ করে, আবার ছটফট করেও ওঠে।

ননীকাকা যেদিন মারা গেলেন, ঠিক তার পরের দিনেই বিকেলবেলাতে নীচেরতলার বারান্দার ওদিকে দাঁড়িয়ে অনুপমের ঘরের দরজাটার দিকে তাকিয়েছিল প্রতিভা। সবুজ পর্দাটাকে নয়; দরজার কাছে বারান্দার উপরে একটা টুলের উপরে বসেছিল যে দারোয়ান বীরবাহাদুর, তাকেই দেখছিল প্রতিভা। ঝি দুর্গাবালা বারান্দা মুছতে মুছতে ওই ঘরের দরজার দিকে একটু এগিয়ে যেতেই হেই-হেই করে ধমক দিয়ে লাফিয়ে ওঠে বীরবাহাদুর—ইধর নেহি, ইধর নেহি।

—কী হলো গো? ধমকাও কেন? চমকে উঠেই জিজ্ঞেস করে দুর্গাবালা।

বীরবাহাদুর জবাব দেয়—ইধর আনা মানা হ্যায়।

দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও এই অদ্ভুত দৃশ্যটাকে বেশ স্পষ্ট করেই দেখতে পেয়েছিল প্রতিভা। আর হেসেও ফেলেছিল।

ঘরের দরজার সবুজ পর্দা সরিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে অনুপম। তারপর প্রতিভার কাছে এগিয়ে এসে হাসতে থাকে—বীরবাহাদুরের বুদ্ধি আর বুলডগের বুদ্ধি, দুইই সমান; বিশেষ কোন তফাত নেই।...কিন্তু তুমি ওরকম করে হাসছো কেন?

প্রতিভা—কী রকম?

অনুপম—যেন...যেন থিয়েটারের একটা লজ্জার সীন দেখে হাসছো।

ঠিকই, মুখের উপর শাড়ির আঁচলটাকে চেপে রেখে অদ্ভুতভাবে হাসছে প্রতিভা। শুধু মাথা নেড়ে জবাব দেয়—হুঁ।

অনুপম—কী করবে আর বল? বীরবাহাদুরের বুদ্ধিটার একটু সভ্য হতে দেরি হবে। তুমি বরং দুর্গাবালাকে একটু বুঝিয়ে বলে দিও, আমার ওই ঘরে যখন কেউ থাকবে না, তখন যেন ওদিকের বারান্দা ধোয়া-মোছা করে।

প্রতিভা—হুঁ।

অনুপম—ননীকাকারও বুদ্ধির অবস্থা কেমন-যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে...।

চমকে ওঠে প্রতিভা।—দুধ পুড়ছে বোধ হয়। কী বিশ্রী গন্ধ। সুধার মা কি নাক বন্ধ করে কাজ করছে? ছিঃ। বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে বারান্দা পার হয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল প্রতিভা।

কোন সন্দেহ নেই, প্রতিভা সব সময় ননীকাকার কথা শুধু যে ভাবছে, তা নয়। বেশ বড় করেই ভাবছে। ননীকাকা যেন পৃথিবীর একটা অষ্টম আশ্চর্য, এইরকম একটা ধারণার মায়াতে পড়ে প্রতিভার নরম মনটা আরও নরম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভুল করছে প্রতিভা, খুব খারাপ ভুল। বুঝতেও পারছে না যে, ওরকমের শুকনো হাসি আর মনমরা ভাব নিয়ে চোখ-মুখ সব সময় উদাস করে রাখলে একজনের ওপর কত অন্যায় করা হয়। তার ঘরের জীবনটাকেও

যে বিস্বাদ করে দেওয়া হয়। তার যে কল্পনা করতেও ভয় হয়; প্রতিভার চোখের কালো তারা খুশি হয়ে নাচছে না, ঠোঁট দুটো লালচে হয়ে কাঁপছে না। মুখে হাসি নেই, সাজে শোভা নেই, আর শরীরটা রুগিয়ে যাচ্ছে। এমন প্রতিভাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে যে অনুপমের বুকটাও উদাস হয়ে যাবে, কোন তৃপ্তি পাবে না।

এক-এক সময় মনে হয়েছে অনুপমের, প্রতিভাকে সত্যিই যদি খুব করে হাসিয়ে দিতে পারা যেত, তবে প্রতিভার মনের ওই গুমোট দূর হয়ে যেত, যে গুমোট ঘনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছেন ননীকাকা। তাই আজ ইচ্ছে করেই প্রতিভার হাতটাকে ওভাবে ধরে রেখেছে অনুপম। ইচ্ছে করেই বারবার হাসছে; প্রতিভাকে হাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় অনুপম।

নতুন গ্যারেজের নতুন কংক্রীটের ছাদের উপর ঝুপ করে যেন একটা শব্দ আছড়ে পড়েছে। মুখ ফিরিয়ে তাকায় অনুপম। ভবতোষবাবুর বাড়ির পাঁচিলের কাছের নারকেল গাছের মাথা থেকে মস্ত বড় একটা ঝুনো খসে পড়েছে। একেবারে গ্যারেজের ছাদের ঠিক মাঝখানেই পড়েছে।

হেসে ফেলে অনুপম।—জাপানী বোমা।

প্রতিভা—কি বললে?

অনুপম—দেখতে পাচ্ছ না, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে জগদম্বা দেবী কী রকম চোখ কটমট করে দেখছেন?

—কে? ভবতোষবাবুর বাড়ির জানালার দিকে তাকায় প্রতিভা।

প্রতিভা—কী দেখছেন উনি?

অনুপম—আমার গ্যারেজের ছাদটা তাঁর নারকেলকে কী ভয়ানক একটা ব্যথা দিল, তাই দেখছেন।

প্রতিভা—তোমার কথার মানে কিছু বুঝতে পারছি না।

অনুপম—তোমার একটুও হাসি পাচ্ছে না?

প্রতিভা—হাসবার কী আছে?

অনুপম—আগে কিন্তু এতেই হাসতে।...আচ্ছা, আমি এখন চলি।

প্রতিভা—একটা কথা ছিল।

অনুপম—বল।

প্রতিভা—একটু দাঁড়াও।

ঘরের ভিতরে ঢুকে তখনই বের হয়ে আসে প্রতিভা। রুপোর চেনে বাঁধা মস্ত বড় একটা চকচকে চাবিকে অনুপমের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়।—নাও।

—দাও। স্টীল-সেফের চাবিটাকে হাতে তুলে নিয়ে প্রতিভার মুখের দিকে তাকায় অনুপম।—এটা তোমার কাছে রাখতে কি তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছিল?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—অত টাকা আমি গুনতে পারি না। আমার ভুল হবে, তাতে তোমারই অসুবিধে হবে।

মিথ্যে কথা বলেনি প্রতিভা। বাড়িয়েও বলেনি। অনুপম নিজেই জানে, নীচের ঘর থেকে রামপ্রসাদকে দিয়ে প্রতিভার কাছে স্লিপ পাঠিয়ে যতবার টাকা চেয়েছে অনুপম, ততবারই হিসেব করে টাকা পাঠাতে ভুল করেছে প্রতিভা। এক হাজার তের টাকা চেয়ে পাঠালে এক হাজার একশো তের টাকা পাঠিয়েছে।

অনুপম--একটু ধৈর্য ধরলে কিন্তু একদিন নিজেই বুঝতে পারতে, টাকা গুনতে তোমার কোন ভুল হচ্ছে না, হিসেব করতে ভাল লাগছে।

প্রতিভা—তুমি কিছু মনে করো না।

অনুপম হাসে—কিছুছু না। আমার তো ধৈর্য হারালে চলবে না।

চলে গেল অনুপম।

গুপ্তিপাড়ার চৌধুরী বাড়ির মেয়ে, যে-মেয়ের চোখ পান্‌সে নয়, সে-মেয়ের দুই চোখ কিন্তু এইবার জলে ভরে যায়। এ বাড়িতে এসে এই প্রথম প্রতিভার চোখে জল ছলছল করছে। বলতে ইচ্ছে করে, ভুল সন্দেহ করলে তুমি। আমিও ধৈর্য হারাইনি, একটুও না। ধৈর্য হারালে আমার যে সবই যাবে।

হাসতে তো হবেই। না হেসে বেঁচে থাকবো কি করে? কিন্তু তুমিই বা কেন এত তাড়াতাড়ি করে আমাকে হাসাবার চেষ্টা করছো? একটু সময় দাও। শোকের মানুষকে কি কেউ কাতুকুতু দিয়ে হাসায়?

গ্যারেজ ঘরে শব্দ গুরগুর করছে। গাড়িটা বের হচ্ছে বোধহয়। হ্যাঁ, বের হয়েই গেল। কোথায় গেল কে জানে। ভদ্রলোকের বাইরের কাজের সঙ্গে ঘরের মানুষের মনের কোন চিন্তা জড়িয়ে রাখবার দরকার নেই; স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন। বেশ তো, তাই হবে।

ঘরে ঢুকে আর আয়নার কাছে নয়, বিছানারই উপর চুপ করে বসে থাকে প্রতিভা। এখন আর কোন কাজ নেই মনে হয়। কিন্তু চেষ্টা করে খুঁজলে কি কাজের কোন অভাব হয়? কলতলায় গিয়ে একবার দেখে এলেই তো হয়, দুর্গাবালার কাপড়-কাচা শেষ হলো কিনা। কাপড় কাচতে বড় বেশি সাবান খরচ করে ফেলে দুর্গাবালা।

কিন্তু এত ক্লান্তি বোধ করতে হচ্ছে কেন? এটা কি শরীরটারই কোন দোষ? ভগবান রক্ষে করুন। না না, কখ্‌খনো না। এখন যে কোন ইচ্ছেই করে না। এত অনিচ্ছাকে তুচ্ছ করে কেউ যেন এখনই আসে না। অনেক সময় আছে। ইচ্ছের সময়টা এখনই ফুরিয়ে যাচ্ছে না। পড়বেই তো, ননীকাকার

নাতিরা একদিন অনেক বই পড়বে।

বুঝতে পারেনি প্রতিভা, ক্লান্তিটা কখন এমন করে একটা গভীর ঘুম হয়ে ঢলে পড়েছিল। ধড়ফড় করে জেগে উঠতেই মনে হয় ঘরের ভিতরে যেন একটা কলকলে হাসির জোয়ার এসে ঢুকেছে। তার পরেই চমকে ওঠে; বিছানা থেকে নেমে পড়ে। ঘুমভাঙা দুই চোখের চমকানো বিস্ময় নিয়ে ঘরের ভিতরে দুই অচেনা আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দুই মহিলা ঘরে ঢুকেছেন আর হাসছেন।

এক মহিলা অন্য মহিলাকে দেখিয়ে দিয়ে কথা বলেন—ইনি হলেন সুচারু, চন্দ্রদেবের রোহিণী।

সুচারু আবার অন্য মহিলাকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন—উনি হলেন মীরা, সূর্যদেবের ছায়া।

দুই মহিলার হাসি একসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে এক সঙ্গেই কথা বলে—খবর-টবর না দিয়ে, সোজা এসে ঘরে ঢুকে পড়লাম। কিছু মনে করবেন না, ভাই।

সুচারু বলেন—অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম, যাই একবার অনুপমাকে দেখে আসি। কিন্তু সাতকাজের ঝঞ্ঝাটে কি আসতে পারা যায়?

মীরা—তোমার সাতকাজ মানে তো সাতবার করে চন্দ্রবাবুর ঘরে উঁকি দেওয়া; আর একা আছেন দেখতে পেলেই ঘরে ঢুকে পড়া।

সুচারু—কে কাকে বলছে, শোন! নিম বলে নিসিন্দেকে তুই বড় তেতো! শুনুন তবে অনুপমা; এর বাড়িতে যখনই যান না কেন, গেলেই শুনতে পাবেন, সূর্যবাবু গান গাইছেন—তোমা বই আর জানিনে।

মীরা—কিন্তু আমি তো গান গাই না। আমাকে কারও কিছু বলবার সাধ্যি নেই।···ছি ছি, আমরা শুধু নিজেদের কথাই বলছি। আর অনুপমাও আমাদের রকম দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে শুধু হাসছেন, কিন্তু কিছুই বলছেন না।

সুচারু—না ভাই, অনুপমা। না বললে চলবে না।

প্রতিভা—বলুন, কী বলবো।

সুচারু—শোন কথা, এটাও কি বলে দিতে হবে?

মীরা মুখ টিপে হাসেন—অসময়ে শুয়েছিলেন কেন? শরীর ভাল যাচ্ছে না, বোধহয়?

সুচারু—আমি কিন্তু সত্যিই এবার ডাক্তারের মত একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো। বলতে হবে। লজ্জা করলে চলবে না।

প্রতিভার কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসার কথাটাকে বলেই ফেললেন সুচারু। শিউরে ওঠে প্রতিভা; শুধু কান দুটো নয়; মুখটাও লালচে হয়ে যায়। আর ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে জবাব দেয়—না।

সুচারু—তাহলে কিছু নয়। এখনই চিন্তে করবার কিছু নেই।

মীরা বলেন—আমার একটা কথা শুনুন ভাই। সব সময় হেসে খেলে থাকবেন। কখ্খনো মনমরা হয়ে থাকবেন না। এত সুন্দর সুখের ঘর আপনার, আপনি কেন মিছিমিছি সব সময় উদাস হয়ে থাকবেন?

সুচারু—সত্যি, আপনার মনের অবস্থার কথা শুনতে পেয়ে খুবই কষ্ট বোধ করেছি।

প্রতিভা—কোথায় শুনলেন?

সুচারু—আপনার কর্তা গিয়ে ওঁকে বললেন, সূর্যবাবুকেও বললেন। তারপর আমরা দুজনেও দুই কর্তার কাছে ধমক খেলাম, যাও এখনই গিয়ে অনুপমের স্ত্রীকে বুঝিয়ে এস।

মীরা—আপনি নিজেই বুঝে দেখুন, সংসারে থাকতে হলে শোক-তাপের জ্বালা ভুলে থাকতেই হয়। দুঃখের মধ্যেও হাসতে হয়। আশি বছর বয়সের একটি মানুষ চলে গিয়েছেন, যাবার বয়স তো হয়েই গিয়েছিল। হ্যাঁ, দুঃখ হবেই, কিন্তু সে দুঃখ পুষে রাখবেন কেন?

সুচারু—ও বয়সের মানুষের কাছে জীবনটা তো একটা বোঝা হয়ে যায়। সে বোঝা নামিয়ে চলে গিয়েছেন, শান্তি পেয়েছেন। বলুন, আমি কি বাজে কথা বলছি?

প্রতিভা—না না, একটুও বাজে কথা নয়। আপনি যা বলছেন, ঠিকই বলছেন।

মীরা—তবে চলুন, আপনার তেতলার চেহারা একবার দেখে যাই।

তেতলার চেহারা দেখলেন সুচারু আর মীরা। সুচারু বলেন—আপনি কিন্তু এই ঘরটা নেবেন ভাই; কী চমৎকার। এ ঘরে সব সময় হাওয়া ফুরফুর করবে, একথা আমি এখনই বলে রাখছি।

মীরা—সন্ধ্যা হলে একবার এই জানালাটার কাছে দাঁড়াবেন ভাই। তাহলে আপনার মুখের ওপর আলো পড়বে আর আপনার খোঁপার চুলও ফুরফুর করবে। আপনাকে তখন কী সুন্দরই যে দেখতে লাগবে তা আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি।

প্রতিভা—চলুন, চা খাবেন। নীচে যাই।

নীচের তলায় নেমে এসে চা খেলেন সুচারু আর মীরা। তারপর বিদায় নিলেন। কিন্তু বারান্দাটা পার হয়ে যেতে গিয়ে এক জায়গায় দুজনেই থমকে দাঁড়ালেন।

মীরা—এটা কিসের ঘর, ভাই?

প্রতিভা—এই ঘরেই থাকতেন ননীকাকা।

সুচারু—তাই বলুন।

মীরা—শুনেছি, মাত্র ষাট টাকা পেনসন পেতেন।

সুচারু—তার ওপর বুদ্ধি-সুদ্ধিও ঘুলিয়ে গিয়েছিল।

মীরা—এটাও একরকমের অমানুষ হয়ে যাওয়া।

সুচারু—শুনতেন এক কথা, বুঝতেন আর-এক কথা।

মীরা—এমন বিড়ম্বনা হয়ে বেঁচে থাকবার কোন মানেও হয় না।

সুচারু—হ্যাঁ, ভালই হয়েছে যে চলে গিয়েছেন।···আচ্ছা চলি।

প্রতিভা আর এগিয়ে যায় না। চুপ করে আর নিথর হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

দূরের একটা ঘরের সবুজ পর্দা ঠেলে দিয়ে বের হয়ে আসে অনুপম। তারপর ব্যস্তভাবে হেঁটে এসে প্রতিভার কাছে দাঁড়ায়। অনুপমের চোখেও অদ্ভুত একটা ব্যস্ততার দৃষ্টি। যেন প্রতিভার মুখের হাসি দেখবার জন্য দুর্বার একটা আকুলতা।

অনুপম—এ কি? তুমি এত গম্ভীর কেন?

প্রতিভা ডাকে—রামপ্রসাদ!

রামপ্রসাদ কাছে আসতেই প্রতিভা ধমক দিয়ে বলে—এ ঘরের দরজায় তালা কেন? কে বলেছে ঘরটাকে তালাবন্ধ করে রাখতে?

রামপ্রসাদ ভয়ে ভয়ে বলে—বাবু বলেছেন।

প্রতিভা—তার মানে, এ ঘরে ধূপ ঘোরানো হয় না?

রামপ্রসাদ—না।

প্রতিভা—বইয়ের ঘরে?

রামপ্রসাদ—না।

প্রতিভা—এ ভুল আর কখ্খনো করবে না, রামপ্রসাদ। এই দুই ঘরেই রোজ সন্ধ্যায় একবার ধূপ ঘুরিয়ে যেও।

আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ব্যস্তভাবে চলে গেল প্রতিভা।

ঘরের দরজার বন্ধ কপাটে টোকা পড়ছে, টক্ টক্ টক্! যেন স্তব্ধ রাত্রির বুকের উপর একটা কঠোর বিস্ময়ের টোকা পড়ছে।

তারপর আর টোকার শব্দ নয়। দুম্ দুম্ শব্দ। যেন দরজার কপাটের উপরে একটা আক্রোশের হাত ছটফটিয়ে আছড়ে পড়ছে।

মাঝরাতের নীরবতার মধ্যে এ-বড় অদ্ভুত শব্দ। সে শব্দে রাস্তার এ-আর-পি'র কানও চমকে উঠতে পারে। পাশের বাড়ির জগদম্বা দেবীর ঘরের

জানালাও খুলে যেতে পারে। কিন্তু ঘরের ভিতরের ঘুমটা তবু চমকে উঠছে না।

কিন্তু আর দেরি হয় না। শব্দটা এইবার ঘরের ভিতরে ঘুমন্ত প্রতিভার স্বপ্নেরই বুকের উপর আছড়ে পড়ে বেজে ওঠে। ধড়ফড় করে জেগে উঠেই ঘরের দরজা খুলে দেয় প্রতিভা।

ঘরের ভিতরে ঢুকে অনেকক্ষণ কথা বলে না অনুপম। সিগারেট ধরায়, খোলা দরজার বাইরের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

প্রতিভা—খেয়েছো?

অনুপম—হ্যাঁ, তুমি খেলে না কেন?

প্রতিভা—আমি তো সুধার মা'কে আগেই বলে রেখেছিলাম, আজ আমি খাব না।

—এবার থেকে আমার অপেক্ষায় না থেকে তুমি আগেই খেয়ে নেবে।

—না।

—তাহলে আমার কথা শোন; তোমাকে আগেই খেয়ে নিতে হবে। যেন ভুল না হয়।

চমকে উঠে, অনুপমের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই চোখ নামিয়ে ফেলে প্রতিভা।—আচ্ছা!

—আর, যত রাতই হোক্ এ ঘরের দরজা বন্ধ করবে না।

—আচ্ছা।

—আজ বন্ধ করে রেখেছিলে কেন?

—ভুল হয়েছে।

—কেন এমন ভুল হলো?

—ভয় করছিল।

—আগে কোনদিনও তো ভয় করেনি।

—না।

—তবে আজ কেন?

—কিছু বুঝতে পারছি না।

—তুমি কিছু বুঝতে পারছো না, এমন কথাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? ননীকাকার ওই সূক্ষ্ম পাগলাটে ফিলসফিটাকে তো খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলতে পেরেছো।

—বিশ্বাস কর, বুঝতে পারছি না।

—বেশ, এবার শুয়ে পড়।

—তুমি শোও।

—আমি তো শুয়েই পড়েছি।

—আমি একটু বসে থাকি।

—কোথায়? চেয়ারে?

—হ্যাঁ।

বিছানা থেকে নেমে প্রতিভার কাছে এসে দাঁড়ায় অনুপম—কেন?

—একটু ভাবতে দাও।

প্রতিভার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে, আর প্রতিভার মুখের কাছে চোখ দুটোকে এগিয়ে নিয়ে কথা বলে অনুপম—কী ভাবতে চাও?

প্রতিভা—আমার এখন ইচ্ছেই করছে না।

—কেন?

—বুকটা কেন-যেন হাঁস-ফাঁস করছে। একটু জিরিয়ে নিতে দাও।

—না।

—ও কি? তুমি এরকম করে তাকাচ্ছো কেন?

প্রতিভার হাত ধরে টান দেয় অনুপম—শোবে চল।

আর কোন কথা বলে না প্রতিভা। আপত্তিও করে না। শুধু বিছানার কাছে এগিয়ে এসেই একবার থমকে দাঁড়ায়। অনুপমের চোখ দুটোকে আর-একবার, একটু ভাল করে দেখে নেয়।

তারপর মুমূর্ষু নিঃশ্বাসের সাড়ার মত এই ঘরের সব সাড়াও যেন ধুকুপুকু করে করে শেষ হয়ে যায়। গভীর রাত্রের নীরবতার মধ্যে এই ঘর যেন নিরেট একটা স্তব্ধতা।

তখনও ভোর হয়নি, রাত আছে। রাস্তার উপরে মিলিটারীর গাড়ি একটা মাতালকে থেঁতলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। তাই ছোট্ট একটা ভীরু হল্লা রাস্তার উপরে দৌড়াদৌড়ি করছে।

হল্লার শব্দটা নয়, ভবতোষবাবুর বাড়ির নারকেল গাছের কাক হঠাৎ ভুল করে ডেকে ফেলেছে, সেজন্যেও নয়। বাইরের পৃথিবীর কোন শব্দ অনুপমের এই ঘরের ভিতরে ঢোকেনি, যদিও দরজাটা তখনও খোলা হয়েই রয়েছে।

আজ অনুপমের ঘুমের মধ্যেও যেন একটা জ্বালা ছিল। তাই জেগে উঠেছে অনুপম। বিছানা থেকে নেমে গিয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ে অনুপম। তার পরেই ডাক দেয়—তুমি কি ঘুমোচ্ছ?

—না।

—এতক্ষণ কি তাহলে জেগেই ছিলে?

—হ্যাঁ।

—উঠে বসো, কথা আছে।

প্রতিভার মিথ্যে ঘুমের শোয়া শরীরটা তখনি উঠে বসে। অনুপমও

বলতে থাকে।—আমি তোমার জন্য যে একজোড়া হীরের দুল এনেছি, সেটা কি কোনদিনও পরেছ?

—না।

—পরবে না?

—ইচ্ছে হলেই পরবো।

—ইচ্ছেটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

—বুঝলাম না।

—ইচ্ছেটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

—একথাটা না বললেই ভাল করতে।

—কেন?

—এটা খুব ভুল কথা।

—যাই হোক, একদিন যখন পরতেই হবে, না পরে পারবে না, তখন··· তবে শোন।

অনেকদিন আগে, আমি তখন স্কুলের ছাত্র, আমাদের এই বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটের কাছে একদিন কোথা থেকে একটা জটাধারী সাধু এসে আড্ডা নিল। সাধুটা চিমটে বাজিয়ে ভজন গাইতো আর কোন গেঁজেলকে দেখতে পেলেই চোখ পাকিয়ে ধমক দিত—গাঁজা পিনা পাপ হ্যায়। কিন্তু পাঁচু গেঁজেল ইচ্ছে করে রোজই এক চিলিম গাঁজা এই সাধুর চোখের সামনে ফেলে রেখে দিয়ে চলে যেত। পরের দিন এসে দেখতে পেত পাঁচু, গাঁজার চিলিম তেমনই পড়ে আছে, সাধুবাবা সেই চিলিম একবার ছোঁয়ওনি। কিন্তু পাঁচুও ছাড়েনি। সন্ধ্যাবেলা রোজই ওইরকম এক চিলিম গাঁজা ফেলে রেখে যায় আর রাত্রিবেলা ফিরে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে, কী করছেন সাধু মহারাজ। এভাবে, ঠিক একটা মাস পরেই একদিন দেখতে পেল পাঁচু গেঁজেল ও তার দল, গাছতলার অন্ধকারে গাঁজার চিলিমের আগুন লালচে হয়ে হাসছে, ধোঁয়াও উড়ছে, বাতাসে গাঁজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। শেষে কাছে এসে দেখেই ফেললো পাঁচু, সাধুবাবা বিভোর হয়ে আর গাঁজার চিলিম মুখের কাছে তুলে নিয়ে লম্বা লম্বা টান দিচ্ছেন।

অনুপমের মুখের দিকে একবার তাকায় প্রতিভা। মাথাটা তখনই হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে। বোধহয় চোখ লুকোবার চেষ্টা।

টেবিলের উপরের একটা লাল বাতিকেও জেবলে দিয়েছে অনুপম। একটা নীলবাতি, একটা লালবাতি, আর দুটোরই উপরে কালো কাপড়ের আধা ঘেরা-টোপ। অনুপমের মুখের হাসিটা যেন নানা রংয়ের ছোপ নিয়ে একটা অদ্ভুত চেহারা ধরেছে, নীলচে লালচে আর কালচে। দেখতে পেয়ে প্রতিভার চোখ দুটো নিশ্চয় শিউরে উঠেছে।

অনুপম—গুপ্তিপাড়ার চিঠি পেয়েছো?

প্রতিভা—পেয়েছি।

—কী বলে চিঠি? ভাল খবর?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি তো অন্য রকমের একটা খবর পেয়েছি। হাজরা মশাইয়ের কাছে চার বিঘে জমি বেচতে হয়েছে।

—আমি জানি না।

—জান না বলেই জানিয়ে দিলাম।

—আমার জেনেই বা কী লাভ?

—লাভ এই যে, একটা চেতনা লাভ হবে। একটু ভাল করে বুঝতে পারবে, আগে কোথায় ছিলে আর এখন কোথায় আছ?

আবার মুখ তোলে প্রতিভা। অনুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আবার মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ লুকোবার চেষ্টা করে।

অনুপম—তুমি কখনও তেজমরা সাপের চেহারা দেখেছো? গুপ্তিপাড়ার চালতে বাগানে নিশ্চয় অনেক সাপ আছে। ফোঁস করে একবার ফণা তুলেই তখুনি আবার মাথাটিকে ঝুপ করে ঝুঁকিয়ে দিয়ে ফণা গুটিয়ে ফেলে।

জবাব দেয় না প্রতিভা। তেজমরা সাপের মত সেই ঝুঁকে পড়া মাথাটারই শক্ত খোঁপাটাকে খুলতে থাকে।

অনুপম—ওই বোসপাড়াতে ছোট একটা মুদীর দোকান ছিল; হরি মুদীর দোকান। দোকানটা এখন আর নেই। কলেরায় মরে গিয়েছে হরি মুদী। সেই হরি মুদীর জীবনের একটা মজার গল্প শুনবে?

সাড়া দেয় না প্রতিভা।

চেঁচিয়ে ওঠে অনুপম—শুনতে হবে। শোন। খুব মন দিয়ে শোন।··· হরি মুদী শখ করে একটা যাত্রার দলে ভিড়েছিল। সন্ধ্যা হতেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে যাত্রাদলের আখড়াতে যেত, রাজা-গজার পার্ট নিয়ে ভাল-ভাল আর বড়-বড় কথা মুখস্থ করতো। হাত নেড়ে আর মাথা দুলিয়ে অভিনয় শিখতো। সেই হরি মুদী একদিন আখড়াতে যেতে না পেরে বাড়িতেই মুদিনীর সামনে হাঁটু পেতে বসে আর দুই হাত জোড় করে পার্টের মুখস্থ কথা আউড়েছিল—দেবি! রাখ এই বুকে তোমার ওই রাঙা-চরণ! মুদিনী তখুনি ওর একটা পা তুলে নিয়ে হরি মুদীর বুকের উপর রেখে দিয়েছিল।

প্রতিভার খোঁপার জরি-ফিতেটা হাত ফসকে মেজের উপর পড়ে যায়। তখুনি তুলে নিয়ে ফিতেটাকে বিছানার উপর রেখে দেয়।

অনুপম—আশ্চর্যের কথা এই যে, কোন-কোন গবেট মেয়ে স্বামীর মুখ থেকে ভালবাসার দুটো ভাল কথা শুনেই বিশ্বাস করে ফেলেন যে, তিনি

একটি দেবী। ওটা ভয়ানক একটা ভুল বিশ্বাস, প্রতিভা।

প্রতিভার এতক্ষণের নীরব মুখটা হঠাৎ বলে ওঠে—নিশ্চয়।

অনুপম—হ্যাঁ, নিশ্চয়। নিশ্চয় যেন সব সময় মনে থাকে।

কাক ডেকে উঠেছে। ভোরের কাকেরই ডাক। পূবের আকাশেও ঘুম-ভাঙা আলোর আভা জেগেছে। টেবিলের বাতি নিভিয়ে দিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায় অনুপম। বারান্দার রেলিংয়ের উপরে হাত দুটোকে আল্‌গা করে রেখে দিয়ে আর চোখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে, ভোরের বাতাসে উসখুস করছে গ্যারেজ-ঘরের ছাদের উপর কয়েকটা শুকনো পাতা। তার উপর হুটোপুটি করে খেলা করছে দুটো কাঠবিড়ালী।

বোধহয় একটা লঞ্চ এসে গঙ্গার ঘাটে লাগবার চেষ্টা করছে। উলুবেড়ের মাছের লঞ্চ ঠিক এই সময়ে রোজই আসে। তাই একটা জলভাঙা ছলছল শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আর কামিজটাকে গায়ে দিয়েই অনুপম বলে—চল।

প্রতিভা—কোথায়?

অনুপম—আবার জিজ্ঞেসা করা কেন? যেতে বলছি, যেতে হবে।

প্রতিভা—চল।

তারপর আর দেরি হয় না। নীচে নেমে আসে অনুপম, সঙ্গে প্রতিভা। দারোয়ান বীরবাহাদুর গেট খুলে দেয়। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে অনুপম।—উঠে বসো।···না পিছনের সীটে নয়, সামনের সীটে বসো।

অনুপমও উঠে বসে, স্টিয়ারিং-এর চাকা দু' হাতে আঁকড়ে ধরে। শব্দ করে গুমরে ওঠে, ছুটে বের হয়ে যায় নতুন গাড়িটা।

হাওড়া-পুলের মুখের কাছে এসে গাড়ির স্পীড একটু মৃদু করে দেয় অনুপম।—কেমন হয়, যদি এখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে ওদিকের হাওড়া, তারপর বালীতে ওদিক থেকে গঙ্গা পার হয়ে এদিকে দক্ষিণেশ্বর, তারপর সোজা আবার আমাদের বাগবাজারে ফিরে আসা যায়? মন্দ নয়, কী বল?

প্রতিভা—তুমি যা বলবে, তাই।

অনুপম—আমি তো বলতে চাই, তুমি রোজই সন্ধ্যাবেলা একবার বেড়িয়ে আসবে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে অবিশ্যি অসুবিধেয় পড়বে। হয়তো আমিই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম, সেদিন সন্ধ্যাবেলা তোমার আর বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হবে না। যাই হোক, এ অসুবিধেও বেশি দিন থাকবে না। খুব সম্ভব, তিন-চার মাসের মধ্যেই আর-একটা নতুন গাড়ি পেয়ে যাব।

শালকিয়ার এই রাস্তার এখানে এত সকালেও কী ভয়ানক একটা নড়বড়ে ভিড়। টিনের চালার একটা শেড পুরনো টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা, এটা নিশ্চয় একটা লঙ্গরখানা। লঙ্গরখানাতে ধোঁয়া নেই, এখনও উনান জ্বলেনি। তবু

এরই মধ্যে কত বড় একটা খাই-খাই ভিড় জুটে গিয়েছে।

জোরে জোরে হর্ন বাজিয়ে আর ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে অনুপমের গাড়িটা আবার স্পীড বাড়িয়ে দেয়। অনুপম বলে—একটু সাহস করে না চলতে পারলে এ পৃথিবীতে কেউই তোমাকে পথ ছেড়ে দেবে না, তুমিও চলতেই পারবে না। বাবা বলতেন···।

বালীর গঙ্গাপুলের উপর দিয়ে পুবমুখো হয়ে ছুটে চলেছে অনুপমের গাড়ি। সকালবেলার ঝলমলে রোদ গাড়ির সামনের কাচের উপর ঝলসে ঝলসে জ্বলছে। প্রতিভার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নেয় অনুপম।—আজ আমার সত্যিকারের নিজের জন বলতে তুমি ছাড়া আর কে আছে, বল? কেউ নেই। আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, তুমি একটা বাজে চিন্তে মনের মধ্যে পুষে রেখে আমাকে কষ্ট দিতে পার, আর আমিও কতগুলো শক্ত কথা বলে তোমাকে কষ্ট দিতে পারি। এ বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে, প্রতিভা।

গঙ্গার জলের ঢেউয়ের উপরেও সকালের রোদের আলো দুলছে ভাঙছে আর গলে গলে গড়িয়ে যাচ্ছে। অনুপম বলে—ভালবেসে একটা জিনিস এনে দিয়েছি; ওটাকে তুচ্ছ করো না। তুচ্ছ করতে নেই। সব সময় না হোক, অন্তত মাঝে মাঝে ওই দুল কানে দিও।

কে জানে কখন ব্যারাকপুর পার হয়েছে গাড়িটা। এইবার সিঁথি পার হয়ে টালার পুলের উপরে উঠছে। অনুপম বলে—তোমাকে বোধহয় খুব শিগগির নেমন্তন্ন করতে আসবেন রোহিণী, তার মানে···।

হেসে ফেলে অনুপম—তার মানে চন্দ্রবাবুর স্ত্রী। কাজেই আমি তোমার জন্যে নতুন ডিজাইনের একটা জড়োয়া নেকলেসের অর্ডার দিয়ে রেখেছি। চন্দ্রবাবুর বাড়ির নেমন্তন্নে যাবার সময় ওটা পরবে। হয়তো কাল কিংবা পরশু, নয়তো বুধবারেই জিনিসটা পাওয়া যাবে। এরই মধ্যে নেমন্তন্ন করতে যদি চলে আসেন রোহিণী, তবে তুমিও যেন আবার ভুল করে বুধবারের আগের কোনদিনের নেমন্তন্নে রাজি হয়ে যেও না।

গুপ্তিপাড়ার চিঠি। মা লিখেছে এই চিঠি। সে চিঠি একবার পড়ে নিয়েই রেখে দেয় প্রতিভা। এক হাত দিয়ে কপালটাকে টিপে ধরে। হ্যাঁ, দোলমঞ্চের ওদিকের চার-বিঘে জমি সত্যিই বিক্রী হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ আবার হেসেও ওঠে শান্ত ও গম্ভীর এই প্রতিভার কপালের ওই কটমটে ব্যথার জ্বালাটা। মা লিখেছে; মণ্টু খুব রোগা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু

এখন বেশ সেরে উঠেছে। মণ্টুর জন্যে কডলিভার তেল এসেছে। চার বেলা ওষুধের বিস্কুট খায় মণ্টু। মণ্টু আজকাল ওর দাদুর কাছেই সব সময় থাকে। ঘুমোবার হলেও দাদুর কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কাজেই রানু একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে, হাঁপ ছাড়বার সময় পায়। রানুরও তো দিন এগিয়ে আসছে। খুব সম্ভব বোশেখ মাসেই রানুর আঁতুড় হবে।

কিন্তু ছোট্ট একটা কাগজের টুকরোতে বউদি যে চার-লাইনের লেখা লিখেছেন, তার মধ্যে বউদির একটা মিথ্যে সন্দেহ বেশ শক্ত করে একটা খোঁচা দিয়েছে।—তুমি আজকাল যেমন মণ্টুকে ভুলেই গিয়েছ, মণ্টুও তেমনই তোমাকে ভুলে গিয়েছে। আজকাল দাদুর সঙ্গেই মণ্টুর খুব ভাব। তোমার কথা একবারও বলে না।

খুব ভাল করেছে মণ্টু। কিন্তু রানু বউদি এ কী কথা লিখলেন? মণ্টুকে এরই মধ্যে ভুলে যাব, আমার মনের এমন দুর্ভাগ্য যে এখনও হয়নি। আমার মন যে সব-সময় গুপ্তিপাড়ার ওই বাড়িতেই ছুটে গিয়ে আর মণ্টুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে ছটফট করছে। তুমিই বরং একটু সাবধান হও, বউদি; আমার ছোঁয়াচ মণ্টুর গায়ে লাগতে দিও না।

ভদ্রলোক খুব জোর গলা করে সাধুবাবার গাঁজা খাওয়ার গল্প শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু গল্প করে বললে তো অনেক কিছুই বলা যায়। জবাবের গল্পও আছে। সে গল্পটা তো রানু বউদিই বলেছিলেন। এক ডাকাতের একবার খুব সাধ হয়েছিল, গাঁয়ের গরীব বামুনকে ভালরকম একটা প্রণামী দিয়ে খুশি করে পুণ্যি লাভ করতে হবে। কিন্তু বামুনের আপত্তি, তোর দেওয়া কোন কিছুই আমি নেব না, ছোঁবও না। একদিন রাত্রিবেলা সেই বামুন এক মন্দিরে ঢুকেছেন, তাঁর ভাঙা-ময়লা খড়মজোড়া মন্দিরের দরজার বাইরে রেখে দিয়েছেন। ফিরে এসে দেখেন, সেই পুরনো ভাঙা-ময়লা খড়মজোড়া নেই। সোনার বোলের একজোড়া নতুন খড়ম সেখানে পড়ে রয়েছে। গরীব বামুন একটু হাসলেন, তারপর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওরে, ভাল চাস তো আমার খড়ম দিয়ে যা, নইলে এই চললাম। সোনার বোলের খড়মজোড়াকে পা দিয়েও একবার না ছুঁয়ে খালি পায়েই হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে এলেন সেই বামুন।

ভদ্রলোক আজ একবার খোঁজ করে সেই পাঁচু গেঁজেলকেই ডেকে আনুক না কেন। তাহলে একবার জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, সাধুটার লোভ জন্মাবার জন্যে যে গাঁজা সাধুটার চোখের সামনে সে রেখে দিয়ে যেত, সেটা কোথা থেকে, কেমন করে আর কিসের রোজগারে কিনে আনতো পাঁচু? পাঁচু নিশ্চয় বলে দিতে পারবে। এই ভদ্রলোকও তাহলে বলে দিক না কেন, কিসের রোজগারে হীরের দুল কেনা হয়েছে? বলতে পারবে কি? বলতে এত কুণ্ঠা কেন?

একটা তেজমরা সাপকে এত ভয় করবারই বা কী আছে?

বীণার দাদা বিশ্বনাথদা পুকুরের ঘাটের এদিকে-ওদিকে প্রায়ই সাপ মারেন। সাপটা মরে যাবার পরেও বিশ্বনাথদার মনের সন্দেহ যেন দূর হয় না। আবার ঠেঙ্গা দিয়ে সাপটার মাথা ছেঁচে ঘষে আর থেঁতলে দিয়ে চলে যান।

এই ভদ্রলোকও তাই করলেন। সাপটার মাথা থেঁতলে দিলেন, যেন আর কোনদিনও ফণা তুলতে না পারে। কিন্তু সেজন্য নিজেরই গায়ে রক্ত মেখে এরকম একটা খুনী বিভীষিকা হবার কোন দরকার ছিল না।

সকাল হতেই নতুন গাড়িতে চড়ে বেড়িয়ে আসা; খুব চমৎকার! এ যেন মরা পাখিকে জল খাওয়াবার চেষ্টা। শেফালীদির ভাই চিনুর সেই কাণ্ড দেখে হেসে ফেলেছিলেন সমরবাবু।

ভাগ্যি ভাল বলতে হবে, চন্দ্রবাবুর রোহিণী নেমন্তন্ন করতে আসেননি। তাঁর শরীর খারাপ। তাঁর মাথা ঘোরার সেই পুরনো অসুখটা আবার জোর করেছে। তিন মাস হলো বিছানায় পড়ে আছেন। নতুন ডিজাইনের নেকলেস গলায় দিয়ে নেমন্তন্নে যাবার সুখ সহ্য করবার আর দরকার হয়নি।

ভাগ্যি ভাল বলতে হবে, আজকাল রাত্রিবেলা ঘরের দরজা বন্ধ করেই ঘুমিয়ে পড়তে পারা যায়। এটা নতুন তৈরী তেতলার সবচেয়ে ভাল ঘর। কাজের মানুষ নিজেই একটু চিন্তে করে নিয়ে শেষে বলে দিয়েছেন, না, বেশি রাত পর্যন্ত দরজা খোলা রাখা উচিত নয়। ভবতোষবাবুর বাড়িতে চুরি হয়ে গিয়েছে। কিছু নগদ টাকা আর কিছু সোনার গয়না, জগদম্বা দেবীর শেষ সম্বল লোপাট হয়েছে।

কাজের মানুষ ইচ্ছে করেই পাশের ঘরে নতুন মেহগনির খাটে তার বিছানা রেখেছে। সেই ঘরেই তার স্টীল-সেফ; সেই ঘরেই তার লেখা-পড়ার একটা নতুন টেবিল। কাজের মানুষকে অনেক রাত পর্যন্ত কাগজ-পত্র নিয়ে ভাবতে হয়, হিসেব লিখতে হয়। জানবার উপায় নেই, জানবার দরকারও নেই, ওই ঘরে কাজের মানুষ তার লেখা-জোখার কাজ কখন শেষ করে, আর, কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে অবশ্য জানতেই পারে প্রতিভা, কাজের মানুষ তার কাজের লেখাজোখা আর হিসেব শেষ করেও, এই গভীর রাতেও ঘুমিয়ে পড়েনি। প্রতিভার ঘুম যতই গভীর হোক না কেন, সে ঘুমের মধ্যে কোন স্বপ্ন থাকুক বা না-ই থাকুক, একটা শব্দ শুনে ধড়ফড়িয়ে ভেঙে যায় প্রতিভার ঘুম। দরজার কপাটের গায়ে টোকা পড়ছে, টক্ টক্ টক্! বিছানা থেকে নেমেই দরজা খুলে দেয় প্রতিভা।

কী আশ্চর্য, ঘরের দরজার টোকার শব্দ বাজে যে-রাতে, ঠিক সেই রাতের

পরের দিনেই সকালবেলাতে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে সুধার মা হেসে ফেলে আর মনের ভিতরে চাপা কথাটাকে শেষে মুখ খুলে বলেই ফেলে—তোমার কেন যে এত বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে, বউদি, আমি তো তার কোন নিদেন খুঁজে পাচ্ছি না।

প্রতিভা বলে—ভাগ্যি ভাল বলবো, যদি ভগবানের এই দয়া চিরকাল থাকে।

চমকে ওঠে সুধার মা'র চোখ। বউদি সত্যিই খুব গম্ভীর হয়ে আর চোখ দুটো কুঁচকে শক্ত করে নিয়ে কথা বলছেন।

সুধার মা—দাদাবাবুর চা আর খাবার কি তবে...।

প্রতিভা—তবে আবার কি? ওরকম করে কথা বলছো কেন? জিজ্ঞেস করবার কী আছে? আমাকে দাও, আমিই দিয়ে আসছি।

শেফালীদির কাছ থেকেও একটা চিঠি অনেক দিন হলো এসেছে। কেমন আছ প্রতিভা? মাঝে যে একবার লিখেছিলে মন ভাল নয়, তার মানে কি? বোধহয় শরীর ভাল নয়। কিন্তু সেজন্যে কি মন খারাপ করতে হয়? তুমি এখনও সেই আগের মতই বোকা।

চিঠির জবাব দিতে তো আর কোন অসুবিধে নেই। প্রতিভার হাতের কলম আর লাজুক হয়ে জবাব লুকোতে চেষ্টা করবে না; পাল্টা শেফালীদিকে ঠাট্টা করে নতুন খবর জানতে চাইবে না। শুধু একটু স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে, ভাল আছি। শরীর একটুও খারাপ নয়। তুমি ওই বিশ্রী কথাটা বার বার লিখবে না, আমার বড় ভয় করে। শুনেছিলাম, তোমরা গিরিডি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসবে। সত্যি তো? কবে আসছো?

এই তিন মাসের মধ্যে আরও অনেক কিছু ভেঙেচুরে, তার বদলে মনের মত করে একটা নতুন রূপ সাজিয়ে দিয়েছেন অনুপম রায়। একেবারে নতুন চেহারার দুটো ঘর। নতুন রং আর পালিশ, নতুন পর্দা কার্পেট আর পাপোশ, আসবাবও সবই নতুন। ননীকাকার সেই ঘর, আর তাঁর বইয়ের ঘরে পুরনো চেহারার একটা ধুলোকণাও নেই। বইগুলি বড় বড় কুড়ি-পঁচিশটা শক্ত ক্যাম্বিসের থলের মধ্যে বোঝাই হয়ে এখন কলতলার কাছের একটা ছোট কুঠুরীর ভিতরে পড়ে আছে। থলেগুলি নাকি খুব মজবুত, জলে ভেজে না। অনুপম নিজেই বলেছে, এ থলে কলকাতার বাজারে পাওয়া যায় না। এগুলো মিলিটারীর জিনিস। ফোর্ট থেকে আনিয়েছে।

অনুপম রায় যেমনটি চেয়েছেন, ঠিক তেমনটি হয়ে এই বাড়ির জীবন চলছে নড়ছে হাসছে। অনুপমের চা ও খাবার হাতে নিয়ে প্রতিভা যখন উপর-তলায় উঠে যায়, তখন সিঁড়ির একপাশের দেয়ালের গায়ে প্রতিভার খোঁপার ছায়াটাও দুলতে দুলতে উপরে উঠতে থাকে। বেশ শান্ত ছন্দে বাঁধা এই

বাড়ির জীবন। কোন নালিশ কিংবা আক্ষেপ, কোন অভিযোগ কিংবা অভিমানের কলরব নেই।

শেফালীদি সত্যিই যদি একদিন সব বুঝে ফেলে তবে বোধ হয় চোখ-দুটো বড় করে আর আতঙ্কে শিউরে উঠে জিজ্ঞাসা করবে, এরকম হলে তোমার চলবে কি করে? কতদিন চলবে? খুব চলবে, শেফালীদি। তিন মাস যখন চালাতে পেরেছি, তখন তিন বছর কিংবা ত্রিশ বছরও চালাতে পারবো। কিন্তু সাবধান, তোমার পায়ে পড়ি, মা-বাবা, দাদা আর বউদিকে কোনদিন ভুলেও কিছু বলে দিও না।

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়েই খাবার খেতে থাকে অনুপম—এ ডাল-পুরি কে করেছে? তুমি?

প্রতিভা—আমি না। সুধার মা তৈরী করেছে।

অনুপম খুশি হয়ে হাসে—বুড়ির হাত তো বেশ ভাল। তুমি বোধহয়...।

প্রতিভা হাসে—আমিও পারি। আচ্ছা, কাল আমি তৈরী করবো।

হঠাৎ রুমাল দিয়ে হাতের আঙুল থেকে ডালপুরির ঘিয়ের দাগ মুছতে থাকে অনুপম। প্রতিভা বলে—ও কি? বাকি সবই তো পড়ে রইল। একটার শুধু আধখানা খেয়েই...।

চমকে ওঠে প্রতিভা। প্রতিভার একটা হাত ধরে ফেলেছে অনুপম। উঠে দাঁড়ায় অনুপম। প্রতিভাকে কাছে টেনে নিয়ে প্রতিভার পিঠে হাত বোলাতে থাকে। প্রতিভা বলে—খেয়ে নাও।

অনুপম—খাবই তো। কিন্তু তোমাকেও খেতে হবে।...না, কোন আপত্তি শুনবো না। হাঁ কর। বলতে বলতে প্রতিভার মুখের উপরে একটা আস্ত ডালপুরি চেপে ধরে অনুপম।

প্রতিভা—খাচ্ছি, খাচ্ছি। আমার হাতে দাও।

অনুপম হাসে—ঠিক তো? ব্লাফ নয় তো?

প্রতিভা—না।

ডালপুরির একটা টুকরো ভেঙে নিয়ে প্রতিভা মুখে ফেলতেই তাড়াতাড়ি খাবার খেতে থাকে অনুপম। তারপর তিন চুমুকে চা শেষ করে দিয়েই হাত মোছে।—আজ এখনই একবার বাইরে যেতে হবে। ফিরতে অবিশ্যি তেমন কিছু দেরি হবে না।

চলে গেল অনুপম। দোতলা থেকে নীচে। আর প্রতিভা চলে যায় দোতলা থেকে উপরে, নিজের ঘরে, যে ঘরের এই আয়না কতবার দেখেছে, ভালবাসার একটি হাত একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে, আর-একটি হাতে কেমন করে তার পিঠের উপর সুখের স্বপ্নের ছোঁয়া বুলিয়ে দেয়।

না না, এটা তো নতুন আয়না। সেই পুরনো আয়নাটা আর নেই, যার

সামনে এ বাড়ির জীবনের সেই প্রথম দিনেই প্রতিভার গলা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল অনুপম। বেশ ছিল সেই আয়নাটা; একদিকের ফ্রেমটাই নেই; নীচের অর্ধেকটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। এই নতুন আয়নার সামনে প্রতিভা শুধু একাই দাঁড়িয়েছে আর হেসেছে।

ঘরে নতুন আয়না এল, পাশের ঘরে একটা স্টীল-সেফও এল; ঠিক তারপর থেকেই যেন এ বাড়ির বাতাসে একটা অপয়া ছায়ার আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। ফুল হয়ে গেল কাঁটা। সে কাঁটা প্রতিভার প্রাণটাকে বিঁধে বিঁধে অনেক রক্ত ঝরিয়েছে; তাতেই খুশি হয়েছে, শান্ত হয়েছে আর নিশ্চিন্ত হয়েছে অনুপম। তবে আবার হঠাৎ কেন আজ সেই পুরনো ফুলের স্মৃতি পিঠের উপর বুলিয়ে দেওয়া? তবে কি আবার সেই পুরনো মায়া আজ এতদিন পরে অনুপমের বুকের ভিতরে ঢুকে বলে দিয়েছে; ভুল করেছো তুমি।

কিন্তু এ কী ছাই অভিশাপ! কিছুতেই যে ভুলতে পারা যায় না, কোন্ এক সুড়ঙ্গ থেকে গুপ্তধন তুলে নিয়ে এসে অনুপম তার ভাগ্য আর গর্ব তৈরী করে ফেলেছে। বেশ তো, ভাগ্য আর গর্বের মানুষটা ঘরের বাইরে বাইরেই থাকুক না কেন; শুধু সেই পুরনো মানুষটি ঘরের ভিতরে থাকুক। তাহলেও তো একরকম চলতে পারা যাবে, মরে থাকতে হবে না।

বিছানার উপর পড়ে আছে, সিল্কের একটা পাঞ্জাবি। সোনার বোতামে আর চেনে ফাঁস লেগে পাঞ্জাবির বুকের একটা দিক কুঁচকে দিয়েছে। কাজের মানুষের তাড়াহুড়ো ব্যস্ততার ভুল আজ এই সকাল থেকেই এখানের এই ঘরের বিছানার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যাবার সময় জামাটাকে তুলে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে অনুপম।

পাঞ্জাবিটা হাতে তুলে নিয়ে নীচের তলায় নেমে যায় প্রতিভা।—দুর্গা, তুমি কোথায়?

—এই যে মা। কলতলায় আছি।

—তোমার হাতের সাবানের কাজ হয়ে গিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে সাবানটা এবার আমাকে দাও।

—সে কি? জামাটা রেখে যান। আমিই সাবান দিয়ে দেব।

—না না; তুমি সর। তুমি বরং এখন গিয়ে রান্নাঘরের দোরগোড়ায় পা ছড়িয়ে বসো, আর দোক্তা খাও।

প্রতিভার এই হঠাৎ-ব্যস্ততার কাজ সারতে কতই বা সময় লাগে? পনর মিনিটের বেশি নয়। সাবান-কাচা জামাটাকে হাতে নিয়ে আবার উপরতলায় চলে যায় প্রতিভা।

সকাল মাত্র ন'টা। তবু এরই মধ্যে তেতলার এই বারান্দার হাওয়া কত

শুকনো আর গরম হয়ে উঠেছে। সাবান-কাচা পাঞ্জাবিটা কত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক কাজ নয়; খেলার মত একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে প্রতিভা। ঘরের কুঁজো থেকে এক গেলাস করে জল আনে, চীনে লিলি ও জাপানী হানার গায়ে সেই জল আস্তে আস্তে গড়িয়ে দেয়। ইস্, পাতাগুলো কত নেতিয়ে পড়েছে; ফুলগুলোও চুপসে গিয়েছে।

রামপ্রসাদ এসে বলে—মাস্টারমশাই অজয়বাবু এসেছেন।

প্রতিভা—এসেছেন তো আমি কী করবো বল? বলে দাও, বাবু বাড়িতে নেই।

—বলেছি।

—তবে?

—বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—আমার সঙ্গেই বা দেখা করে কী হবে?...হ্যাঁ, এক কাজ কর। ভদ্রলোককে আগে চা আর খাবার দাও। তারপর বলে দাও, মা আর টাকা দিতে পারবেন না। যেন বাবুর সঙ্গে দেখা করে টাকা চান।

চলে যায় রামপ্রসাদ।

ছোট্ট এইটুকু একটা গাছ, ধড়টা আধ হাতও নয়, কিন্তু কত বড়-বড় শুঁড় বের হয়েছে, দেখ! গুঁড়ো গুঁড়ো হলদে রঙের ফুলে ভরা শুঁড়গুলি টব ছাপিয়ে মেজের উপর লুটিয়ে পড়েছে। এসব বিলিতী ফুলের নামগুলিও ছাই মনে থাকে না। হলদে ফুলের শুঁড়ের উপর আস্তে আস্তে জল গড়িয়ে দিতে থাকে প্রতিভা।

রামপ্রসাদ ফিরে এসে হাসতে থাকে।—মাস্টারমশাই বলছেন, টাকা চাইতে আসেননি। টাকার দরকার নেই। আপনাকে কয়েকটা কথা বলে যেতে চান।

প্রতিভা—আমার কাছে কথা? কী কথা? ও...তাই বল! কেমন আছেন অজয়বাবুর স্ত্রী?

রামপ্রসাদ—আমাকে কিছু বলেননি।

প্রতিভা—আচ্ছা, বল গিয়ে আমি আসছি।

সত্যি বেশ ভয়-ভয় করে। কে জানে কী খবর শোনাবেন ভদ্রলোক। মহিলা সত্যিই আছেন তো? না, ডাক্তার ডাকবার আগেই.. ।

নীচের তলার সেই ঘর, যেটা আগে ননীকাকার বইয়ের ঘর ছিল, আর, এখন হলো নতুন সোফাতে আর কার্পেটে সাজানো একটি ঘরোয়া ড্রইং-রুম, তারই দরজার পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢোকে প্রতিভা।—কী খবর?

অজয়—সেদিন খুব ঠিক সময়ে ডাক্তারকে ধরতে পেরেছিলাম।

প্রতিভা—আপনার স্ত্রী এখন নিশ্চয় বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

—বেশ সুস্থ হয়ে ওঠা তো সম্ভব নয়। তবে আছে, একরকম ভালই আছে।

—কথা-টথা বলছেন?

—মাঝে মাঝে বলে। তবে...আপনি নিশ্চয় জানেন না যে, কথা বলতে ডাক্তারের নিষেধ আছে। তাই, যা বলতে চায় সরযূ, সেটা ওকে স্লেটে লিখে লিখেই বলতে হয়।

—এ তো বড় কষ্টের কথা!

—তা তো বটেই।

—লিখে লিখে আর কতটুকুই বা বলতে কিংবা বোঝাতে পারবেন?

—সব সব; তাতে কোন অসুবিধা হয় না।

—উনি নিশ্চয় অনেক লেখা-পড়া করেছেন।

—তা এককালে করেছেন। মেয়ে-স্কুলে পড়াতে হয়েছে।

—অসুখটা না হলে বোধহয় এখনও...।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে তো এখনও চাকরি করতো সরযূ। আগে নিজেই আমাকে কতবার ধমক দিয়ে বলেছে, তুমি ঘরে বসে থাকো, তোমাকে কোন কাজ করতে হবে না।

—যাক্, সুখবর শোনালেন। শুনে খুব ভাল লাগলো।...চা-খাবার খেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আমি এখন তবে...।

—আমি একটা কাজ ধরেছি।

—ভাল। আপনি এখন তবে...।

—এক ফরাসী মিলিটারী সাহেবের স্ত্রীকে আমাদের দেশের পাহাড়ী স্টাইলের ছবি আঁকা শেখাতে হয়; আর মেঘদূত বুঝিয়ে দিতে হয়। মাসে একশো টাকা দিচ্ছে।

—আপনি কি এরকমের কাজ ছাড়া আর-কোন রকমের কাজ করতেই পারেন না?

—খুব পারি, কিন্তু করতে চাই না।

—কেন?

—সে বড় অস্বস্তির ব্যাপার। অনেক বাজে কথা কানে শুনতে হয়। তা ছাড়া, ওরকম ঘড়ি ধরা দশটা-পাঁচটা নিয়মে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভবই নয়। একটানা অতক্ষণ ঘরের বাইরে থাকতে পারি না।

হেসে ফেলে প্রতিভা।—আচ্ছা, আপনি এখন তবে...।

প্রতিভার কথা শেষ না হতেই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অজয়। পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে।—এই নিন। আপনার চল্লিশ টাকার মাত্র দশটা

টাকা এখন দিলাম। বাকিটা যেমন পারি আর যখন পারি দিয়ে যাব।...হ্যাঁ, আপনি যথাসময়ে টাকাটা দিয়ে কী যে উপকার করলেন, তা আর বলে বোঝানো যাবে না। অনুপমকে বলবেন, আমি এসেছিলাম।

প্রতিভার চোখে যেন ছোট্ট একটা ভ্রূকুটি ছায়া-ছায়া হয়ে কাঁপতে থাকে। অজয় মাস্টারের এই কাণ্ডটাও যেন একটা শক্ত আঙুলের টোকা, প্রতিভার মুখের হাসিটাকে এলোমেলো করে দিয়েছে। প্রতিভার মুখের কথাগুলিও লজ্জা পেয়ে বিড়-বিড় করে।—আমি বুঝতে পারিনি যে, আপনি টাকা ফেরত দিতে এসেছেন। দিন তবে।

অজয়ের ফেরত দেওয়া টাকা হাতেই তুলে নেয় প্রতিভা। অজয় বলে—ফেরত দেব না? কী বলেন আপনি? সরযূ বললে, যিনি অসময়ে এত উপকার করলেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে টাকাটা ফেরত দিয়ে এস। কিন্তু এ মাসে দশ টাকার বেশি দিতে পারা গেল না।

প্রতিভা হাসে—কই? ধন্যবাদ তো দিলেন না।

অজয়—দিইনি?

প্রতিভা—না।

অজয়—তাহলে ভুলই হয়েছে। কিন্তু আপনি তো বুঝতেই পেরেছেন, আপনাকে ধন্যবাদ দেবার জন্যেই এসেছি।

প্রতিভা—তা বুঝেছি। যাই হোক্, আপনি ভাল আছেন তো?

—হ্যাঁ শরীর ভাল। এ শরীর যে কখন্ ভাল থাকে না, তা'ও জানি না, বুঝিও না। কিন্তু...। হঠাৎ কথা থামিয়ে প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে অজয়ের দুই চোখ যেন অপলক দুটো শূন্যতার মত তাকিয়ে থাকে।

প্রতিভা—বলুন, কী যেন বলছিলেন।

অজয়—শুধু বুকটা ভাল নেই।

প্রতিভা—সে কী? আপনাকেও একটা অসুখে ধরেছে?

অজয়—না। বুকটা খালি।

প্রতিভা—তার মানে?

অজয়—পাপিয়া নেই।

প্রতিভা—কে?

—আমার মেয়ে পাপিয়া। এইটুকু একটা মেয়ে, চার বছর বয়স। ওই সেদিনই, যেদিন আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেলাম, সেদিনই মেয়েটা, কী আশ্চর্য, বেশ কিছুক্ষণ ঘুমলো, আর, তারপরেই চলে গেল।

প্রতিভার চোখের পাতা থরথর করে কাঁপে। তাই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আর মাথা ঝুঁকিয়ে মেজের উপর পাতা মির্জাপুরী গালিচার কিনারাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। গালিচার কিনারাতে লাল সুতোয় বোনা একটা ফুলের ডাল,

তার উপর একটা পাখি।

অজয় বলে—ইতালীতে খুব পুরনো কালের একটা সমাধির পাথরে দু' লাইনের একটা কবিতা লেখা আছে। প্লিনির কবিতা। ইনি কিন্তু সেই বিখ্যাত নেচারাল হিস্টোরিয়ান প্লিনি নন, যিনি ভিসুভিয়াসের আগুন আর লাভার ভয়ানক রূপ স্টাডি করতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। ইনি হলেন কবি প্লিনি : ওই প্লিনিরই ভাইপো...আপনি কি সত্যিই শুনছেন?

প্রতিভা—শুনছি।

অজয়—পাথরটা খুব ছোট, তার কারণ ওটা খুব ছোট্ট একটি মেয়ের সমাধির পাথর। তার গায়ে কবি প্লিনির কবিতার দুটি লাইন লেখা আছে : আজও আছে।—হে পৃথিবীর মাটি, এর বুকের উপর তুমি একটু হালকা হয়েই থেকো : ভার দিও না। কারণ, এ যে তোমারও বুকের উপর এতদিন খুব হালকা হয়েই ছিল, ভার ছিল না।...আমার পাপিয়ার বয়সও তো মাত্র চার বছর হয়েছিল, কতটুকুই বা ভার, আর কী-ই বা ওজন!

হঠাৎ হেসে ফেলে অজয়।—কিছুই বোঝা যায় না! আচ্ছা, চলি।

চমকে ওঠে প্রতিভার ঝুঁকে পড়া মাথাটা। চলে যাচ্ছেন ভদ্রলোক, কিন্তু ভদ্রলোককে সামান্য দু'-একটা সান্ত্বনার কথাও বলা হলো না। লোকে একটু সান্ত্বনার আশা করেই তো পরের কাছে নিজের দুঃখের কথা বলে। ছি ছি, খুবই বিচ্ছিরি একটা অভদ্রতা করা হলো।

চলে যেতে যেতেই থম্‌কে দাঁড়ায় অজয়। মুখ ফিরিয়ে আর বেশ উৎফুল্ল স্বরে কথা বলে—আপনি কি বলতে পারবেন, নটে চাঁপা কোথায় পাওয়া যায়?

প্রতিভা—নটে চাঁপা? না, চাঁপা নটে?

অজয়—না; নটে চাঁপা। ছোট ছোট কড়ির মত গড়ন, একটু লালচে-হলুদ রং, আর খুব মিষ্টি সুগন্ধ।

প্রতিভা—আমি জানি না।

অজয় হাসে—কেউই জানে না, দেখছি। যাকে জিজ্ঞেস করি সেই বলে, জানি না, বলতে পারি না, কখনও দেখিনি। মনে হচ্ছে, নটে চাঁপা ফুল শুধু আমি আর সরযূ ছাড়া পৃথিবীর আর কেউই কখনও দেখেনি। যাই হোক্, শেষে এক ঠোঙা চাঁপা নিয়েই বাড়ি যেতে হবে। সরযূকে বলবো, এই নাও তোমার বোটানির মাইকেলিয়া চম্পকা; নটে চাঁপা পাওয়া গেল না।

প্রতিভা—আজ বোধহয় আপনার বাড়িতে ফুলের কোন দরকার আছে?

অজয়—আছে।

প্রতিভা হাসে—বলতে আপনার আপত্তি আছে, কিসের দরকার?

অজয়—মনে হচ্ছে, আপনি অনেকটা বুঝেই ফেলেছেন। হ্যাঁ, আজ আমাদের বিয়ের বাৎসরিকী দিন। সরযূ বললে, যাও, দেখ চেষ্টা করে, নটে

চাঁপা কোথাও পাও কিনা; নইলে কিছু চাঁপাই নিয়ে এস।

প্রতিভা—কিন্তু সরযূদি কি এখন পারবেন, মালা-টালা গাঁথতে?

অজয়—না না, মালা গাঁথার ব্যাপার নেই। সেদিনও ছিল না। বালিশের পাশে কিছু চাঁপা ফুল রেখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে সরযূ। এই একটু শখ; এর বেশি কিছু নয়। এ বছর অবশ্য তারই মধ্যে একটু নতুন ব্যাপার আছে। চমৎকার মজার ব্যাপার। তার মানে...।

প্রতিভা—আপনি চুপ করুন। বেশি কথা আমার না শুনলেও চলবে।

অজয়—শুনলে আপনার বোধহয় ভালই লাগতো।

প্রতিভা—না। এসব কথা বলতে আপনার একটু লজ্জা থাকা উচিত।

অজয়—আপনি বোধহয় একটু ভুল বুঝেছেন। লজ্জার কথা হলে আমি আপনাকে সে-কথা বলতে যাব কেন? আমি তো পাগল নই।

প্রতিভা—তবে কী কথা?

অজয় হাসে—মজার কথা হলো, শুধু বালিশের কাছে চাঁপা ফুল রেখে নয়; সরযূ আজ পাপিয়ার ফটোটাকেও বুকের উপর রেখে ঘুমিয়ে পড়তে চায়। আমাকে বলেছে, তুমি শুধু পাশে বসে আমার হাত ধরে রেখ, যেন ঘুমের মধ্যেই চলে না যাই।.. আচ্ছা যাই।

প্রতিভার চোখের পাতা আবার থরথর করে কাঁপতে থাকে। না, আর মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ লুকোতে হবে না। চলে গিয়েছে অজয়। বাঁচিয়েছে।

কিন্তু কী অস্বস্তি! বুকের ভিতরটা এত হাঁসফাঁস করছে কেন? সত্যিই যে কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

উপরতলায় উঠে গিয়ে বিছানার এক কোণে চুপ করে বসে থাকে প্রতিভা। শরীরটাকে একেবারে নিথর করে আর শক্ত করে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখতে পারলে বোধহয় স্বস্তি পাওয়া যাবে। নিজের বাগানে ফুল ফোটে না, সেজন্যে কোন কান্না নেই, কিন্তু পরের বাগানের ঝরা ফুল দেখে কান্না। এ যেন জনা পিসির ছোট ছেলে হাবুর কান্নার মত একটা বাতিকের কান্না।

ঘরে ঢোকে অনুপম; সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে—এ কি? কাঁদছো কেন? কে তোমাকে টেলিগ্রামটা দেখালে? তুমি তো ইংরেজী পড়তে পার না।

চেঁচিয়ে ওঠে প্রতিভা—টেলিগ্রাম? কিসের টেলিগ্রাম? শিগগির বল।

অনুপম—তোমার এখন একবার গুপ্তিপাড়া না গেলেই নয়।

প্রতিভা—কেন? কী হলো? শিগগির বল। আমাকে না বলে-কয়ে কেউ চলে গেল নাকি?

অনুপম—হ্যাঁ।

প্রতিভা—কে? মা?

অনুপম—না; তোমার বাবা। তোমার মা'র অবস্থাও ভাল নয়। কিন্তু

কে'দ না। চেষ্টা করে নিজেকে একটু সামলে রাখ। আমি তোমাকে গুশিতপাড়া পাঠাবার ব্যবস্থা এখনই করে দিচ্ছি।

ভবতোষবাবুর বাড়ির পাঁচিলের পাশে সেই নারকেল গাছের মাথাটা আর নেই। কালবোশেখীর ঝড়ে নয়; সময়ের ঝড়ে ওটাকে শুকিয়ে মরিয়ে আর ঝরিয়ে দিয়েছে। গাছের ধড়টা শুধু দাঁড়িয়ে আছে। রাত্রিকালে চোখ পড়লে মনে হয়, ওটাও একটা মরে যাওয়া জীবনের প্রেতশরীর।

তিন বছর আগে ওই নারকেলের মাথা থেকে একটা শুকনো ঝুনো অনুপমের গাড়ির গ্যারেজের মাথায় ঝরে পড়তে দেখে যাঁর দুই চোখ জানালার আড়ালে থেকে কটমট করে উঠেছিল, সেই জগদম্বা দেবী অবশ্য আছেন। মাঝে মাঝে জানালার কাছে এসেও দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু কই, তাঁর চোখ দুটো তো একটুও কটমট করে তাকায় না। প্রতিভা বরং বেশ স্পষ্ট করে দেখতে পায়, কাঁদছেন জগদম্বা দেবী।

ভাগ্যের খবরগুলি ঠিক যুদ্ধেরই খবরের মত। এখানে হার ওখানে জয়। জগদম্বা দেবীর ছেলে নেই, একটি মাত্র মেয়ে। সে মেয়ে বিধবা হয়েছে। বাড়িটাকেও মারোয়াড়ীর কাছে বন্ধক রেখেছেন।

জয়ের খবর কতটুকু? প্রায় সবই তো হারের খবর। শেফালীদি গত বছর একবার এসে দেখা করে গিয়েছে। গিরিডি ছেড়ে কলকাতায় এসে সমরবাবু শুধু একটার পর একটা নতুন ব্যবসা ধরছেন আর ছাড়ছেন। লাভের মুখ দেখতে পান না, শুধু লোকসান। তাঁর সব ব্যবসা তাঁকে দিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়ে শুধু ফেল করে। ঘিয়ের কারবার ধরেছিলেন, সেটা অনেক টাকা ডুবিয়ে দিয়ে তারপর শেষ হয়েছে। একটা কাপড়ের দোকান কিনে নিয়ে এক বছর চালিয়েছিলেন। তারপর আর চালাতে পারেননি, তার মানে চলেনি। এইবার তৈরী হয়েছেন, একটা কল কিনবেন, গম পেষাইয়ের কল। শেফালীদির আটগাছি চুড়ি বেচে দিয়ে কলের দাম বায়না করে ফেলেছেন সমরবাবু। কথা বলতে গিয়ে কে'দে ফেলেছিল শেফালীদি, আমি বুঝি না প্রতিভা, এত লোকের ব্যবসা চলছে, শুধু ওর ব্যবসা চলে না কেন? এত খাটে মানুষটা, এত খাঁটি জিনিস দেয়, কারও কাছ থেকে একটি পয়সাও বাড়িয়ে দাম নেয় না, তবু ব্যবসা চলে না। আমি সত্যিই একদিন অনুপমবাবুকে জিজ্ঞেস করবো, বলে দিন তো, কী করলে আপনার ভায়রা মশাইয়ের ব্যবসার কপাল একটু ভাল হতে পারে।

প্রতিভা হাসে—কখ্খনো না, ভুলেও ও কর্মটি করো না। ও মানুষকে জিজ্ঞেস করে তোমার কোন লাভ হবে না।

শেফালীদি—কেন?

প্রতিভা—তুমি ওর কথা বুঝতেই পারবে না।

শেফালীদি—কী এমন কথা বলবেন যে, আমি বুঝতেই পারবো না।

প্রতিভা—যদি বলেন, সাহস করলেই ব্যবসা চলে, তবে? বল, কী বুঝবে?

শেফালীদি হাসেন—সাহস তো আছেই। দ্বারভাঙগার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘি যোগাড় করতে গিয়ে রাত্রিবেলা একবার ডাকাতের হাতেই পড়তে হয়েছিল। ভদ্রলোক তো তাতেও ভয় পাননি। এই বয়সেও ডাকাতের সঙ্গে মারামারি করে পালিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

প্রতিভা—আমি আর কী বলবো বল? মনে হয়, শুধু ওরকম সাহসে ব্যবসা চলে না। একটু অন্যরকম সাহস থাকা চাই।

শেফালীদি—আচ্ছা, আজ তবে যাই, প্রতিভা।

প্রতিভা—আবার এসো কিন্তু।

রানু বউদির চিঠি আর আসছে না। টাটানগরে যাবার পর থেকে কী যেন হয়েছে রানু বউদির। নিজের ভাগ্যটাকে গালমন্দ করে যে-সব কথা লেখেন রানু বউদি, তাতে মনে হয় যে, যেন কারও সৌভাগ্যের জন্য তাঁর মনে অনেক রাগ জমেছে। রানু বউদির চিঠি পড়ে বার বার হেসে ফেলতে হয়েছে। একটুও রাগ হয়নি। যাই হোক, সব সময় যে জানতে ইচ্ছে করে, বলাইদা কেমন আছেন, মণ্টু আর টুলু কেমন আছে? রানু বউদি এত কথা লিখতে পারে, শুধু ওদের কথা লিখতে পারে না। অদ্ভুত। বলাইদাকে চিঠি দিয়েও কোন লাভ নেই। চিঠি লেখা অভ্যাস নেই বলাইদার। কোন কালেও ছিল না। গুপ্তিপাড়া থেকে শেষবারের মত চলে আসবার দিন বলাইদা বললে, চিঠি না লিখলে কিছু মনে করিস না পতু। আমার হাতুড়িমার্কা হাত কলম ধরতে পারে না। সত্যি, বিশ্বাস কর।

গুপ্তিপাড়ার বাড়িতে এখন কোন আলো জ্বলছে কি? বিশ্বাস হয় না। বাগ্দী-বুড়ো অনন্ত সে-বাড়ির একটা ঘরের এক কোণে এখন ঘুমিয়েই পড়েছে। সন্ধ্যা হলেই নেশা করে; সে বুড়ো এখনও জেগে থাকবে কেমন করে? আলোই বা জ্বেলে রাখবে কেন?

কী ভয়ানক মিথ্যে কথা আর নিষ্ঠুর কথা বলতে পারেন ওই হাজরা মশাই। পরের মুখ থেকে শোনা কথা নয়, নিজের কানেই শোনা কথা। পুকুর-ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে আর বেশ জোরে জোরে চেঁচিয়ে বিশ্বনাথদা'র কাছে দুঃখ করছিলেন হাজরা মশাই: ওই চার বিঘের শোক পরেশবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত যা ছিল তা তো শুধু ওই চার বিঘে। সহ্য

করতে পারবেনই বা কেমন করে?

বিশ্বনাথদা'ও অদ্ভুত মানুষ। এমন একটা মিথ্যে কথাকে ধমক না দিয়ে শুধু বললেন—হতে পারে।

বিশ্বনাথদা'র মা কিন্তু মা'র শিয়রে বসে মার শেষ নিঃশ্বাসের শব্দটাকে কান পেতে শুনেছিলেন আর খুব কেঁদেছিলেন।—স্বামীর শোক সহ্য করতে না পেরেই চলে গেল বেচারা।

শেফালীদির বাবা নরেন কাকা তো বাবার কথা মনে করে এই সেদিনও শেফালীদির কাছে বলেছেন, আর বলতে গিয়ে তাঁর চোখ ছলছল করেছে—বড়দা'র যে খুব সাধ ছিল, যাবার আগে যেন দেখে যেতে পারেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে।

সবই মনে পড়ে। কিন্তু মনে পড়লে চোখের উপরে কোন কান্না ভেসে ওঠে না। পুরনো খবরের কাগজের লেখার মত এত বড় দুটো দুঃখের কথাও আজ বেশ পুরনো হয়ে গিয়েছে। বরং এখানে এই বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আর মাঝরাত পর্যন্ত আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাল লাগে, মা বোধ হয় এখন আশ্চর্য হয়ে বাবার কানের কাছে ফিসফিস করে বলছেন, মেয়েটা এত রাতে ওখানে ওরকম করে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

ভাবতে গিয়ে মনটা যেন হেসেও ওঠে। আজ সবই সম্ভব। ভয়ানক কষ্টের আঁচড়গুলিকেও মজার কথা দিয়ে হাসিয়ে দিতে পারা যায়।

কোথায় আছেন এখন অজয়বাবু, যিনি এই কাজের ওস্তাদ। বুক খালি করে চলে গেল যে চার-বছর বয়সের মেয়ে, কী যেন নামটা, পাপিয়া, সে মেয়ের ফটো বুকের ওপর রেখে ঘুমিয়ে পড়বার কথা, এটাও নাকি মজার কথা। সেদিন অজয়বাবুর কথা শুনে খুব আশ্চর্য লেগেছিল, কথাটা জগৎ-ছাড়া পাগলাটে আনন্দের কথা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ খুব বুঝতে পারা যায়; ঠিকই বলেছিলেন অজয়বাবু। ভাগ্যটাকে তুচ্ছ করে নিজের মনের মত করে বেঁচে থাকবার কায়দা ওরা বুঝে ফেলেছে, ওই অজয় আর সরযু। কেমন করে বুঝলো? ননীকাকা বলেছিলেন, ভালবাসার মত আশ্চর্য জিনিস আর কিছু নেই।

মাঝে হঠাৎ একদিন এসেছিলেন অজয়বাবু। দেনার আরও দশটা টাকা শোধ করে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু নীচে থেকেই রামপ্রসাদকে দিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কারও অপেক্ষায় আর বসে থাকেননি। কিন্তু একটা ভাল খবর জানিয়ে গেলেই তো পারতেন, সরযুদির গলার ভিতরের ঘা একটু সেরেছে, কিংবা সেরেই গিয়েছে।

আজই সকালবেলা হঠাৎ কোথা থেকে বীণা এসে হাজির। গুপ্তিপাড়ার সেই বীণা, যে বীণাকে ছোটবেলায় একবার চুলের ঝুঁটি ধরে পুকুরের ঘাটের

জলে একটা চুবুনি খাইয়ে দিয়েছিল প্রতিভা, সেই বীণা। সে রাগ বীণা বড় হয়েও ভুলতে পারেনি। বীণার বিয়ে দেখতে গিয়ে বেশ বিপদে পড়েছিল প্রতিভা। কপালে চন্দনের লবঙ্গছাপ নিয়ে আর রঙীন বেনারসী পরে বসে আছে আর কাঁদছে বীণা। প্রতিভা কাছে যেতেই আরও জোরে কেঁদে উঠলো বীণা, চললাম পতু, এবার খুঁজে দেখ, ঝুঁটি ধরে ঘাটের জলে চুবুনি দেবার জন্যে আর কাউকে পাওয়া যায় কি না।

সেই বীণা আজ কত হেসে হেসে ওর সেই জলে চুবুনি খাওয়ার দুঃখটাকেই একটা মজার গল্পের মত বলে গেল।—সত্যি, ছেলেবেলায় তুই বড্ড দুরন্ত ছিলি, পতু।

প্রতিভা—তুইও একটু বেশি রাগন্ত ছিলি, বীণা। কিছু একটা হলেই জন্মের মত আড়ি।

বীণা—তবু ভেবে দেখ তো, কী সুখের জীবনই না ছিল। আড়ি করতেও কত মজা ছিল। আর এখন......।

প্রতিভা—এখন কারও সঙ্গে আড়ি-টাড়ি করিস না?

বীণা—না; এ একেবারে মাটির মানুষ। আমি যদি বলি, আবার সিগারেট খাচ্ছ কেন, তক্ষুনি সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দেবে। যদি বলি, মনুকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। তক্ষুনি মনুকে কোলে তুলে নিয়ে মাসি-পিসি গাইতে শুরু করবে।...তুমি কেমন আছ, শুনি।

প্রতিভা—ভাল আছি।

বীণা—কী রকম ভাল?

প্রতিভা—ডেলি প্যাসেঞ্জারের মত। ভোর হতেই ঘর থেকে বের হয়ে কাজের ট্রেনে চড়ি আর রাত হলে ট্রেন থেকে নেমে ঘরে ফিরে যাই।

বীণা হাসে—চালাকি! তোমার আবার কোন্ ছাই কাজ? এত ঝি-চাকর থাকতে তোমার আবার কাজ করতে হবে কেন? আমাকে বোকা পেয়ে যত বাজে কথা বোঝানো হচ্ছে।

প্রতিভা—বিশ্বাস কর।

বীণা—না, কাজ করলে তোমার আর ওই চেহারা হতো না।...সত্যি, তুই বেশ একটু মুটিয়েছিস পতু; বেশ গিন্নী-গিন্নী চেহারা হয়েছে।

বীণা বেশ খুশি হয়ে আর হেসে হেসে এক থালা মিষ্টি খেয়ে চলে গেল।

বীণাকে একটুও মিথ্যে কথা বলা হয়নি। মনটা শুধু নিজের কাছে আছে, আর সবই ভদ্রলোকের নিয়মের শাসনে একেবারে নির্ভুল হয়ে কাজ করছে। ঘরের দরজায় টোকা পড়লেই তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতে হবে, এটাও একটা নিয়ম। অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা চলবে না। ডাক দিলেই সাড়া দিয়ে আর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। হাত ধরে যখনই যা ইচ্ছে হয় বলেন চুপ করে

শুনতে হয়। ভদ্রলোক যদি বলেন, কী, শুনতে লজ্জা করছে বুঝি, তখন লজ্জা পেয়ে হাসতেও হয়। প্রাণটাকে আর শরীরটাকে আর এ বাড়ির ইচ্ছার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যেতে তো আর কোন অসুবিধে নেই, কষ্টও নেই। অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। একঘেয়ে লাগছে বলে ডেলি প্যাসেঞ্জার তো ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে না।

কিন্তু এত রাত্রিতে এভাবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখবার কথা নয়। তবু দাঁড়িয়ে আছে প্রতিভা। মনের ভুলে যেন নিয়মটাকেই আজ ভুলে গিয়েছে, তা না হলে এ সময়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজেরই ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকতো। হয় জেগে থাকতো, কিংবা ঘুমিয়ে পড়তো; কিন্তু ঘরের ভিতরেই থাকতো।

কিন্তু পাশের ঘরে, যে-ঘরে এ সময়ে হয় আলো জেবলে কাজ করে, নয় আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে অনুপম, সে ঘরের দরজা এখনও তালাবন্ধ।

তিন বছরের মধ্যে অনুপমের টাকার ভাগ্য নতুন করে ঝনঝনিয়ে বেজে উঠেছে কিনা, জানে না প্রতিভা। জানবার তো কথা নয়। শুধু বুঝে নেবার কথা, মাটির পোকা যেমন গর্তের মুখের বাইরে শুধু শুঁড় বের করেই বুঝতে পারে, দিন না রাত। অজগরের মাথার মাণিক হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়ার মত আর একটা ব্যাপার হলে সেটা এতদিনে বুঝতেই পারা যেত। আরও একটা স্টীল-সেফ আসতো, আরও একটা নতুন গাড়ি চলে আসতো। সুধার মা একদিন বলেছিল, ভবতোষবাবুর বাড়িটা দাদাবাবু কিনবেন বলে ঠিক করেছেন। কিন্তু এখনও যে কেনা হয়নি, সেটা বুঝতে পারা যায়। সুধার মা'ও আর কিছু বলেনি। কেনা হয়ে থাকলে, নিশ্চয় খবরটা জানিয়ে দিত। এ বাড়ি থেকে শুধু ওই এক সুধার মা'র সঙ্গে ভবতোষবাবুর বাড়ির ভিতরের একটু মেলা-মেশার সম্পর্ক আছে।

তবু ভদ্রলোকের এই সুখের ছবিঘরের ভিতরে কোথাও যে একটু-আধটু নতুন রঙের ঠাট চমকে ওঠেনি, তা নয়। প্রতিভার চিন্তার কাজ অনেক লঘু হয়ে গিয়েছে। বাজারসরকার দীনুবাবু আছেন। ভাঁড়ারের দরকার থেকে শুরু করে মোটরগাড়ির তেলের দরকার পর্যন্ত, সব কিছু সামলে রাখা এখন দীনুবাবুর দায়। ঘরের দরকারে প্রতিভার যদি কিছু বলবার থাকে, তবে সেটা দীনুবাবুকে বলে দিলেই হলো।

রামপ্রসাদের পক্ষে এখন বাইরের লোকের জন্য চায়ের এত ফরমাস খাটতে পারা সম্ভব নয়। আগে চৌরঙ্গীর সাহেবী হোটেলে রান্নার কাজ করতো, মাদ্রাজী কুক রাজুলু এখন নীচের তলার ওই কাজের ঘরের অতিথিদের চা-সেবার ভার পেয়েছে। বাড়ির জন্য রোজের মাছ আর মাংস রান্নার কাজও রাজুলুর চাকরির কাজ। সুধার মা আজকাল মাছ-মাংস ছোঁয় না।

এ ছাড়া নতুন কিছু বলতে শুধু গেটের পাশের ঘর আর বারান্দাতে সকাল-সন্ধ্যা একগাদা মানুষের ভিড়। রামপ্রসাদ আজকাল আর বাইরে ছুটো-ছুটি করে না। ওই ভিড়ের মানুষগুলির কাছেই একটা টুলের উপর বসে থাকে। অনুপমের সঙ্গে একটুসাক্ষাতের কাঙাল, এক একটা শুকনো-মুখ মানুষের নাম-লেখা চিরকুট হাতে নিয়ে রামপ্রসাদ পেঁৗছে দিয়ে আসে ওই কাজের ঘরের দরজার সবুজ পর্দার কাছে বসে আছে যে দারোয়ান বীরবাহাদুর, তারই হাতে।

কিন্তু গাড়ি করে যিনি আসেন, তিনি অবশ্য রামপ্রসাদের তদারকীর অধীন ওই গেটের-পাশের ঘর আর বারান্দায় এসে বেঞ্চের উপর বসেন না। তিনি সরাসরি ভিতরে গিয়ে ড্রইং-রুমের ভিতরে সোফার উপর বসেন, সেই ঘরেরই টেলিফোনে কথা বলে অনুপমের কাজের ঘরটাকে জানিয়ে দেন, আমি এসেছি।

জল বাড়েও না কমেও না, একরকম একটা স্রোতের মত এ বাড়ির টাকার ভাগ্যটাও বয়ে যাক না কেন। কিন্তু তা কি হবে? প্রতিভার মনটা যেন বাতাসে নতুন ধুলোর গন্ধ পেয়েছে। তাই সন্দেহ হয়, আবার ঝড় আসছে। তা না হলে এতদিন পর হঠাৎ ওরকম একটা কথা অনুপমের মুখের ভাষা হয়ে আবার বেজে উঠবে কেন? আজ ভোর হবার আগেই এ ঘরের বিছানা থেকে হঠাৎ নেমে পড়লো আর দরজা খুলে ঘরের বাইরে চলে গেল অনুপম। যাবার সময় শুধু একটি কথা বলে গেল—মনে হচ্ছে, তুমি একটা ডেড-বডি।

হ্যাঁ ঠিকই ডেড-বডি। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে হতো, এই তিন বছরের মধ্যে কোনদিনও বুঝতে পারলে না কেন যে, আমি একটা ডেড-বডি? আজ হঠাৎ এই জ্ঞান চমকে উঠলো কেন?

তুমি তো ঠিক এই রকমটি চেয়েছিলে। এই ডেড-বডি যে তোমার সুখের সিংহাসন। সিংহাসন যেমন হ্যাঁ কিংবা না, কোন কথাই বলে না, ডেড-বডিও তেমনই কোন কথা বলেনি। রাজা যখন খুশি এসে সিংহাসনে বসেছেন আর খুশি হয়ে চলে গিয়েছেন। তবে আজ হঠাৎ এ রকম একটা অখুশির ধিক্কার কেন?

চমকে ওঠে প্রতিভা। কী অদ্ভুত খুশির মূর্তি হয়ে আর আস্তে আস্তে হেঁটে যেন দুলতে দুলতে, বারান্দার সিঁড়ির মুখের দিক থেকে এ দিকেই আসছে অনুপম। অনুপমের দু'হাতে দুটো চামড়ার ব্যাগ। নিশ্চয়ই খুব ভারী ব্যাগ। তা না হলে অনুপমের ওই শক্ত কাঁধের দুটো দিক ওরকম একটু ঝুঁকে পড়বে কেন?

এগিয়ে আসে অনুপম। প্রতিভার কাছে এসেই একটা ব্যাগ প্রতিভার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—ধর। সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে অনুপম। ব্যাগটাকে দু'হাত দিয়ে ঠিকই ধরেছে প্রতিভা, কিন্তু ভারী ব্যাগটা যেন প্রতিভাকেই

পাল্টা একটা টান দিয়ে ঝুঁকিয়ে কুঁজো করে দিয়েছে। আর-একটু হলে মেজের উপরেই পড়ে যেত ব্যাগটা, আর প্রতিভাও ধুপ করে বসে পড়তো।

ঘরের দরজার তালা খোলে অনুপম।—এস। প্রতিভাকেও ডাক দিয়ে ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়, আর রুমাল তুলে কপালের ঘাম মুছতে থাকে। তার পরেই প্রতিভার মুখের দিকে তাকায়। ছটফট করে অনুপমের চোখের তারা। কী যেন বলতে চায় অনুপমের চোখের ওই ছটফটে তারা। বোধ হয় প্রতিভার এই নীরব শান্ত চেহারাকে সহ্য করতে না পেরে ছটফট করছে অনুপমের মনের একটা পুরনো আশা।

অনুপম বলে—তুমি তো একবার জিজ্ঞেসও করলে না, এই ব্যাগে কী আছে।

প্রতিভা—বল।

অনুপম—সোনার বার। এবার আর কারেন্সী নোটে আমার পাওনা টাকা নিতে রাজী হলাম না। যুদ্ধ থেমেছে, একটা এলোমেলো অবস্থা। কখন্ যে কোন্ নোট অচল হয়ে যাবে, তার কোন ঠিক নেই।..... কিন্তু তুমি ওরকম করে তাকিয়ে আছ কেন? যেন মড়ার চোখের চাউনি।

প্রতিভা—জল খাবে তো, বল।

অনুপম—না। তুমি কি দোতলার সেই ঘরের ভিতরে আজ একবারও উঁকি দিয়ে দেখেছো?

প্রতিভা—কোন্ ঘরে?

অনুপম—যে-ঘরে তুমি আগে থাকতে।

প্রতিভা—না।

অনুপম—তবে চল, এখনই দেখবে চল, দেখিয়ে দিচ্ছি।

ঘরের ভিতরে ঢুকে অনুপম সুইচ টিপতে ঝকমকিয়ে হেসে উঠলো একটা প্রকাণ্ড রঙীন ছবি। তুলি দিয়ে আঁকা অনুপম রায়ের কী চমৎকার একটি রঙীন চেহারা!

অনুপম—এটা হলো উপহার। শর্মা কোম্পানী, যারা মিলিটারীর অর্ডার সাপ্লাই করে কোটিপতি হয়েছে, তারাই দিয়েছে। আর, এটা হলো একটা মানপত্র। এটা দিয়েছে একটা অ্যাসোসিয়েশন, যারা দেশের গরীব লোকের ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য প্রায় পঞ্চাশটা ফ্রী স্কুল চালায়; তারাই কাল সন্ধ্যা-বেলা আমাকে, বলতে গেলে একরকম জোর করেই নিয়ে গেল। আমি অবিশ্যি আগেই টের পেয়েছিলাম, ওরা একটা ঘটা করে সংবর্ধনার কাণ্ড না করে ছাড়বে না।...ও কি? তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন নাক সিঁটকে একটা আস্তাকুঁড়ের জঞ্জালের দিকে তাকিয়ে আছ।

প্রতিভার কাছে এগিয়ে যায় অনুপম। শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আর প্রতিভার

একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে।—বল।

প্রতিভা—কী বলবো?

—এখনই যদি তোমাকে গুপ্তিপাড়ার বাড়িতে ফেরত পাঠাতে চাই, তবে চলে যাবে তো?

—না।

—তবে বল, এখানে তোমাকে সুখে থাকতে কিসের ভূতে কিলোচ্ছে?

—কোন ভূতে কিলোচ্ছে না, শুধু তুমি আর ওরকম করে কথা বলো না, তাহলেই সুখে থাকবো।

—এই তিন বছরের মধ্যে হীরের দুল কানে দিতে তোমার ইচ্ছা হলো না কেন?

—ইচ্ছে না হলে আমি আর কী করতে পারি?

—এটা যে গুপ্তিপাড়ার চৌধুরী-মার্কা মেজাজের কথা হয়ে গেল।

—তোমার তাই মনে হয়েছে, তাই ওকথা বলছো।

—আমাকে অপমান করবার জন্য তোমার মনে একটা জেদ চেপেছে। এই জেদটাই হলো তোমার আসল সুখ।

—তোমার কথায় আর ইচ্ছায় উঠছি বসছি, তবু এ কথা বলছো?

—এটাও তো একটা চৌধুরী-মার্কা মেজাজের জীবন। কিন্তু লোক বলবে, সেই মেছুনিটার জীবন। মেছুনি একদিন ওর মিতিন এক মালিনীর বাড়িতে গিয়েছিল। রাত্রিবেলা মালিনীর ঘরের ঝুড়িভরা ফুলের গন্ধে মেছুনির ঘুম হয় না। মেছুনি শেষে ওর আঁসচুপড়ির উপর জল ছিটিয়ে নিয়ে নাকের কাছে ধরে রেখে শুয়ে পড়লো, একঘুমে রাত পার করে দিল।......তুমিই না আমাকে তোমার শেফালীদির নামে একটা গল্প শুনিয়েছিলে আর হেসেছিলে।

—কী গল্প?

—অভ্র খনির ভেতর থেকে হঠাৎ যেদিন লাখ টাকার মাল বের হলো, রাতারাতি ভাগ্যবান হয়ে গেলেন সমরবাবু; সেদিন থেকে সমরবাবু আর শেফালী নাকি প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা গলা জড়াজড়ি করে বসে একসঙ্গে গান গাইতো।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু তুমি কী করলে? আমাকে জব্দ করবার জন্যে রাতারাতি একটা ডেড-বডি হয়ে গেলে। আমি অনেক আশা করেছিলাম প্রতিভা, তুমি একদিন তোমার ভুল বুঝবে। আজ বেশ বুঝতে পারছি, আমার আর আশা করবার কোন মানে হয় না।

—তুমি বল, আমি কী করলে তুমি......।

—বলবো?

—বল।

—তুমি এখ্খুনি হীরের দুল কানে দিয়ে এসে আমার কোলে বসো, গলা জড়িয়ে ধর, আর চুমো খেয়ে বল, ভুল করেছি, ক্ষমা কর।

অনুপমের মুখের দিকে তাকায় প্রতিভা। চোখের পাতা কাঁপে, বুকের ভিতর থেকে উথলে ওঠা একটা নিঃশ্বাসকে ঢোঁক গিলে দমিয়ে দেয়।

—এখনি আসছি। ঘর ছেড়ে চলে যায় প্রতিভা আর এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে।

প্রতিভার কানে হীরের দুল। প্রতিভার দুই হাত অনুপমের গলা জড়িয়ে ধরে। প্রতিভার মুখটাও অনুপমের মুখের উপর পড়ে আর আকুল হয়ে বলে, ভুল হয়েছে, ক্ষমা কর।

অনুপম রায়ের কাজের ঘরের চার-চারটে আলোর তেজ এখন ঝকঝকিয়ে হাসতে পারে। কারণ, কালো কাপড়ের সেই আবরণ আর নেই। যুদ্ধ তো নেই।

আজকাল অনুপমের এই ঘরে সন্ধ্যা কিংবা সকালের বৈঠকে চন্দ্রবাবু আর সূর্যবাবু ছাড়া বাইরের আরও কেউ একজন থাকেন। কাল এসেছিলেন জুট-মিলের মথুরানাথ আগরওয়ালা, পরশু এসেছিলেন গ্যারিসন এঞ্জিনিয়ার মেজর গিলবার্ট, তার আগের দিন কেরোসিনের স্টকিস্ট শরৎ মল্লিক। আজ এসেছেন পুলিসের রায়সাহেব বসন্ত দত্ত।

বসন্ত দত্তের রোগা শরীরে মটকার ঢিলে পাঞ্জাবি, পরনে মিলের মোটা ধুতি আর পায়ে একজোড়া হরিণ-ছালের চটি। বসন্ত দত্ত হাসেন—সত্যিই, খাকি উর্দির ভার আর সহ্য হয় না চন্দ্রবাবু; না শরীরে, না মনে।

সূর্যবাবু—রিটায়ার করতে চান?

বসন্ত দত্ত—ইচ্ছে হয়। কিন্তু তখ্খুনি আবার মনটা নরম হয়ে যায়। অন্তত রায়সাহেবীটা দূর হলে বাঁচি।

অনুপম—ওটা বোধহয় দূর হয়েই যাবে।

বসন্ত দত্ত—বোধহয় স্বাধীনতা এসেই যাবে। কী মনে করেন?

অনুপম—মনে করতে তো ভালই লাগে।

চন্দ্রবাবু—হিটলারের শেষটা কিন্তু খুবই করুণ। কে ভেবেছিল যে...।

বসন্ত দত্ত—আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, চন্দ্রবাবু। ধরাকে সরা জ্ঞান করে, মানুষের জীবনের উপর শুধু জোরের দাপট দেখালে তার পরিণাম কখনও ভাল হতে পারে না।

সূর্যবাবু—আমাদের ব্রিটিশ প্রভুদের কীর্তিটাও কি কম নিষ্ঠুর? দেশটাকে যেমন দুর্ভিক্ষ দিয়ে মেরেছে, তেমনই গুলী করেও মেরেছে। আমি মনেপ্রাণে প্রার্থনা করি, এরা শিগ্‌গির নিপাত যাক।

চন্দ্রবাবু—নিপাত যাবে বলেই মনে হচ্ছে।

অনুপম—আমার ধারণা, আমাদের দেশের জীবনে আরও কঠিন পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে।

সূর্যবাবু—আসুক, আসুক। না পুড়লে সোনা শুদ্ধ হয় না।

অনুপম—খুব সত্যি কথা।

চন্দ্রবাবু—কান্না আর ব্যথার ভিতর দিয়েই নবজন্ম দেখা দেয়।

অনুপম—আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, তবে আমি আজই ওই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সব ছবি-টবি সরিয়ে দিয়ে আমার সব চেয়ে প্রিয় একটা ইচ্ছা সার্থক করে নিতাম।

বসন্ত দত্ত—আজ্ঞে?

অনুপম—আমি ওটাকে একটা ফ্রী মেটার্নিটি হোম করে ফেলতাম। ফুটপাথের ওপরে শিশুর জন্ম হয়, এমন ভয়ানক ঘটনা শুধু আমাদের এই দেশেই সম্ভব হয়, আগে হতো জারের রাশিয়াতে। আমরা শুধু চোখ বুঁজে লজ্জা আর অপমান ভুলে থাকতে চেষ্টা করি।

চন্দ্রবাবু—আপনি বোধহয় জানেন না, বসন্তবাবু; নতুন হাসপাতালটার একজন ট্রাস্টি হয়েছে অনুপম। সে হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ডের চেহারা একবার দেখে আসবেন। এরকম সুব্যবস্থা কোন লণ্ডন-হাসপাতালেও আছে কিনা সন্দেহ।

বসন্ত দত্ত—নিশ্চয় নিশ্চয়; একদিন গিয়ে দেখে আসবো। ভগবান অনুপম-বাবুকে আরও বড় সেবার ট্রাস্টি হবার শক্তি দিন।

সূর্যবাবু—আমাদের অনেক দোষ আছে, বসন্তবাবু। শুধু ব্রিটিশকে নিন্দা করে আর কী হবে? তবু মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমরা একেবারে মরে যাইনি। নিজের জোরে এখনও কিছু করতে পারি; হ্যাঁ, ইচ্ছেটা আন্তরিক হবে, তবে তো?

অনুপম—কেবিনেট মিশনের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, এবার ব্রিটিশের ইচ্ছেটাও বোধহয় একটু আন্তরিক। স্বাধীনতা দিতে চায়।

চন্দ্রবাবু—সেই জন্যেই তো আমি তোমাকে সেদিন বলেছিলাম অনুপম, এসোসিয়েসনে তোমার বক্তৃতাতে কেবিনেট মিশন সম্পর্কে খুব কড়া করে কিছু বলো না।

দরজার সবুজ ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দেয় একটা মুখ। আপত্তির ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে অনুপম, উঁহু, এখন নয় পুলকবাবু,

একটু পরে আমি নিজেই আপনাকে ডাকবো।

পুলকবাবু—পাঁচটা প্রি-পেড টেলিগ্রাম এসেছে। অন্তত এগুলোর জবাব এখনই দেওয়া উচিত, স্যার।

অনুপম—আর পনের মিনিট অপেক্ষা করা কি চলে না?

পুলকবাবু—তা চলে। তা ছাড়া, অনেকগুলি চিঠি এসেছে, যেগুলো প্রাইভেট বলে মনে হচ্ছে। কয়েকটা চিঠি তো প্রায় দশ দিন হলো এসে পড়ে রয়েছে। এসব চিঠি তো আমি খুলতে পারি না, স্যার।

অনুপম—সব রেখে দিন। আমি একটু পরে নিজেই দেখবো।

পুলকবাবু—এর মধ্যেও খুব তাড়াতাড়ি জবাব দেবার মত জরুরী চিঠি থাকতে পারে।

অনুপম—আছে হয়তো। কিন্তু শুধু আর পনর মিনিট অপেক্ষা করুন।

পুলকবাবু চলে গেলেন। চন্দ্রবাবু বলেন—অনুপম বেশ ভাল একটি সেক্রেটারী পেয়েছে। খুব নম্রস্বভাব আর খুব খাটিয়ে মানুষ।

বসন্ত দত্ত—কে?

চন্দ্রবাবু—পুলক নামে এই ছেলেটি; তিনটে বছর আমেরিকার কয়েকটা বেশ ভাল কাগজের ইণ্ডিয়া-করেসপণ্ডেণ্ট ছিল এই পুলক।

অনুপম—আমি ভেবে ঠিক করে রেখেছি, যদি আমার কখনও একটা সাপ্তাহিক কাগজ বের করবার দরকার হয়, তবে পুলকবাবুকেই এডিটর করে দেব।

বসন্ত দত্ত—দেরি করবেন না অনুপমবাবু। বের করেই ফেলুন।

অনুপম—ইচ্ছে তো আছে।

সূর্যবাবু হাসেন—ইচ্ছেটাকে একটু আন্তরিক করে ফেলতে অসুবিধা কোথায়?

অনুপমও হাসে—বউদি যদি কবিতা লিখতে রাজি হন, তবে আর দেরি করবো না। এই বছরেই বের করে ফেলবো।

বসন্ত দত্ত—সত্যি, কবিতার মত জিনিস হয় না।

চন্দ্রবাবু—আমি বলি, গান।

অনুপম—কোন্ গান? তোমা বই আর জানিনে?

সূর্যবাবু—এঃ, তুমি আমার আব্রু নষ্ট করে দিচ্ছ, অনুপম।

চন্দ্রবাবু—শুনলাম, গানের কনফারেন্সটাও নাকি তোমাকে এসে ধরেছে।

অনুপম—হ্যাঁ, বলছে আপনাকেই উদ্বোধন করতে হবে।

বসন্ত দত্ত—করুন করুন। আপনারা না করলে কে আর করবে? ব্রিটিশ-রাজ তো আমাদের গানের মাথার ওপরেও লাঠি মারতে ছাড়েনি।

অনুপম—সেটা তো আপনিই আমাদের চেয়ে বেশী জানেন।

বসন্ত দত্ত—জানি বইকি। শুধু ওই এক কতকাল পরের পিছনে তাড়া করে কি কম ছুটতে হয়েছে, মশাই? সে-সব কথা মনে পড়লে লজ্জা বোধ করতে হয়। সেই জন্যেই তো ইচ্ছে করছে, আজই রিটায়ার করি।

অনুপম—না না, বাকি যে দু-তিনটে বছর আছে, ভালয় ভালয় থেকেই যান। আচ্ছা, এখন তাহলে...।

দরজার পর্দার দিকে তাকিয়ে অনুপম ডাক দেয়—বীরবাহাদুর! তুম হ্যায়?

—হুজুর। পর্দার ফাঁকে উঁকি দেয় দারোয়ান বীরবাহাদুর।

অনুপম—ঠিক হ্যায়।...আচ্ছা এখন তাহলে কাজের কথাই হোক, বসন্তবাবু।

কাজের ঘরে কাজের কথা চলতে থাকে। এ ঘরের পর পর দুটো ঘরের পরের একটা ঘরে সেক্রেটারী পুলকবাবুর দুই হাতের ব্যস্ততা পুরনো চিঠির জবাব টাইপ করে করে বাজতে থাকে। গেটের পাশের ঘরে সাক্ষাতের ভিড় রামপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলে; চাপা স্বরে বাজতে থাকে ব্যস্ত মিনতির কলরব। ভিতর দিকের বারান্দার পাশের একটি ঘরে ব্যস্ত হয়ে বাজতে থাকে কাপ-ডিশের শব্দ; চা তৈরী করছে মাদ্রাজী কুক রাজুলু। গমগম করে বাজছে আর-একটা শব্দ, জলের পাম্পের সুইচ টিপে দিয়েছে দুর্গাবালা, উপরে উঠছে জল। রান্নাঘরে খুন্তির শব্দ, মোচার ঘণ্ট রাঁধছে সুধার মা। গ্যারেজ ঘরে গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জনের শব্দ, রেস করে করে ব্যাটারির তেজ পরীক্ষা করছে অনাদি ড্রাইভার।

শুধু একজন, দিনমানে যার কোন কাজ থাকে না, তারই ঘরে কোন শব্দ নেই। আয়নার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে সে এখন একটা কানের লতি টিপে টিপে ভাবছে, আর যেন একটু আশ্চর্যও হয়ে যাচ্ছে, হীরের দুল তো এমন কিছু ভারী নয়, শুধু সেই রাত্রিতে একবার পরে নিয়েই আবার খুলে ফেলা হয়েছে, তবু এখনও কানের এ-জায়গাটা এত ব্যথা-ব্যথা করছে কেন?

যাকগে; কিন্তু এই ব্যথার চেয়েও বেশি জ্বালা নিয়ে নতুন করে আর-কোন ব্যথা যেন দেখা না দেয়। স্বামীর ইচ্ছার ডাকের কাছে স্ত্রী তার প্রাণের সব সাড়া বন্ধ করে গুটিয়ে রাখবে, আর, একটা ডেড-বডি হয়ে পড়ে থাকবে, এটা ভুল বইকি। খুব ভুল। কিন্তু স্বামীর ইচ্ছা কি ওরকম করে একটা সম্রাটের হুকুমের মত কথা বলে?

শেফালীদির সঙ্গে তুলনা করে আমার দোষ ধরলেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করবার অধিকার নেই, সেই অধিকার কবেই মরে গিয়েছে, মেরে ফেলা হয়েছে, তা না হলে জিজ্ঞেস করতে পারা যেত, শেফালীদির সঙ্গে আমার তুলনা করলে কেন? শেফালীদি কি জানতো না যে, সমরবাবুর সেই একলাখ টাকার ভাগ্যটা কেমন করে আর কোথা থেকে হঠাৎ দেখা দিয়েছিল? তুমি তো

সে-রাতেও বলতে পারলে না, কে কেন আর কিসের জন্য তোমাকে এত সোনা দিল? সমরবাবুর লাখ টাকা দেখে শেফালীদির গর্ব হবেই তো; সে গর্ব স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে গান তো গাইবেই। কিন্তু তুমি কি আমাকে ওই গর্ব এনে দিতে পেরেছ?

বেশ মজার হুকুম। জল নেই, সাঁতার দিতে হবে। ফুল নেই, মালা গাঁথতে হবে। নেশা নেই তবু মাতাল হতে হবে; গুপ্তিপাড়ার ভোলা স্যাকরার মত। রোজ রাত্রিবেলা মদ খেয়ে মাতাল হতো আর চিৎকার করতো ভোলা স্যাকরা। কিন্তু সর্বস্ব নষ্ট করে যখন ভিখিরীর মত দশা হয়ে গেল ভোলা স্যাকরার, পয়সার অভাবে মদ কিনতে পারতো না, তখনও ঠিক রাত্তির হলেই ঘরের দাওয়ার ওপর টলে টলে হাঁটতো, বেলেল্লা স্বরে চিৎকার করতো আর লাঠির বাড়ি মেরে মেরে ঘরের চালাটাকে ভেঙে তছনছ করে দিত।

হেসে ফেলে প্রতিভা। সে হাসিতে শব্দ নেই। আয়নাতে এই হাসির চেহারা দেখলে আরও হাসি পায়। প্রতি বছর দোলের আগে পুকুর ঘাটের কাছে ঢোলক বাজাতো ছিদেম পটুয়া, আর পটের ছবি দেখিয়ে গান গাইতো। বোকা আহ্লাদী লোভ করে চিনির ভাঁড় চেটেছে, তাই ঠোঁটে পিঁপড়ে কামড়েছে। তবু সেই পিঁপড়েকামড়ের জ্বালা নিয়ে পটের আহ্লাদীর ঠোঁট দুটো কী অদ্ভুত হাসছে।

হাসি পাবেই বা না কেন? প্রতিভার হাত-পাগুলোকে সত্যিই যে বিনা নেশায় মাতলামি করতে হয়। হাসতে হয়। হাত ধরে কথা বলতে হয়। অনুপমের জীবনের এক-একটা রাত যেন জীবন্ত সুখে সুখী হয়। প্রতিভাকে যেন একটা ইচ্ছাহীন ডেড-বডি বলে সন্দেহ করে আবার দুঃখ না পায় প্রতিভার স্বামী, অনুপম রায়।

এভাবেও চলতে পারা যাবে। চালিয়ে নিতে পারা যাবে। ভদ্রলোক যদি এতেই সুখী হতে চায়, তবে এতেই সুখী হোক। মাঝে মাঝে মাঝরাতে প্রতিভার এই ঘরের দরজাতে ভদ্রলোকের ইচ্ছার টোকা টক-টক করে বাজবে, দরজা খুলে দিয়েই প্রতিভাকে একটা অপেক্ষা-বিহ্বল মুখ তুলে হাসতে হবে, আর হাত বাড়িয়ে হাত ধরে বলতে হবে, এস। চলবে না কেন? চলেই যাবে। তবু তো, যা-ই হোক না কেন, এটা তো এই ভদ্রলোকেরও একটা অদ্ভুত তোমা বই আর জানিনে দশার টোকা। যদি সূর্যবাবুর ছায়ার সঙ্গে আবার কোনদিন দেখা হয়ে যায়, তবে হয়তো লজ্জা-টজ্জা না করে বলে দিতেও পারা যাবে, আপনার কর্তাটির মত এ বাড়ির ভদ্রলোকেরও......না, না, তুলনা করলে খুব ভুল করা হবে। গানের পাখি রোজ একই গাছের ডালে এসে বসে; ভাবতে ভাল লাগে। কিন্তু তেষ্টার বাঘ রোজ একই ঝরনার জল খায়, ভাবতে কেমন লাগে? ঝরনার জল কি মনে করতে পারে যে, তার জীবনটা ধন্য হয়ে গেল?

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সুধার মা, তার পিছনে এক মহিলা। সরু পাড় ধুতি পরেছেন মহিলা, আর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছেন। সুধার মা বলে—বর্ধমান থেকে এসেছেন।

মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েই ফুঁপিয়ে উঠলেন মহিলা—বর্ধমান থেকে তিনদিন হলো কলকাতায় এসেছি। এখন ভবানীপুর থেকে আসছি।

চমকে ওঠে প্রতিভা—আপনি? বাণীদি?

সতরঞ্চি দিয়ে জড়ানো একটা বিছানা, আর দুটো বাক্স নিয়ে এসে রামপ্রসাদও এই ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়—কোথায় রাখবো, বলে দিন মা।

প্রতিভা—এখানেই রাখ।

চলে গেল সুধার মা, চলে গেল রামপ্রসাদ। বাণী হঠাৎ ব্যাকুলভাবে এগিয়ে এসে প্রতিভার হাত ধরে—আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে, বউদি।

প্রতিভা—কবে?

বাণী—এক বছর হলো। যুদ্ধে গিয়েছিল, যুদ্ধেই শেষ হয়ে গেল। এক চিঠিতে লিখলে, ছুটি পেয়েছি, এবার বাড়ি ফিরবো। তার একমাস পরেই সরকারী চিঠি এল, সে আর ফিরবে না, চিরকালের ছুটি নিয়ে সরে পড়েছে।

প্রতিভা—ঘরের ভিতরে এসে বসুন, বাণীদি।

ঘরে ঢুকে শ্রান্তভাবে মেজের উপরেই বসে পড়ে বাণী।—বর্ধমানে মেয়ে-স্কুলে পড়াবার যে চাকরিটা করতাম, সেটাও গিয়েছে। একটি খাঁটি অভাগী হয়ে পথেই বসে পড়েছি, বউদি। কী করবো, কোথায় যাব, বুঝতে পারছি না।

প্রতিভা—চাকরিটা গেল কেন?

বাণী—কপাল। স্কুলে আমার দুটো কাজ ছিল। পড়ানো আর গান শেখানো। আগের মত পড়িয়ে যাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু আগের মত গান আর গলায় এল না। কত চেষ্টা করলাম, তবুও না। সেক্রেটারীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, দয়া করে আমাকে গান থেকে রেহাই দেওয়া হোক। কিন্তু রাজি হলেন না সেক্রেটারী। বললেন, গানের জন্যেই তো আপনাকে রাখা; আপনি যা পড়ান সেটা এমন কিছু বিদ্যের কাজ নয় যে, আপনাকে পঞ্চান্ন টাকা মাইনে দেওয়া চলতে পারে। অগত্যা...।

প্রতিভা—ভবানীপুরে আপনার কে আছেন?

—আমার দেওর। কিন্তু দেওরের বাড়িতে জায়গা হলো না।

—কেন?

—জা কোন কথাই বললে না। দেওর তবু বললে, এখানে জায়গার অভাব, আপনার খুব অসুবিধে হবে।......কাজেই তুমি এখন যদি অনুদা'কে একটু বলে কয়ে...।

—আপনি এ কী কথা বলছেন বাণীদি। আপনি আপনার দাদাকে যা

বলবার বলবেন, এর মধ্যে আমি তো কেউ নই।

—ও কথা বললে কি চলে, বউদি? তুমি খুশি হয়ে রাজি না হলে আমার কি এখানে থাকা চলবে? শুধু আমার একটা চাকরি যোগাড় করতে যতদিন লাগবে, ততদিন। তারপর চলে যেতে আমি আর একটি দিনও দেরি করবো না।

—আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন, বাণীদি। আমি খুশি হয়েই আছি, আমি রাজি হয়েই আছি।

—সেদিন আমিই তো তোমার কপালে বরণডালা ছুঁইয়ে ছিলাম, যেদিন তুমি প্রথম এ বাড়িতে এলে।

—সব মনে আছে। আপনাকেও কতবার মনে পড়েছে।...আচ্ছা দেখুন তাহলে, আপনাকে একটা জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছি।

হাসতে থাকে প্রতিভা। তারপরেই আলমারি খুলে একটা বই বের করে নিয়ে বাণীর হাতের কাছে তুলে ধরে—এই নিন।

চমকে ওঠে, হাসতে থাকে, তারপর কেঁদে ফেলে বাণী—আমার এই বই তুমি এত যত্ন করে তুলে রেখেছ? আমি যে এই বইটাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি। ভেবে ভেবে ঘুম হয়নি, কোথায় হারিয়ে ফেললাম বইটাকে? বুকের ভিতরে একটা অলক্ষুণে ভয় ছমছম করতো। যুদ্ধের কাজে রওনা হয়ে যাবার দিন বিদায় নেবার সময়, সে যে এই বইটা আমাকে উপহার দিয়ে বলে গেল, যখনই আমার কথা ভেবে মন খারাপ হবে, তখনই এই বইটা পড়বে।

বইটাকে তুলে নিয়ে কোলের উপর রেখে দিয়ে আবার কাঁদতে থাকে বাণী। তারপরেই হাঁপ ছেড়ে আর চোখ মুছে কথা বলে—অনুদা'র সঙ্গে কখন দেখা হতে পারে?

প্রতিভা—দেখা হবেই। সেজন্যে আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

বাণী—অনুদা'কে চিঠি দিয়েছিলাম। উত্তর পাইনি। কিন্তু অনুদা কি ভুলতে পারে যে, আমিই অনুদার একমাত্র বোন। অনুদার একমাত্র মামার একমাত্র মেয়ে আমি। এ বাড়ির শুভ কাজের দরকারে আপনজন খুঁজতে গিয়ে আমারই কথা মনে পড়েছিল অনুদা'র।

প্রতিভা—সেইজন্যেই তো বলছি, আপনি মিথ্যে এত চিন্তে করছেন।

বারান্দা ধরে জুতো-পরা পায়ের শব্দ বাজতে বাজতে এই ঘরেরই দিকে এগিয়ে আসে। এসেই পড়ে। অনুপম বলে—সত্যিই যে, বাণীই এসেছে, দেখছি।

চার-পাঁচটে খোলা চিঠি ক্লিপ-আঁটা হয়ে এক সঙ্গে অনুপমের এক হাতে ঝুলছে। অনুপম বলে—তোমার চিঠি ঠিক সময়েই এসেছে, বাণী। কিন্তু খুলতে প্রায় সাত-আটটা দিন দেরি হয়ে গেল। আজ এই কিছুক্ষণ আগে

চিঠি খুলেছি। কিন্তু জবাব দেবার দরকার হলো না। রামপ্রসাদ খবর দিল, বর্ধমানের দিদি এসেছেন।

অনুপমের পায়ে হাত ছুঁইয়ে প্রণাম করে নিয়েই আবার দু'হাতে মুখ ঢাকে আর ফোঁপাতে থাকে বাণী।

অনুপম—আর কেঁদে কোন লাভ নেই। যা হবার তা হয়েই গিয়েছে। তুমি এখানে থাকবে, তাতে আমার আবার কিসের অসুবিধে? কিছুই না।

প্রতিভার দিকে তাকিয়ে কথা বলে অনুপম—তুমিই দেখে-শুনে বাণীর জন্য একটা ঘর ঠিক করে দাও।

হাতের চিঠির গুচ্ছ নেড়ে-চেড়ে মনে মনে পড়তে থাকে অনুপম। তারপর বলেও ফেলে—সবাই দেখছি কষ্টে পড়েছে, থাকবার ঠাঁই চায়।

চলে যেতে যেতেই একবার থমকে দাঁড়ায়, আর, হাতের একটা চিঠির লেখার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই আবার ফিরে আসে অনুপম।

—বাণী; কে এই মহিলা, যে তোমার নাম করে লিখেছেন যে, তুমি তার অবস্থার সব কথা জান?

বাণী—কে? তবে কি মুক্তি লিখেছে এই চিঠি?

অনুপম—হ্যাঁ, মুক্তি সোম।

বাণী—রামপুরহাট থেকে?

অনুপম—হ্যাঁ।

বাণী—মুক্তির দুর্ভাগ্যের সব কথা শুনলে তোমার চোখে জল এসে যাবে, অনুদা। ওরই স্বামীর নাম জয়ন্ত সোম, যার কথা তুমিও নিশ্চয়......।

অনুপম—আমি কিছুই জানি না।

বাণী—আগষ্ট হাঙ্গামার সময় গ্রেপ্তার হয়ে সেই যে জেলে গেলেন জয়ন্ত সোম, আর ফিরলেন না। মুক্তির আর আমার প্রায় একই রকমের দুর্ভাগ্য, অনুদা। জেলে থাকতেই মারা গেলেন জয়ন্তবাবু।

অনুপম—মহিলার আপনজন বলতে কি কেউই নেই?

বাণী—আছেন বইকি। এক রায়বাহাদুর ভাসুর আছেন, তিনি মুক্তিকে ঘরে ঠাঁই দিতে পারেননি। কাজেই বর্ধমানে এক পিসির বাড়িতে তিনটে বছর ছিল। তখন আমার কাছে প্রায় রোজই আসতো মুক্তি। খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে। পিসির বাড়িতে দাসীর মত খাটতে হতো, তবু কোনদিনও আমার কাছে পিসির নামে একটাও নিন্দের কথা বলেনি। পিসি মারা গেলেন, আর পিসেও বললেন, তুমি অন্য কোথাও তোমার ঠাঁই খুঁজে নাও। অগত্যা রামপুরহাটে চলে গেল মুক্তি। সেখানে এক বুড়ো পিসে আর বুড়ি পিসি। অভাবে অনটনে তাদেরই দিন চলে না।

অনুপম—মুক্তি সোম লিখছে, পিসে আর পিসি দুজনেই শিগ্‌গির কাশী

চলে যাবেন আর সেখানেই থাকবেন।

বাণী—তাই নাকি? তাহলে তুমি দয়া করে মুক্তির অবস্থার কথাটা একটু ভেবে দেখ, অনুদা।

অনুপম—মুক্তি সোমও তাই লিখেছে। খবরের কাগজে আমার কথা পড়ে মুক্তি সোমের ধারণা হয়েছে, আমি ভগবানের চেয়েও বেশি দয়ালু। হেসে ফেলে অনুপম।

বাণী হাসতে চেষ্টা করে—দুঃখী মানুষের মুখের কথা ওরকমই হয়ে থাকে।

অনুপম—মহিলা লিখছেন, একটা আশ্রয় পেতে চান। একবেলা খাবেন আর ঘরের সব কাজ করে দেবেন। কিন্তু......।

আবার হেসে ফেলে অনুপম—এটা তো কোন কাজের কথা নয়।...আচ্ছা, আমি যদি মহিলার জন্যে কোন কাজ-টাজ যোগাড় করে দিই, তবে......।

বাণী—তবে খুব ভাল হয়, অনুদা। কিন্তু তার আগে তো মুক্তির একটা ঠাঁই পাওয়া দরকার।

অনুপম—কিছুদিন এখানে রইলো; তারপর কাজ পেয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল; এরকম একটা ব্যবস্থা হলে চলবে তো?

বাণী—খুব চলবে। এর চেয়ে আর বেশি কী উপকার আশা করতে পারে মুক্তি?

অনুপম—মহিলাও সেই কথা লিখেছে। তা হলে তুমিই এর চিঠির একটা জবাব পাঠিয়ে দাও, বাণী।

মুক্তি সোমের চিঠিটাকে বাণীর হাতে তুলে দিয়েই চলে যায় অনুপম।

কত তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাচ্ছে দিনগুলি। দিবস দিবস করি মাসা। তারপর, মাস মাস করি বরষ গোঙায়নু। বাগবাজারের এই বাড়ির তেতলার ঘরের জানলা দিয়ে যখন গঙ্গার হাওয়া হু-হু করে ছুটে এসে ভিতরে ঢুকতে চায়, তখন জানলার কাছে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও, আর খোঁপাটাকে শক্ত করে বাঁধলেও, প্রতিভা রায়ের ওই শক্ত খোঁপারই উপরে ভেসে থাকা একটা সাদা চুল ফুর ফুর করে উড়তে থাকে।

হ্যাঁ, চলেই যাচ্ছে। চালিয়েও যাচ্ছে প্রতিভা। মাঝরাতে দরজার কপাটের গায়ে টোকার শব্দ বাজে। প্রতিভাও দরজা খুলে দিতে একটুও দেরি করে না। আর ভুল হয় না। মাঝরাত পার না হবার আগে কখনও ঘুমিয়ে পড়ে না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে যখন বুঝতে পারে, এইবার রাত শেষ হতে চলেছে, তখন ঘুমিয়ে পড়ে। অভ্যাসে কী না হয়! চোখ দুটো বন্ধ করলেই ঘুম এসে যায়। ঘুমটা যেন প্রতিভার বিছানার বালিশের কাছে একটা অদেখা করুণার শরীর হয়ে আর প্রতিভার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে। প্রতিভা একটা হাঁফ ছেড়ে নিয়ে চোখ দুটোকে বন্ধ করে দিতেই সেই মুহূর্তে এসে লুটিয়ে পড়ে ওই ঘুম; সে ঘুমের মধ্যে যদি কোন স্বপ্ন থাকেও, তবু ঘুম ভাঙতে সে স্বপ্নের কোন কথা আর মনে পড়ে না প্রতিভার।

মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত কথা মনের ভিতরে হেসে ওঠে। যেন চোরকাঁটার জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা ছোট্ট ঘাস-ফুল উঁকি দিয়ে প্রতিভার মুখটাকে দেখছে আর একটা সান্ত্বনার কথা বলছে। হেসে ফেলে প্রতিভা। হ্যাঁ, এটা একটা চমৎকার সান্ত্বনা বটে। দুর্গাবালার বোন মণিবালার স্বামী বাড়ি ফিরে এসেই মণিবালার গলা টিপে ধরে কিলোতে থাকে। মণিবালা বলেছে, তবু রক্ষে, দিদি, শুধু আমাকেই কিলোয়। আর কোন মেয়েমানুষকে তো কিলোয় না।

প্রতিভার জীবনের নিয়ম-করা সেই অদ্ভুত খাটুনিও অনেক কমে গিয়েছে। মাসের মধ্যে বড়জোর একবার কি দু'বার মাঝরাতের ঘরের দরজায় টোকা পড়ে। বিনা নেশায় হাত-পা ছুঁড়ে, একটা জীবন্ত মাতলামি হবার ব্রতটা এখনও আছে, কিন্তু বারে কম গিয়েছে। তবে কি অনুপমের নিঃশ্বাসের বাতাসটাও একঘেয়ে সুখের ক্লান্তিতে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? না, বয়সের ছোঁয়া লেগে মাথার দু' পাশের কালোর উপর বেশ কিছুটা সাদা-সাদা ছিটে পড়েছে, সেই জন্যে?

এক একদিন বুঝতে পেরে একটু আশ্চর্যও হয়েছে প্রতিভা। বাইরের বারান্দাতে পায়ের শব্দটা আস্তে আস্তে হেঁটে এল, ঠিক এই ঘরের বন্ধ দরজার কাছে এসে থামলো। তার পর, কে জানে কী ভেবে আবার চলে গেল শব্দটা।

মনে হয়েছে প্রতিভার, অনুপমের শরীরটা আজ বোধহয় ভাল নয়। কেন? সেটা আর খোঁজ নিয়ে জানবার দরকার হয় না। রোজের খবর-কাগজটাকে একটু ভাল করে পড়লেই জানা যায়, বাইরে বাইরে কী তুলতামাল কাণ্ডই না করে বেড়াচ্ছেন ভদ্রলোক। একদিন চার জায়গায় বক্তৃতা করেছেন। পার্কের মিটিং-এ হাজার-হাজার মানুষের ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন অনুপম রায়, খবরকাগজে এই ছবিও দেখতে পাওয়া যায়। দিনের পর দিন এত হাততালির শব্দ শুনলে শরীরটা একটু অসুস্থ না হয়েই বা পারবে কেন? নরেনকাকা তো একটা ফেরিওয়ালার গলার একটা হাঁক শুনলেই চমকে ওঠেন আর কানে হাত দেন।

খোঁজ নিতে, একটু জিজ্ঞেস করে জানতে ইচ্ছে করে, শরীর ভাল নয় কেন? ভাল বোধ না করলে ডাক্তারকে দেখাও না কেন? সত্যিই দেখিয়েছ কি? আমার তো কিছু জিজ্ঞেস করা নিষেধ আছে। তবু জিজ্ঞেস করছি। এখনো তো একেবারে পাগল হয়ে যাইনি।

এই বাড়ির দোতলাটা এখন সত্যিই একটা করুণা-তলা। দোতলার অনেক ঘরের মধ্যে দুটি ঘরের একটিতে থাকে বাণী, আর-একটিতে মুক্তি। অনুপম রায়ের করুণার আশ্রয় পেয়ে দুঃখ আর দুর্ভাগ্যের দুই অসহায় নারীর জীবনের উদ্বেগ মুছে গিয়েছে।

এই বাড়ির বিকেল বেলার জীবনটা সত্যিই গল্প হাসি আর খুশি গুঞ্জনের জীবন। বাণী আর মুক্তি দুজনেই তেতলায় প্রতিভার ঘরে এসে বসে। তারপর গল্প। কাঁচপোকার টিপ থেকে শুরু করে সাতভরি সীতেহারের গল্প। চুরি করে টকো কুল খাওয়া থেকে শুরু করে বেলুড়ের মন্দিরের গল্প। বাণী অবশ্য এক-একবার গম্ভীর হয়ে যায় আর ফুঁপিয়ে ওঠে, যখন একটা শেষ উপহারের বইয়ের গল্প বলতে শুরু করে। আর মুক্তির চোখের পাতাও জলে ভারি হয়ে যায়; যখন জেল থেকে পাওয়া একটা শেষ চিঠির কথা তুলে কিছু বলতে চেষ্টা করে।

মুক্তি বলে—সব ভাল, তবু বলবো, বউদি, এত কুঁড়ে হয়ে পড়ে থাকতে ভাল লাগছে না। আমাকে যাহোক কোন একটা কাজের ভার দাও।

প্রতিভা হাসে—ওরে বাবা, আমি ওর মধ্যে নেই। কাজ-টাজের ভার দেবার মানুষ আমি নই।

মুক্তি—অনুদা'র সঙ্গে তো এক মিনিট কথা বলবারও উপায় নেই। বলতেও পারছি না যে, আমার যে এবার একটা কাজ না হলেই নয়, অনেকদিন তো হয়ে গেল।

বাণী বলে—আমি অবিশ্যি অনুদাকে অনেকবার বলেছি।

প্রতিভা—কী বললে তোমার অনুদা?

বাণী হাসে—কানেই তোলে না আমার কথা। শুধু বলে, হ্যাঁ মনে আছে।

প্রতিভা—তবে আর তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? যেমন আছ তেমনই থেকে যাও।

প্রতিভার মাথা থেকে পট্ করে একটা সাদা চুল উপড়ে দিয়ে হেসে ওঠে বাণী—এ কী, বউদি? তুমি না আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট?

প্রতিভা—হতে পারে।

বাণী—তা'হলে? কী এটা? সত্যি তোমার ওপর মাঝে মাঝে আমার বেশ রাগ হয়।

প্রতিভা—কেন?

বাণী—একবার হাসপাতালে যাও আর নতুন জিনিস কোলে নিয়ে ফিরে এস। তবে বলবো, রাগ আর নেই।

মুক্তিও উৎফুল্ল হয়ে হাসে—তাহলে আমাদেরও একটা মনের মত কাজ পাওয়া হবে।

বাণী—হ্যাঁ, তুমি শুধু তোমার বিছানাতেই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে; তোমাকে কিছুছু ভাবতে হবে না, বউদি।

মুক্তি—কাঁথা ধোওয়া থেকে শুরু করে দোলনা দোলানো পর্যন্ত সব কাজ আমরাই করে দেব।

বাণী—তাই বলছি; তোমার আর দেরি করা ভাল দেখায় না।

প্রতিভা হাসে—বাণীদি?

বাণী—কী?

প্রতিভা—তোমার চোখের চশমাতে একটা মশা।

বাণী—অ্যাঁ? তাই নাকি।

চশমাটাকে নামিয়ে নিয়ে মুছতে থাকে বাণী।

মুক্তি—তুমি নিশ্চয় একটা ধাপ্পা দিলে, বউদি।

প্রতিভা—তুমি বরং তোমার ওই গল্পটা, রামপুরহাটের ভৈরব বাবার গল্পটা আর-একবার বল। কী যেন একটা কথা বলে চিৎকার করতো ভৈরব বাবা?

মুক্তি—না লাগে দয়ামায়া, না লাগে মন বাবা, বোম বোম বোম!

প্রতিভা হাসে—কিন্তু একথা শুনে ভয় পেতে কেন?

মুক্তি—পাব না? শুনলে তুমিও ভয় পেতে।

প্রতিভা—আমি একটুও ভয় পেতাম না। ভয়-টয় আমার নেই।

রামপ্রসাদ এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দেয়—মা।

প্রতিভা—কী?

রামপ্রসাদ—সেই মাস্টারবাবু এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—কে? অজয়বাবু। বলতে বলতে আর শাড়ির আঁচলটাকে টানতে টানতে চলে যায় প্রতিভা।

প্রতিভার ঘরের ভিতরে বিকাল বেলার গল্পের আসরে বসে শুধু মুক্তি আর বাণী গল্প করে। আর নীচের তলার ড্রইংরুমের পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকেই হেসে ওঠে প্রতিভা—কী খবর? নিশ্চয় দেনা শোধ করতে এসেছেন।

অজয়—হ্যাঁ। এই নিন; সব নয় কিন্তু, দশ টাকা।

প্রতিভা হাসে—তার মানে ত্রিশ টাকা শোধ হলো।

অজয়—হ্যাঁ, বাকি রইল দশ টাকা।

—কিন্তু এত দেরি করলেন কেন?

—বুঝতেই তো পারছেন, দেরি হবার কারণ কী হতে পারে।

—বুঝতে পারি। আপনি কিন্তু বেশ অদ্ভুত মানুষ।

—পাড়ার লোকে অবিশ্যি একথা বলে, কিন্তু আপনিও একথা বলছেন?

—না না, আপনি ভুল বুঝবেন না। অদ্ভুত মানে...মানে যা-ই হোক, আমি আপনাকে নিন্দে করে কথাটা বলিনি।

—এই জন্যেই আপনাকে ভাল লাগে।

—কি বললেন?

—এই জন্যেই আপনার কাছে কোন কথা বলতে ভয় করে না।

—কী জন্যে?

—আপনি শক্ত কথা বলতেই পারেন না। তা না হলে আমি ভুল করে সেদিন যে-কাণ্ডটা করেছিলাম, সেটা সহ্য করা অন্য কারও পক্ষে...যাক সে-কথা। পুরনো কথা।

—বুঝলাম না, আপনি কবে কী কাণ্ড করেছিলেন।

—ওই যে একেবারে উপরতলায় গিয়ে আপনার ঘরের দরজায় টোকা দিলাম। অন্য কেউ হলে আমাকে দারোয়ান দিয়ে বের করে দিত। আর, আপনি আমাকে দিলেন টাকা। সরযূও আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, এই মহিলার মনের ভিতরে স্ফটিক লুকানো আছে; চোখ দুটো দেখতে কেমন বল তো? আমি বললাম, শুকতারার মত।

—আপনাকে চা-খাবার দিয়েছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছে। আপনাদের বাড়ির ওই বুড়ো মানুষটি, নাম অবিশ্যি জানি না...।

—রামপ্রসাদ।

—যা-ই হোক, ইনিও একজন চমৎকার প্রাণের মানুষ বলে মনে হয়। আমাকে দেখা মাত্র বলে ফেললেন, আগে একটু চা-খাবার খেয়ে নিন বাবা।

—সরযূদি এখন কেমন আছেন?

—সেই কথাটি আপনাকে বলবার জন্যেই তো বসে আছি, তা না হলে এতক্ষণে চলে যেতাম।

—কেন?

—আজ আবার আমাকে নটে চাঁপা খুঁজতে বের হতে হবে।

—তাই বলুন। আজ আপনাদের বিয়ের বাৎসরিক দিন। কিন্তু...।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক সন্দেহ করেছেন। বলুন তো, কী সন্দেহ হয়েছে আপনার?

—আমার তো মনে পড়ছে, সেবার আপনি শ্রাবণ মাসের একটা দিনে নটে চাঁপা খুঁজতে বের হয়েছিলেন।

—ঠিক। আজ হলো আর-একটা অদ্ভুত ঘটনার বাৎসরিক দিন। তার মানে,

সরযূ আর নেই। পুরো এক বছর হলো নেই।

চমকে ওঠে প্রতিভার বুকের ভিতরের সব নিঃশ্বাস। চোখের পাতা ভারি হতে থাকে।

অজয়—কিছুই বুঝলাম না, সরযূ কেন এত তাড়াতাড়ি চলে গেল। চলে যাবার একদিন আগে, যখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে, সেই রোগা জিরজিরে হাতটাকেই কোন মতে স্লেটের উপর তুলে নিয়ে লিখে দিল—আমি বোধহয় যাচ্ছি, কিন্তু তুমিও শিগগির চলে এস, দেরি করো না।

কপালটাকে দুই আঙুল দিয়ে আস্তে একটু টিপে নিয়েই হাসতে থাকে অজয়।—সরযূ কী বলতো, শুনবেন? শুনলে আপনি একটু আশ্চর্য না হয়ে পারবেন না। বলতো, আমার আগেই চলে যেও তুমি।

প্রতিভার চোখে যেন ভয়ানক এক বিস্ময়ের ছায়া চমকে ওঠে।—এরকম অদ্ভুত কথা কেন বলতেন, সরযূদি?

অজয়—আমাকে কেউ মানুষ বলে মনে করতে পারবে না, শুধু ঘেন্না করবে আর অপমান করবে, ভালবেসে আর সম্মান করে এক গেলাস জলও আমাকে কেউ খাওয়াবে না, বেঁচে থাকলে আমি শুধু কষ্টই পাব, এই দুশ্চিন্তার জন্যেই সরযূ বলতো, তুমিই আগে যাও। এ জঙ্গলে তোমাকে একা রেখে দিয়ে আমি আগে চলে যেতে চাই না।

প্রতিভা—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

অজয়—বলুন।

প্রতিভা—সরযূদি কে?

অজয়—আমার স্ত্রী।

হেসে ফেলে প্রতিভা—আমি জানতে চাই, সরযূদির মা বাবা ভাই বোন আছেন নিশ্চয়। তাঁরা কোথায়?

অজয়—মা বাবা নেই। দুই দাদা আছেন।

প্রতিভা—তাঁরা কোথায়?

অজয়—একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?

প্রতিভা—সরযূদির এরকম একটা সাংঘাতিক অসুখে তাঁরা তো সাহায্য করতে পারতেন।

হেসে ফেলে অজয়—না, পারতেন না। তাঁরা সরযূকেও একটা অপদার্থ প্রাণী বলে মনে করেন।

প্রতিভা—কী অদ্ভুত দাদা।

—তাঁদের দোষ দেবার কিছু নেই। সরযূকে চিনতে ও বুঝতে পারা তাঁদের মত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

—তাঁরা কোথায় থাকেন?

—একজন এই কলকাতাতে, আর একজন কাশ্মীরে, শ্রীনগরে।

—শ্রীনগরে? কী নাম, শুনি?

—তাঁর নাম আশুতোষ দত্ত। কলকাতায় যিনি থাকেন, তাঁর নাম বসন্তকুমার দত্ত।

প্রতিভার গলার স্বর যেন একটা নিবিড় বিস্ময়ের ভারে থমথম করে।—তাঁরা তো খুব বড়লোক মানুষ।

অজয়—আপনি তাঁদের চেনেন নাকি?

প্রতিভা—হ্যাঁ। আশু দত্ত আমারই আপন মেসোমশাই।

অজয়—বলেন কি? তাহলে...আপনার নামটা বললে সরযূ আপনাকে নিশ্চয় চিনতে পারতো। সত্যি, বড় ভুল হয়ে গেল; আপনার নামটা সরযূকে আর বলা হলো না।

প্রতিভা হাসে—আমার নামটা তাহলে আপনার জানা আছে?

—আজ্ঞে?

—আমার নামটা কী?

অজয় হাসে—জানি না।

প্রতিভা—আমার নাম প্রতিভা।

অজয়—ভাল নাম। নামটা আভা হলে আরও ভাল হতো।

—কেন?

—ওই যে বললাম, আপনার চোখ দুটো যেন দুটো শুকতারা। সব সময় একটা আভা ফুটে রয়েছে। না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিলা আঁখি দুটি, তাহে দিলা নিমিষআচ্ছাদন।

—এ কবিতার মানে কী?

—এ হলো ভালবাসার দুই চক্ষুর আক্ষেপ। মাত্র দুটি চোখ, তার ওপর আবার ক্ষণে ক্ষণে পলক পড়ে; তা না হলে তোমাকে আরও কত স্পষ্ট করে আর ভাল করে দেখে নিতে পারতাম।

প্রতিভা হাসে।—আমার কিন্তু কোন আক্ষেপ নেই, মাত্র দুটো চোখ পেয়েছি বলে।

অজয়—কেন? একথা বলছেন কেন?

—আমার আর দেখবার কিছু নেই।

—আপনি কখনও কাশ্মীরে গিয়েছেন?

—না।

—গেলে একথা আর বলতেন না; সরযূ প্রথমে ঠিক আপনার এই কথার মত একটা কথা বলতো; কাশ্মীরের ওইসব ফুলের মধ্যে কী আর দেখবার আছে? কিছুছু নেই। কিন্তু একদিন বলতে হয়েছিল, আছে, সব দেখা দুচোখে

কুলিয়ে উঠতে পারছি না।

—সেদিনটা আপনাদের বিয়ের পরের দিনটা, নিশ্চয়?

—না। আমার সঙ্গে দেখা হবার পর আমাকে যেদিন নিশাতবাগে বেড়াতে নিয়ে গেল সরযূ।

—লজ্জা না করে আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করছি।

—বলুন।

—কথাটা কী বলেছিলেন, সরযূদি?

—ওই তো; সরযূ বললে, আজ নিশাতবাগের সেই অনেক-দেখা ফুলগুলিকেই দেখতে এত বেশি ভাল লাগছে কেন? নতুন চোখ পেয়ে গেলাম নাকি?

হঠাৎ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় প্রতিভা—আচ্ছা, আপনি এখন তাহলে...।

অজয়ও উঠে দাঁড়ায়—হ্যাঁ, চলি এখন।

প্রতিভা—আজ আবার নটে চাঁপা নিয়ে কী করবেন?

অজয়—বিশেষ কিছু না। শুধু বালিশের এক পাশে রেখে দেব ওই নটে চাঁপা, যদি পাই, তা না হলে চাঁপা।

প্রতিভা—তাতে কী হবে?

অজয় হাসে—শুধু নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার একটা খেলা। হঠাৎ হয়তো একবার মনে হবে, যায়নি সরযূ, আমার কাছেই বসে রয়েছে। সবই ফাঁকি, কিন্তু খুব সুন্দর ফাঁকি নয় কি?......আপনি কি মনে মনে হাসছেন?

প্রতিভা—না। বেশ রাগ হচ্ছে।

—কেন? আমি তো...।

—আপনি বেঁচে থাকবেন কি নিয়ে?

—কি বললেন?

—আপনি এরকম কেন? বলতে গিয়ে প্রতিভার এত শান্ত গলার স্বরও যেন একটা ধমক দিয়ে ফেলে।

—বুঝলাম না, আপনি কী বলছেন?

—এত লোকের টাকা-পয়সা হয়, আপনার হয় না কেন?

—হবার নয় বলেই হয় না। আমি কাজ করতে পারি না, জানি না, ইচ্ছেও হয় না। আমার এই পৃথিবীতে থাকতেই ভয় করে, ভাল লাগে না। চন্দ্রবাবু একদিন কী কাণ্ড করেছিলেন, শুনবেন?

—বলুন।

—একদিন হঠাৎ আমার কাছে একটা লোক পাঠিয়ে দিলেন। লোকটা বলে কিনা, ভাল ডাক্তার হাতে আছে, সরযূর লাইফ এক লক্ষ টাকায় ইনসিওর করে দিতে কোন অসুবিধে হবে না। আমি বললাম, আমার টাকা কোথায় যে লাখ-

টাকার পলিসির প্রিমিয়াম দেবার সাধ্যি হবে? লোকটা বললে চন্দ্রবাবু দেবেন। আমি বললাম, চন্দ্রবাবু দেবেন কেন? লোকটা যা বললে, সে-কথা মনে পড়লে আমার এখনও ইচ্ছে করে, পালিয়ে গিয়ে গভীর জঙ্গলের একটা বাঘের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ি আর বলি, হে বাঘ, তুমিই দয়ালু, তুমি আমাকে শান্তি দাও।

প্রতিভা—কথাটা বলুন।

অজয়—ক্যান্সারের রোগিণী, দু-এক বছরের মধ্যেই তো শেষ হয়ে যাবে। অতএব এক লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। ওই এক লক্ষে সত্তর হাজার নেবেন চন্দ্রবাবু, ত্রিশ হাজার নেব আমি; এই হলো সর্ত।

—আপনি লোকটাকে কী বললেন?

হেসে ফেলে অজয়।—বললাম, চন্দ্রবাবুকে বলবেন, চন্দ্রকলঙ্কের চেহারা দেখে খুব ভয় পেয়েছে অজয় সরকার। ফর এ মেস অব পটেজ সর্বস্ব নষ্ট করতে পারে না অজয় সরকার।

প্রতিভা—আপনাকে সেবার যা দেখেছিলাম, তার চেয়ে এখন আপনি অনেক রোগা হয়ে গিয়েছেন।

অজয়—রোগা! তাতে কী আসে যায়!

—খুব আসে যায়। আপনি আমার একটা কথা শুনুন।

—বলুন, শুনছি।

—না, শুধু শুনছি নয়। আমাকে কথা দিন, শরীরের যত্ন করবেন, তুচ্ছ করবেন না।

—ইচ্ছে করে তো তুচ্ছ করি না; তুচ্ছ হয়েই যায়।

—না। আমি এখনই নিয়ম করে দিচ্ছি, শুনে রাখুন, মনে করে রাখুন। সকালবেলা চায়ের সঙ্গে বিস্কুট-মাখন খাবেন। দুপুরবেলায় খাওয়ার মধ্যে যেন মাছ আর দই অবশ্যই থাকে। বিকেলে খাবেন, পাঁউরুটি আর ফল। সস্তা ফল; ধরুন কলা শাঁকআলু; এই সব। রাত্রিবেলা ভাত খাওয়া হয়ে যাবার এক ঘণ্টা পর এক গেলাস গরম দুধ খেয়ে নেবেন।

অজয়ের চোখে-মুখে যেন একটা হঠাৎ-বিস্ময়ের ঝড় এসে লেগেছে। তাই প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভাল করে তাকিয়ে দেখবার জন্য চোখ দুটোকে একটু টান করতে চেষ্টা করে। চাপা-চাপা ভাঙা-ভাঙা স্বরে কথা বলে অজয়।—আপনি একথা বলছেন!

প্রতিভা—হ্যাঁ, আমিই বলছি। তাতে হয়েছে কী? এত আশ্চর্য হবার কী আছে? আচ্ছা, আপনি এখন তাহলে......।

অজয়—হ্যাঁ, চলি।

দরজার দিকে এগিয়ে যায় অজয়। প্রতিভা বলে—মনে থাকবে তো?

—থাকবে। মুখ না ফিরিয়েই জবাব দেয়, আর চলে যায় অজয়।

অনুপমের কাজের ঘরে আলো জ্বলে, পাখাও ঘোরে; আর দরজার সবুজ ভেলভেটের পর্দা কেঁপে কেঁপে দুলতেও থাকে।

বড়বাজারের ভগবান দাস জৈন এসেছিলেন সন্ধ্যা সাতটায়, চলে গিয়েছেন আটটা বাজবার আগেই। কাজের কথা সেরে দিতে বেশি সময় নেননি।

ইনকম ট্যাক্সের সেনগুপ্ত এসেছিলেন সাড়ে আটটায়, চলে গিয়েছেন সাড়ে ন'টায়। ভুল করে সিগারেট কেসটা ফেলে রেখেই চলে গিয়েছেন।

রাত দশটার পর এলেন রেলওয়ের জয়স্বামী। টেণ্ডারের একটা ফাইল অনুপমের হাতের কাছে রেখে দিয়ে শুধু পাঁচ মিনিট বসলেন, এক কাপ কফি খেলেন, তারপর হাসলেন—আজ ওয়েদার খুব ভাল।

জয়স্বামী চলে যাবার দশ মিনিট পরে এলেন প্রাক্তন সাব-জজ এস হালদার।

চন্দ্রবাবু হাসেন—হালদার সাহেবের বয়স কমে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

এস হালদারও হাসেন—কী যে বলেন। চিন্তায় চিন্তায় প্রতি মুহূর্তে বুড়িয়ে যাচ্ছি।

সূর্যবাবু হাসেন—পনরই আগস্টে আপনি কলকাতায় ছিলেন?

এস হালদার—না। আমি ছিলাম আমার গ্রামে।

অনুপম—সেটা আমি অনুমান করেছিলাম।

এস হালদার—কেমন করে?

অনুপম—একটা গান শুনে সেদিন আপনার চোখ যে-রকম ছলছল করে উঠলো, তাতে অনুমান করতে কি আর কোন অসুবিধে আছে?

চন্দ্রবাবু—কী ব্যাপার, অনুপম?

অনুপম—ভিলেজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একটা সভায় ছোট্ট একটি মেয়ে গান গাইল, ফিরে চল মাটির টানে, তাই শুনে হালদার সাহেবের চোখ ভিজে গেল।

এস হালদার—আমার সেণ্টিমেণ্টের কথা ছেড়ে দিন, ইন টার্মস্ অব ইকনমিক্সেই বলুন, গ্রামের উন্নতি ছাড়া ভারতের মত দেশের কি কোন উন্নতি সম্ভব?

সূর্যবাবু—অসম্ভব? সাত লাখ গ্রাম নিয়েই তো ভারত, সহর আর কটা?

এস হালদার—এখন পাঁচ লাখ গ্রাম।

চন্দ্রবাবু—কেন?

অনুপম—দু' লাখ যে দু' পাশ থেকে কেটে বেরিয়ে গেল

চন্দ্রবাবু হাসেন—বুঝলাম, বুঝলাম।

এস হালদার—কিন্তু নতুন লীডারশিপের খুব দরকার।

সূর্যবাবু—এসে যাবে। আমি কথাটা খুব বিশ্বাস করি হালদার সাহেব, সম্ভবামি যুগে যুগে। জাতি যখন সঙ্কটে পড়ে, দুঃখে আঘাতে মুষড়ে

পড়ে, তখন নতুন লীডারশিপ আপনা-আপনি দেখা দেয়।

এস হালদার—ফিনিক্স পাখি আগুনে পুড়ে যখন ছাই হয়ে যায়, তখনই সেই ছাইয়ের মধ্যেই আবার নতুন পাখি জন্ম নিয়ে উড়ে বের হয়ে আসে। যাই হোক, আপনাকে দেখে তবু একটু ভরসা হয় যে...

চন্দ্রবাবু—আপনি কাকে একথা বলছেন, হালদার সাহেব? আমার মত বুড়োকে?

এস হালদার নম্রভাবে হাসেন—না, আমি অনুপমবাবুকেই বলছি।

সূর্যবাবু—এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, অনুপম যদি দরজায় খিল দিয়ে ঘরে বসে থাকে, তবুও রেহাই পাবে না। পাব্লিক নিজেই এসে ভিড় করবে আর অনুপমকে টেনে নিয়ে যাবে।

অনুপম—আপনারা বড় বেশি বাড়িয়ে বলছেন, হালদার সাহেব আর সূর্যদা। এত যোগ্যতা আমার নেই যে, লীডার হতে পারি।

সূর্যবাবু—এটাও কিন্তু একটু বেশি বাড়িয়ে আত্মনিন্দা করা হয়ে গেল।

অনুপম—না না। আমি কাজ পেলে জান-প্রাণ দিয়ে শুধু খেটে দিতে পারি, এই মাত্র।

এস হালদার—আমার ইচ্ছে, আপনি কর্পোরেশনটাকে একটু দেখুন।

হেসে ওঠে অনুপম—তারপর একদিন বলবেন, ইউনিভার্সিটিটাকে একটু দেখুন।

চন্দ্রবাবু—তা তো বলবোই, বলতেই হবে।

সূর্যবাবু—হ্যাঁ, তারপর আরও বলবো, ইলেকশনে দাঁড়াও, স্বাধীন দেশের পার্লামেন্টের মেম্বার হও।

অনুপম—সেটা তো এখন অনেক দূরের ব্যাপার।

চন্দ্রবাবু—কিন্তু তৈরী হতে হবে। সেজন্যে একটু আগে থেকেই গ্রাউণ্ড-ওয়ার্ক দরকার।

অনুপম—এ সব নিয়ে আমি এখন মাথা ঘামাই না চন্দ্রদা। শুধু এক রিলিফ সোসাইটির ট্রেজারার হয়েই ভাবতে হচ্ছে, হঠাৎ এই ঝুঁকি নিতে গেলাম কেন?

এস হালদার—তা বললে কি চলে? এখন কিন্তু একটু চিন্তা আর চেষ্টা করাই দরকার, অনুপমবাবু। আমিও একদিন অসময়ে, তার মানে সময় থাকতেই পেনসন নিয়ে সরে এলাম; জজিয়তী দিতে চেয়েছিল, কিন্তু নিলাম না।

সূর্যবাবু—সেটা এক রকম ভালই করেছিলেন। ভগবানের দয়াতে, তার পরেও তো আপনাকে কোন অসুবিধেয় পড়তে হয়নি। বরং.. ...।

অনুপম—আপনি কি তা হলে সত্যিই......।

এস হালদার—হ্যাঁ, গ্রামের কাজ করবো।

অনুপম—কিন্তু এদিকের কাজ......।

এস হালদার—সেটা তো আছেই, থাকবেও।

অনুপম—এখন তাহলে কাজের কথাই হোক।

এস হালদার—হ্যাঁ।

অনুপম ডাকে—বীরবাহাদুর। তুম হ্যায়?

—জী হুজুর।

অনুপম—আচ্ছা, ঠিক হ্যায়।

ঠিকই, চমৎকার ওয়েদার। পরিষ্কার আকাশে একটি পরিচ্ছন্ন চাঁদ। সেই সঙ্গে একটি পরিষ্কার নীরবতা। ধির স্থির ও নীরব বীরবাহাদুর টুলের উপর বসে আছে। সেক্রেটারী পুলকবাবুর ঘরটাও নীরব, টাইপরাইটারের শব্দ নেই। ফটক নীরব, ড্রইং রুম নীরব, গ্যারেজ নীরব। মাদ্রাজী কুক রাজুলুর চা-তৈরীর ডেস্কও নীরব। দরজাবন্ধ প্রত্যেকটি ঘরের ঘুমও নীরব।

শুধু একজন, এই বাড়ির অনুপম রায়ের স্ত্রী প্রতিভা রায়ের চোখে ঘুমও নেই, ঘরের দরজা বন্ধও নয়, আর মুখটাও নীরব নয়। তেতলার বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিভা, আর বিড়বিড় করে যেন নিজেরই সঙ্গে কথা বলছে। যত সব অদ্ভুত কথা। যেন ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্নের এক-একটা ভাসা-ভাসা কথা। যেন বুকটা কেঁপে উঠে কথা বলে, মাথাটা জ্বলে উঠে কথা বলে।

হ্যাঁ, সাপের মাথাটাকে শুধু থেঁতলে দিয়েই ছেড়ে দিতেন না বিশ্বনাথদা। একটা কাঁচা বাঁশের কঞ্চিতে সাপটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়ে পুকুরের ওদিকের আলোকলতার ঝোপটার গায়ের উপরে ফেলে দিতেন। তখুনি কোথা থেকে একটা চিল উড়ে এসে আর ছোঁ মেরে মরা সাপটাকে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যেত।

দু' মাস কেন, প্রায় তিন মাস হতে চলেছে, এই ঘরের ভিতরে আর ঢোকেনি ভদ্রলোক। দরজার গায়ে টোকার শব্দ তো বাজেইনি, পায়ের শব্দটা যদি বা কখনও আস্তে আস্তে হেঁটে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তখুনি ফিরে চলে গিয়েছে। এর মানে তো এই দাঁড়ায় যে, প্রতিভার জীবনে একটি মাত্র যে-কাজ ছিল, এই ঘরের ভিতরে রাত জেগে বসে থেকে একটা অপেক্ষার মানত পালন করবার কাজ, সে-কাজের দরকারও শেষ হয়ে গিয়েছে। তাহলে তো বলতে হয়, মাথা থেঁতলানো সাপটাকে এইবার তুলে নিয়ে আলোকলতার ঝোপের উপরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর এই ঘরে একা-একা রাত জেগে বসে থেকে লাভ কি, যদি তিনিই না আসেন, যাঁর জন্যে বসে থাকা?

না না; নিশ্চয় ভদ্রলোকের শরীর খুব খারাপ হয়েছে। বাইরের কাজের হুল্লোড়ে পড়ে কাহিল হয়ে গিয়েছে। কী আশ্চর্য, সুধার মা এত রাজ্যের

যত বাজে খবর দিতে পারে, কিন্তু একদিনও একটু বলে গেল না যে, দাদাবাবুর শরীর ভাল যাচ্ছে না। সকাল-সন্ধ্যার মধ্যে অন্তত চার-পাঁচবার তো সুধার মার সঙ্গে ভদ্রলোকের দেখা হয়। সুধার মা তো আজকাল প্রায়-সময় নীচের তলার বারান্দাতেই বসে থাকে, আর শুধু রামায়ণ পড়ে ও পান সেজে দিন পার করে দেয়। তখন তো দেখতে পায় সুধার মা, ওর চোখের সামনে দিয়ে যে মানুষটা চলে গেল, সে মানুষটার মুখ শুকনো কিনা, দেখতে রোগা-রোগা লাগছে কিনা।

পায়ের শব্দ। শব্দটাকে একটু ভাল করে শোনবার জন্যে মাথা ঝুঁকিয়ে সিঁড়ির মুখটার দিকে তাকায় প্রতিভা। হ্যাঁ, আসছেন ভদ্রলোক।

গায়ের পাঞ্জাবিটাকে খুলে নিয়ে কাঁধের উপর ফেলে রেখেছে অনুপম, নাগরা-পরা পায়ের শব্দটাও যেন ঢিলে-ঢিলে হয়ে বাজছে, এক হাতে রুপোর চেনের সঙ্গে বাঁধা চাবিও ঝুলছে। আর-এক হাতে কাগজপত্রের একটা ফাইল।

নিজের ঘরে না ঢুকে সোজা প্রতিভারই কাছে এসে দাঁড়ায় অনুপম। —কী? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

প্রতিভা—তোমার শরীর ভাল আছে তো?

অনুপম হাসে—নিশ্চয় ভাল আছে। দেখতেই তো পাচ্ছ, এটা কি একটা অসুখ-হওয়া শরীর?

হ্যাঁ, দেখতেই পেয়েছে প্রতিভা, এ শরীরকে কোন অন্ধও একটা কাহিল শরীর বলে সন্দেহ করবে না। তবু, ভুলের ভয় আছে বলেই কথাটা জিজ্ঞেস করেছে।

—যাও, ঘরে যাও। শুয়ে পড়, অনেক রাত হয়েছে। বলতে বলতে নিজের ঘরের দিকে চলে যায় অনুপম, দুটো স্টীল-সেফ আছে যে-ঘরে, সেই ঘরে। মুখ ফিরিয়ে আর তাকায় না প্রতিভা, কিন্তু শব্দ শুনে বুঝতেও কোন অসুবিধে নেই, তালা খুললো, ঘরে ঢুকলো, আর দরজাও বন্ধ করে দিল, অনুপম।

এইবার নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আর শুয়েও পড়ে প্রতিভা। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়া কি উচিত হবে?

উচিত নয়। অনুপমের রাতের জীবনের ইচ্ছেটা আজ বোধহয় দরজার গায়ে টোকা না দিয়ে পারবে না। আবার ভুল হবে, যদি ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখে প্রতিভা, সে শব্দের ডাক শুনতে না পায়, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে না দিতে পারে, আর, জাগা-চোখের দুটো ক্লান্ত কালো তারাকে হাসিয়ে ও চকচকিয়ে দিয়ে বলতে না পারে, এস।

রাত বাড়ছে, বাড়ুক। জেগে থাকতে অসুবিধে নেই। যদি সত্যিই চোখ দুটো জেগে জেগে ক্লান্ত হয় আর মাথাটা বার-বার ঢুলে পড়ে, তবে উঠে গিয়ে

খোলা জানালাটার কাছে গিয়ে একবার দাঁড়াতে হবে, আর আকাশের মিটমিটে তারাগুলির দিকে একবার চোখ টান করে তাকিয়ে নিলেই হবে। ঘুমের আবেশ তখুনি ভেঙে যাবে।

কিন্তু কই? দরজার নিরেট কাঠের কপাট যে সত্যিই একটা নিরেট বোবা ঠাট্টা। শব্দ নেই। বলতেই হবে, এ এক চমৎকার ভাগ্য। যাদের কেউ নেই, তারা এখন ঘুমোচ্ছে। খুব ভাল ঘুম, গভীর ঘুম। মুক্তিদি ঘুমোচ্ছে একটি চিঠির সঙ্গে, বাণীদি ঘুমোচ্ছে একটি বই-এর সঙ্গে, আর এক মুঠো নটে চাঁপা ফুলের সঙ্গে ঘুমোচ্ছেন ওই অজয়বাবু। শুধু গুপ্তিপাড়ার চৌধুরীবাড়ির মেয়ে, যার জীবনের একজন এত স্পষ্ট ও এত সত্য হয়ে একটু দূরে একটি ঘরের মধ্যেই আছেন, তারই চোখে ঘুম নেই। টোকার শব্দটাও তাকে আজ ভুলে গিয়েছে। এ যেন শ্মশান-ঘাটের একটা একলা মড়া, কেউ তাকে চেনে না, তাই কেউ কাছে যেতে আর ছুঁতেও চায় না।

রাত কি ভোর হয়ে এল? চমকে উঠে খোলা জানালার দিকে তাকায় প্রতিভা।

হ্যাঁ, ভোর হয়েছে বইকি। পুবের আকাশটা তো প্রায় ফরসা হয়েই এসেছে। হাওয়াটাও বেশ ঠাণ্ডা।

দরজা খুলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় প্রতিভা। হ্যাঁ, ওটারই নাম শুকতারা। শুধু আকাশে নয়, শুকতারাটা বারান্দার দেয়ালের একটা আয়নার বুকের উপরেও ফুটে রয়েছে। ফুলের টবের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে আজকের ঘুমভাঙা ভোর বেলার প্রথম ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায় প্রতিভা।

চমকে ওঠে প্রতিভা। দু' চোখ অপলক করে দেখতে থাকে। একটা উতলা আলুথালু ভয়ের চেহারা, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে আর হুমড়ি খেয়ে খেয়ে তেতলার সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছে। ও কে? মনে হচ্ছে, মুক্তিদি।

উঠে এসেই প্রতিভার গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে, আর, প্রতিভার একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কাঁপতে থাকে মুক্তি—ঘুমোতে পারিনি, বউদি। বুক কাঁপছে, বউদি।

প্রতিভা—কেন? কী হয়েছে?

মুক্তির দু' চোখের ভয় তখনও থরথর করছে। মুক্তি বলে—দরজার গায়ে টোকা।

প্রতিভা—শুনতে ভুল করনি তো?

মুক্তি—না বউদি; একবার দু'বার নয়। বার বার, আট-দশ বার। চলে যায়, আবার ফিরে এসে দরজার গায়ে টোকা দেয়। ভয় পেয়ে প্রায় মরতেই বসেছিলাম। চেঁচিয়ে একটা ডাকও দিতে পারিনি। ঠক ঠক করে কেঁপেছি আর ভগবানকে ডেকেছি।

প্রতিভা—টোকার শব্দ থামলো কখন্?

মুক্তি—কে জানে কখন্। কাক ডাকলো, আর আমিও তক্ষুনি দরজা খুলে বের হয়ে পড়ি-মরি করে একটা দৌড় দিয়ে তোমাকেই ডাকতে যাচ্ছিলাম।

প্রতিভা—বেশ করেছো।

মুক্তি—তোমার ঘরের দরজাতেও কি...।

প্রতিভা হাসে—না।

মুক্তি—এ কেমন শব্দ, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। চোর?

প্রতিভা—না।

মুক্তি—তবে?

প্রতিভা—ভূত।

মুক্তি—মিথ্যে কথা বলো না, বউদি।

প্রতিভা—আস্তে কথা বল। কথা বলোই না। এখন আমার ঘরে গিয়ে শুধু চুপটি করে বসে থাক। চল।

কিন্তু কতক্ষণ আর চুপটি করে বসে থাকা যায়? মুক্তির দুই চোখ বার বার শিউরে উঠতে থাকে। প্রতিভার মুখের দিকে তাকালেও যে বুকটা ছমছম করে। চুপ করে আর চোখ দুটোকে একেবারে পাথরের মত শক্ত করে নিয়ে কী দেখছে আর কী ভাবছে প্রতিভা?

প্রতিভার ঘরের মেজের উপর লুটিয়ে বসে আর আস্তে কথা বলতে গিয়েও মুক্তির গলার স্বর কাঁপে।—এত ঘর আর এত দরজা থাকতে শুধু আমারই ঘরের দরজাতে ভূতের টোকা?

প্রতিভা—তার মানে বুঝে দেখ।

মুক্তি—কী?

প্রতিভা—তার মানে, তোমার আর এখানে থাকা চলবে না। থাকলে ভুল করবে। ভূতে একদিন তোমার ঘাড় মটকে তোমাকে মেরে ফেলবে। তোমাকে এখনই চলে যেতে হবে।

মুক্তি—এখনই?

প্রতিভা—হ্যাঁ।

মুক্তি—কিন্তু কোথায় যাব?

প্রতিভা—তা আমি জানি না।

উঠে দাঁড়ায় মুক্তি।—আচ্ছা, চলি তবে বউদি। নমস্কার বউদি।

চলেই যাচ্ছিল মুক্তি; কিন্তু প্রতিভা যেন ধড়ফড় করে চমকে উঠেই এগিয়ে আসে। মুক্তির একটা হাত ধরে।—গরীবের বাড়িতে থাকতে চাও, মুক্তিদি?

মুক্তি হাসে—চাই।

প্রতিভা—তাহলে আমার একটা কথা শোন।

মুক্তি—বল।

প্রতিভা—তুমি শেফালীদির কাছে চলে যাও।

মুক্তি—আমি তো যেতে পারি। কিন্তু...।

প্রতিভা—কোন কিন্তু নেই। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। এই চিঠি নিয়ে তুমি এখনি চলে যাও।......হ্যাঁ, যাবার সময় বাণীদিকে একটা মিথ্যে কথা বলে যেতে পারবে?

মুক্তি হাসে—পারবো। বল।

প্রতিভা—বাণীদিকে বলো, কাজ পেয়েছি; এখুনি না গেলে চলবে না, তাই চলে যাচ্ছি।

চিঠি লিখতে থাকে প্রতিভা—তোমার পায়ে পড়ি শেফালীদি, মুক্তিদিকে তোমার ঘরে ঠাঁই দিও। আমার এখানে ঘর আছে, কিন্তু জায়গা নেই। মুক্তিদির তাই জায়গা হলো না।

এ কি? সত্যিই যে গুপ্তিপাড়ার চিঠি। খামের টিকিটের উপরে গুপ্তি-পাড়ার ডাকঘরের ছাপ। ঠিকানাটা রানু বউদিরই হাতের লেখা। গুপ্তিপাড়ার বাড়ির ঘরে তাহলে এখন সন্ধ্যে-পিদিম জ্বলে। পুরনো দোলমঞ্চের কাছে খেলা করে মণ্টু আর টুলু। ঠিক কত বয়স হলো টুলুর?

খাম খুলে চিঠি পড়ে প্রতিভা। তারপর চিঠিটারই দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। শক্ত শুকনো, আর যেন ছাই-মাখা দুটো চোখ অনেক দূরের একটা আগুন-লাগা অদৃষ্টের ধোঁয়া দেখছে।

পরেশ চৌধুরীর মেয়ের চোখ পানসে নয়। তবু ভিজে ভিজে ভারী হয়ে যায় প্রতিভার চোখের পাতা। তার পরেই চোখ মোছে, আর হেসেও ফেলে।

রানু বউদির চিঠির লেখাগুলির মধ্যে আগুন-লাগা অদৃষ্টের ধোঁয়া আছে, আর এক ঠাট্টার হাসিও আছে।

বলাইদার চাকরি নেই। টাটানগর থেকে ফিরে এসে আবার সবাই গুপ্তি-পাড়ার ভাঙ্গাবাড়ির ঘরে ঠাঁই নিয়েছে। দাদার মাথায় দোষ দেখা দিয়েছে। কথা বলে না দাদা। সারাদিন শুধু চুপ করে বসে থাকে আর দু' হাত দিয়ে কুচি-কুচি করে কাগজ ছেঁড়ে।......এই ভাগ্য নিয়ে আমি এখানে মহাসুখে পড়ে আছি, প্রতিভা। কবরেজী তেলের শিশিটা হাতে নিয়ে মাথায় মাখিয়ে দেবার জন্য যখন কাছে গিয়ে দাঁড়াই, তখনও ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, বোধহয় আমাকে চিনতেও পারে না।......সেজদা, যাঁর নিজেরই

সংসারে শত অভাব, তিনি মাসে মাসে পঞ্চাশটা টাকা পাঠিয়ে দেন বলেই এখনও আমরা বেঁচে আছি; তুমি যাকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতে, সেই মণ্টুও তাই বেঁচে আছে। যাই হোক, চৌধুরীবাড়ির প্রাণ এখন একজন গরীব কুটুমের দয়াতে চলছে, বড়লোক মেয়ের দয়াতে নয়।

হাসবারই মত কথা। একটা কথা নিশ্চয় ভুলে গিয়েছে রানু বউদি, তাই চৌধুরীবাড়ির মান-মেজাজের গর্বটাকে খোঁচা দিয়েছে। বউদির সেজদা নিশ্চয় খুব ভাল লোক, তাই চৌধুরীবাড়িকে মাসে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন। ......কিন্তু তোমার ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি রানু বউদি, তোমারই শ্বশুর পরেশ চৌধুরী একদিন তোমার ওই সেজদাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন, ব্যবসা করবার জন্য?

আমাকেও তুমি খুব ভুল বুঝলে, রানু বউদি। কিন্তু সেজন্য তোমাকে একটুও দোষ দিতে পারি না। তোমার শক্ত শক্ত ঠাট্টার কথাগুলি আমাকে শুধু হাসিয়ে দেয়। জবাব দিতে পারবো না বলেই হাসি।

কিন্তু আর কিসের ধৈর্য? জবাব দিতে পারা যাবে না কেন? এখুনি রানু বউদিকে লিখে দিলেই তো হয়; তুমি কিছু জান না, তাই তোমার ধারণা হয়েছে যে, আমি একটা মস্তবড় ভাগ্যবান ভদ্রলোকের বউ। ডাহা মিথ্যে কথা।

হঠাৎ ছটফট করে চেয়ার ছেড়ে একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় প্রতিভা। এত শক্ত করে বাঁধা খোঁপাটাও ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ে। গায়ের ধাক্কা লেগে আয়নাটাও কেঁপে ওঠে। হাতের ধাক্কা লেগে টেবিলের উপরের ফুলদানিটা হেলে পড়ে, তারপর ধুপ করে পড়েই যায়। পড়ে যাবেই তো, হালকা পলকা একটা রুপোর ফুলদানি।

সন্ধ্যা হয়েছে। কিন্তু আলো জেলে দিতে আর ইচ্ছে করে না। কিন্তু বাণীদি যেমন রোজই সন্ধ্যাবেলা একবার দেখা করতে আসে, তেমনই আজও নিশ্চয় আসবে। বাণীদি দেখেই তো আশ্চর্য হবে আর পাঁচ কথা জিজ্ঞেস করে করে আবার জবাব দেবার একটা হয়রানি বাড়িয়ে তুলবে। চুল বাঁধনি কেন? ফুলদানিটা গড়িয়ে পড়ে রয়েছে কেন? ঘর অন্ধকার রেখে চুপটি করে বসে আছ কেন?

আলো জ্বালে, খোঁপা বাঁধে, ফুলদানিটাকে দাঁড় করিয়ে দেয় প্রতিভা। চেয়ারের উপর বসে একটা হাঁপ ছাড়ে, যেন বুকের ভিতরে হঠাৎ গুমরে ওঠা একটা নিঃশ্বাসকে এতক্ষণে শান্ত করে বাইরের বাতাসের কাছে ছেড়ে দেয়।

এক মাস হয়েছে, শেফালীদির চিঠি এসেছে। নিশ্চিন্ত হয়েছে প্রতিভা। প্রতিভার একটা ভয়ানক দুঃখের উদ্বেগ মিটে গিয়েছে। মুক্তিদি এখন শেফালীদির বাড়িতেই আছে। শেফালীদি লিখেছে, মুক্তিদি যদি চলে যেতে না চায়, তবে আমরা কখনও চলে যেতে বলবো না।...তোমার জীবনে শান্তির

ফ্লল-চন্দন পড়্ক শেফালীদি।

এই এক মাসের মধ্যে কোন দিনের কোন ম্হ্র্তেও অন্পমের সঙ্গে প্রতিভার দেখা হয়নি। দিনেও না, রাতেও না। এটাও একটা শান্তি। আরও বড় শান্তি, দরজা বন্ধ করে ঘ্মিয়ে পড়া যায়। দরজা খ্লে দেবার দায় ফ্রিয়ে গিয়েছে। বলা ভাল, সে দায় মিথ্যে হয়ে গিয়েছে।

প্রতিভারও আর জোর করে কোন আশার কথা ভেবে জল্পনা বা কল্পনা করবার কিছ্ নেই। দরজা খ্লে দেবার সাধ্যি নেই প্রতিভার। প্রতিভার হাত আর উঠবে না। সে দাবি এই ঘরের দরজার উপর টোকার শব্দ কর্ক, দ্মদাম করে শক্ত হাতের আঘাত আছড়ে দিক, কিংবা লাথি মেরে দরজাটাকে ভেঙেই ফেল্ক, কিচ্ছ্ আসে যায় না। প্রতিভার প্রাণ শ্ধ্ একটি কথা বলে দেবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে—না, কখ্খনো না, কিছ্তেই না, মেরে ফেললেও না। চৌধ্রীবাড়ির মেয়ের মেজাজ তুমি কখনও দেখনি, তাই চিনতেও পারনি।

বাণীদি বেচারা বেশ আশ্চর্য হয়েছে; দ্ঃখও পেয়েছে, আর একট্ অস্বিধাতে পড়েছে। ম্ক্তিদি নেই, কার সঙ্গে দিন-রাত গল্প করবে আর এত হাসবে বাণীদি? মাঝে মাঝে বেশ রাগ করে আক্ষেপ করে—আমার ভাবতে একট্ আশ্চর্যই লাগে, বউদি; যেন ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে, একেবারে হন্তদন্ত হয়ে ছ্টে চলে গেল ম্ক্তি। যাবার সময় এতদিনের চেনা-জানা একটা মান্ষকে অন্তত দ্টো মায়ার কথাও তো বলে যেতে হয়। তা তো নয়। কাজ পেয়েছি বাণীদি, চললাম; বাস্; শ্ধ্ দ্টো কথা কোনমতে ম্খ থেকে উগরে দিয়েই চলে গেল।

মাঝে-মাঝে প্রতিভার ঘরে এসে অনেক গল্পে মাতিয়ে তোলে বাণী। আর হাসাহাসির মধ্যেই বলে ওঠে—নাঃ, ম্ক্তি থাকলে গল্প যেমন জমতো, ঠিক সে-রকম জমছে না।

প্রতিভা হাসে—শ্ধ্ এজন্যে ম্ক্তিদির ওপর এত রাগ করবার কোন মানে হয় না।

বাণী—ম্ক্তি সত্যিই রাগ-টাগ করে চলে যায়নি তো?

প্রতিভা—না।

বাণী—তাই বল। শ্নে মনটা শান্ত হলো।...কিন্তু তুমি ঠিক হাসি জমিয়ে গল্প বলতে পার না, বউদি।

প্রতিভা—তবে শোন। শেফালীদির ভাই চিন্কে একবার বেশ দামী, বেশ চকচকে একজোড়া জ্তো কিনে দিয়েছিলেন নরেনকাকা। তখন চিন্র বয়স মাত্র দশ বছর। চিন্ সে জ্তো পায়েই দিত না। স্কুলে যাবার আগে জ্তো জোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতো, মাঝে মাঝে ব্র্শ দিত, পালিশও লাগাতো। কিন্তু পরতো না। খালি পায়েই স্কুলে চলে যেত। ফিরে এসেও চিন্র ওই

কাণ্ড। জুতো জোড়াকে মুছে আর ঘষে, খাটের তলায় একটা তক্তার উপর রেখে দিয়ে বেড়াতে বের হয়ে যেত। একদিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেল, কাদাজলে ভরে গেল রাস্তা। চিনুকে জব্দ করবার জন্য নরেনকাকা ডাকলেন—ওরে চিনু, তোর নতুন জুতো নিয়ে তুই যদি ওই কাদার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ভানুদের বাড়ির গেট একবার ছুঁয়ে দিয়েই চলে আসতে পারিস, তবে তোকে এখনি একটি টাকা দেব। চিনু কী করলে, শোন। জুতো জোড়া হাতে তুলে নিয়ে কাদার উপর দিয়ে থপ থপ করে হেঁটে চলে গেল আর গেট ছুঁয়ে ফিরে এল। নরেনকাকা বললেন, হলো না, তুমি টাকা পাবে না। চিনু বলে—কেন? নরেনকাকা বলেন—তুমি তো জুতো পায়ে দিলে না। চিনু বলে—তুমি বলেছো জুতো নিয়ে, জুতো পায়ে দিতে বলনি। চালাকী! শিগগির দাও আমার টাকা। দিতেই হবে।

বাণী হাসতে থাকে।—দেখ কাণ্ড! এইটুকু ছেলের বুদ্ধি কত সজাগ।

এই তো, নিশ্চিন্ত হওয়া একটা জীবন। কোন কাজ নেই, শুধু দিনগুলি পার করে দেওয়া। আশাটা সেই যে একটা হোঁচট খেল, হঠাৎ-টাকার একটা স্টীল-সেফ ঘরে এল, তারপর থেকে আর এক পা'ও এগুতে পারা গেল না। শুধু পিছিয়ে যেতে হলো। পিছিয়ে যেয়েও কোথাও থেমে থাকতে পারা গেল না। আবার আরও পিছিয়ে যেতে হলো। কিন্তু এই তো শেষ, আর যে পিছিয়ে যাবারও জায়গা নেই, পাথরের চটানে এসে পিঠ লেগেছে। ছোট হতে হতে একেবারে ধুলোর সঙ্গে সঙ্গে মিশে যেতে হলো, আর তো আরও ছোট হবার উপায় নেই। না, আর আলেয়া দেখবার ভয় নেই। আর নিশির ডাক শোনবার ভয় নেই। ঘেন্নার সঙ্গে লড়াই করবার হয়রানির পালা চুকে গিয়েছে। এই তো শেষবারের মত থেমে যাওয়া। শান্তি বইকি। শেফালীদিকে লিখে দিতে অসুবিধা হবে না, তোমাদের পতুর জীবনে আর চলবার ও চালিয়ে নেবার মত কিছু নেই।

বাণীদি জানে না, আজ জ্বর হয়েছে প্রতিভার। সুধার মা'কে জানিয়ে দিয়েছে প্রতিভা, আজ রাতে কিছুই খাব না। একটু দুধ বিস্কুটও না। এখন বাণীদি আর বেশি দেরি না করে এসে পড়লেই তো পারে, গল্পটল্পও তাড়াতাড়ি সেরে নিলেই ভাল। আজ এখুনি যে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

ঘরে ঢোকে বাণী।—আজ এখন আর গল্প করবো না, বউদি। শুধু একটা কথা বলে চলে যাব।

প্রতিভা—কেন? এখন বুঝি সুধার মা'র রামায়ণ শুনবে?

বাণী যেন আনমনার মত হাসে—না, তা নয়। আমাকে দিয়ে কোন একটা কাজ করাও, বউদি। নইলে আমার ভাল লাগছে না। তুমি অন্তত আমাকে কিছু উল আনিয়ে দাও। আমি অনুদার জন্যে একটা সোয়েটার বুনে দিই।

প্রতিভা হাসে—তোমার অনুদার অনেক সোয়েটার আছে, বাণীদি। বিলিতী উলের দামী দামী সোয়েটার।

বাণী—আছেই তো। তা কি আর জানি না? কিন্তু দাদার কাছে কি গরীব বোনের হাতের বোনা সোয়েটার কিছু কম দামী জিনিস হয়? তুমিই বল।

প্রতিভা—তা হলে আজ নয়, কাল। দীনুবাবুর কাছে কাল সকালবেলা একটা ফর্দ লিখে পাঠিয়ে দিও, কী চাই, তাহলেই হবে।

বাণী—আমি লিখলেই হবে?

প্রতিভা—হ্যাঁ।

চলে গেল বাণী। দরজা বন্ধ করে আর আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তেই ঘুম আর জ্বর যেন পালা করে প্রতিভাকে স্বপ্ন দেখায়, আবার জাগিয়ে তুলে ছটফট করায়। উঃ, এই পাখার হাওয়াতে জ্বরের জ্বালা জুড়োয় না। যদি গঙ্গার হাওয়াটা একবার হু হু করে ছুটে এসে খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে আর প্রতিভার মাথাটার উপরে পড়ে হুটোপুটি করতো, তবে স্বস্তি পাওয়া যেত বোধ হয়।

বিছানা থেকে নামে, আলো জ্বালে, আর টেবিলের ঘড়ির দিকে তাকায় প্রতিভা। না, মাঝরাত পার হতে চলেছে, তবু এখনও গঙ্গার হাওয়া এল না। মনে হয়, ভোর না হওয়া পর্যন্ত এই গুমোট থাকবে।

চমকে ওঠে প্রতিভার কান। চমকে ওঠে প্রতিভার বুকের ভিতরের সব রক্ত। মনে হয়, নিশাচর টোকার শব্দটা দোতলার কোন ঘরে দরজার উপর পড়ে পড়ে আর বারে বারে বাজছে—টক্ টক্ টক্!

কার ঘরে? তবে কি বাণীদির ঘরে?

ঘরের দরজা খুলে, তেতলার বারান্দার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ছুটে যায় প্রতিভা। কিন্তু পায়ের শব্দ নেই। আক্রোশের সিংহিনীও ঠিক ওইরকম করে ছুটে যায়, পায়ের নরম থাবার শব্দ হয় না।

দোতলার সিঁড়ির মুখের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় আর গা-ঢাকা সিংহিনীরই মত উঁকি দিয়ে আর দুই চোখের দৃষ্টি অন্ধকারে ভাসিয়ে দিয়ে দেখতে থাকে প্রতিভা, হ্যাঁ, বাণীদিরই ঘরের দরজার সামনে কালো লোভের একটা শক্ত ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। টক্ টক্ টক্—টোকার শব্দ বাজছে। উন্মাদ অজগরের তেষ্টা দরজার গায়ে ছোবল দিয়ে দিয়ে শব্দ করছে।

দরজাটার কাঠ বোধহয় ঘেন্না সইতে না পেরে পাথর হয়ে গিয়েছে। নড়ে না, খোলে না, সাড়া দেয় না দরজার কপাট।

ফিরে আসছে ছায়াটা। প্রতিভাও যেন বুকের ভিতরের একটা দমবন্ধ গুমোট এক নিঃশ্বাসে হালকা করে দিয়ে তখুনি উপরে চলে যায়। নিজের ঘরে

ঢুকে দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হ্যাঁ, নাগরা-চটির শব্দটা বারান্দার রঙীন মোজেয়িকের গা ঘষে ঘষে এগিয়ে আসছে। কান পেতে শুনতে থাকে প্রতিভা। এইবার থেমে যায় শব্দ। হাঁপ ছাড়ে প্রতিভা। এই বাড়ির রাতের সম্রাট অনুপম রায় এইবার নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন।

দরজা খুলে আবার বের হয়ে পড়ে প্রতিভা। দোতলায় নেমে বাণীর ঘরের দরজার উপর হাত ঠুকে ঠুকে আর চাপা স্বরে ডাক দেয়—বাণীদি; ভয় নেই বাণীদি। আমি ডাকছি। শিগগির দরজা খোল।

দরজা খুলে দিয়েই হাঁপাতে থাকে বাণী। বাণীর কপাল ঘামে ভেসে গিয়েছে। কাঁপছে চোখ দুটো।—তুমি আমাকে মিছিমিছি কেন এরকম ভয় দেখালে, বউদি? ছিঃ, আমি যে আর-একটু হলে মরেই যেতাম। এই দেখ, এখনও বুকটা কী ভয়ানক ঢিপ ঢিপ করছে।

বাণীর ঘরের ভিতরে ঢুকে কুঁজো থেকে এক গেলাস জল ঢালে প্রতিভা—নাও, কপালটা আর মুখটা ধুয়ে ফেল, আর, একটু জল খাও।...হ্যাঁ, এইবার শোন বাণীদি, আমি টোকা দিইনি।

চেঁচিয়ে ওঠে বাণী—তবে কে টোকা দিল?

প্রতিভা—ভূতে।

বাণী—ঠাট্টা করছো?

—না।

—তবে?

—তোমার আর এখানে থাকা চলবে না। আর একটি দিনও না। তোমাকে এখনই চলে যেতে হবে।

—একথা কেন বলছো?

—আমার ইচ্ছে।

—সত্যি কথাটা বল, বউদি।

—না।

দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে বাণী।—হ্যাঁ, এখনই চলে যাব।

বাণীর একটা হাতের উপর আস্তে আস্তে হাত বোলায় প্রতিভা—একটু দেরি কর। ভোর হোক্।

বাণী—তুমি কিন্তু এখনই ওপরে চলে যেও না।

প্রতিভা হাসে—না না, তবে এলাম কেন? তোমাকে বিদায় না করা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়বো না!

নড়ে না প্রতিভা। ভোরের কাক যখন ডাকে, পুবের আকাশ যখন ফর্সা হয়, আর গুমোট-ভাঙা গঙ্গার হাওয়া বইতে শুরু করে, তখন ডাক দেয় প্রতিভা—

এবার তৈরী হতে হয়, বাণীদি। নীচে গিয়ে রামপ্রসাদকে বললেই একটা রিক্সা ডেকে দেবে।

বাণী—হ্যাঁ; কিন্তু কোথায় যে যাব, কার কাছে যাব, কিছুই ভাবতে পারছি না। পাগল হয়েই যাব, বউদি।

প্রতিভা—আমি ভেবে রেখেছি। তুমি এখন বেলেঘাটাতে আমার নরেন কাকার বাড়িতে চলে যাও।

বাণী—তবে একটা চিঠি লিখে দাও। একটু তাড়াতাড়ি কর বউদি। আমি আর এ বাতাস সহ্য করতে পারছি না।

চিঠি লেখে প্রতিভা—আপনাকে পায়ে ধরে অনুরোধ করছি কাকা, বাণীদিকে আপনার বাড়িতে থাকতে দিন, যতদিন না বাণীদি একটা কাজ যোগাড় করে নিতে পারে। এর বেশি কিছু আমি আর লিখতে পারছি না। ক্ষমা করবেন।

রামপ্রসাদকে এখুনি ডাক দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, একটা রিকশা ডেকে দাও, আমাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসুক। আমাকে দুটো টাকা ধার দাও, রামপ্রসাদ, গুপ্তিপাড়া যাবার ট্রেনের টিকেট কিনতে হবে।

ইচ্ছেটা মাঝে মাঝে ছটফট করে প্রতিভার দুপুর বেলার এত অলস ঘুম-টাকেও ভেঙে দেয়। আর ঘুম ভাঙলে নিজেরই উপর রাগ করে মনটা ছটফট করে, সত্যিই তো, আর এখানে কেন পড়ে থাকা?

আর, বুঝতে না পেরে নিজেই আশ্চর্য হয়, এখনও পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে কেন? এটা যে একটা পাগলের অপেক্ষা। ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখতেই পাচ্ছে, খেয়ার নৌকা ডুবে গেল, তবু খেয়া পার হবার অপেক্ষায় বসে আছে।

বিছানা থেকে উঠে আর চুপ করে চেয়ারের উপর বসে থাকলেই বা কী? মনটা চুপ করে থাকতে চায় না, কথা বলতে চায়। কবরেজী তেলের শিশিটা আমার হাতে দাও, রানু বউদি। দাদার মাথায় মাখিয়ে দিয়ে আসি। দেখি, দাদা আমাকে চোখে দেখেও কেমন করে না চিনে থাকতে পারে।

চলে যেতেই হবে যখন, তখন আর মিছে দেরি করে তো কোন লাভ নেই। গল্পটা দাদাই বলেছিল, আলিপুরের জেলে যখন ছিল দাদা, তখন একটা যাবজ্জীবন কয়েদীর সঙ্গে দাদার খুব ভাব হয়েছিল। চোদ্দ বছরের মেয়াদ শেষ হবার পর যেদিন ছাড়া পেল কয়েদীটা, তখন বলে কিনা, আজ যাব না, আজ শনিবার, যাত্রা নাস্তি, আজ দিন ভাল নয়। আর পাঁচ দিন পরে পূর্ণিমা,

সেদিন আমি যাব। আমাকে দয়া করে আর পাঁচটে দিন জেলেই থাকতে দিতে আজ্ঞা হোক।

এইবার হাসতে ইচ্ছে করে। তবে কি জেলের ওই যাবজ্জীবন কয়েদীর মত প্রতিভা রায়ের প্রাণটাও একটা পূর্ণিমা দেখবার ইচ্ছে নিয়ে এখানে পড়ে থাকবে? আলিপুর জেলের মাথার উপরে আকাশ ছিল। কিন্তু প্রতিভা রায়ের এই জীবনের মাথার উপরে কোন্ আকাশ আছে যে, পূর্ণিমা দেখবার অপেক্ষা করতে হবে?

বাণী চলে গিয়েছে; আবার আরও একটা মাস পার হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত চারটে দিন প্রতিভার ইচ্ছেটা ছটফট করেছে। কিন্তু সে দুরন্ত ইচ্ছেটা আবার যেন নিজেই নিজেকে শান্ত করে দেয়। রাত্রি ন'টা থেকে সকাল ন'টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে থাকতে কোন অসুবিধে হয় না। সকালবেলা ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াবার পর মনে হয়েছে, আরও একটা দিন পার হয়ে গেল।

অনুপমের ঘরের দরজা এ সময় তালাবন্ধ। তাই কোন অস্বস্তি বোধ করতেও হয় না। বারান্দার টবের ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরে বেড়াতে পারা যায়। এখনি স্নানটা সেরে নিতে হবে, তাই খোঁপা খুলে ফেলে আর চুলের গোছা ঘাড়ে পিঠে এলিয়ে-ছড়িয়ে দিয়ে, আরও কিছুক্ষণ স্বচ্ছন্দে শুধু একা একা নিজেরই ছায়ার দিকে তাকিয়ে একটু ঘুরতে-ফিরতে পারা যায়।

আজ সকালবেলা ঘর থেকে বের হতে আরও একটু দেরি করে ফেলেছে প্রতিভা। এখন বেলা প্রায় দশটা। ঘরেরই দরজার কাছে বারান্দাটার উপর দাঁড়িয়ে, বারান্দার দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে, আর, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে খোঁপা খুলতে থাকে প্রতিভা। কিন্তু চমকে ওঠে। শক্ত জুতো-পরা পায়ের শব্দ, সেই সঙ্গে অনুপম রায়ের খুব-ব্যস্ত একটি মূর্তি এই দিকেই আসছে, প্রায় এসেই গিয়েছে।

অনুপমের এক হাতে কাগজপত্রের চামড়া-ব্যাগ ঝুলছে, আর-এক হাতের দুই আঙুলের চিমটি দিয়ে চেপে ধরা কয়েকটা খোলা চিঠি।

নিজের ঘরের কাছে এসে একবার থেমে নিয়েই, আবার এগিয়ে আসতে থাকে অনুপম। ব্যস্তভাবে নয়, খুব আস্তে আস্তে, যেন জুতোর চাপে এক-একটা পোকামাকড় চেপটে দিয়ে-দিয়ে পা ফেলছে আর এগিয়ে আসছে।

হ্যাঁ, প্রতিভারই কাছে এসে দাঁড়ায়, আর প্রতিভারই মুখের দিকে তাকায় অনুপম।—তোমার সঙ্গে দেখাই হয় না, তাই একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারিনি। মুক্তি হঠাৎ চলে গেল কেন?

উত্তর দেয় না প্রতিভা। চুলের একটা গোছা শক্ত করে ধরে আর মুখ ফিরিয়ে বারান্দার রেলিংয়ের পাথুরে নকশাটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অনুপম—মুখ ঘুরিয়ে থাকলে চলবে না। আমার কথার জবাব দাও।

মুখ ঘুরিয়ে, মাথা তুলে, আর দু' চোখের দৃষ্টিটাকে সোজা ঠিকরে দিয়ে অনুপমের মুখের দিকে তাকায় প্রতিভা।

অনুপম—ওভাবে শুধু তাকিয়ে থাকলে চলবে না। আমার কথার জবাব দাও, মুক্তি হঠাৎ কেন চলে গেল?

প্রতিভা—ভূতের ভয়ে।

চোখ দুটোকে কুঁচকে দিয়ে আবার জিজ্ঞেসা করে অনুপম।—বাণী কেন চলে গেল?

প্রতিভা—ভূতের ভয়ে।

অনুপম—এটা তাহলে একটা ভুতুড়ে বাড়ি?

প্রতিভা—হ্যাঁ।

অনুপম—মনে হচ্ছে, চৌধুরীবাড়ির মেজাজের তেজ কথা বলছে।

প্রতিভা—হ্যাঁ।

হেসে ফেলে অনুপম—ভুল করছো। খুব ভুল।

কথা বলে না প্রতিভা। হাতের ব্যাগটাকে বারান্দার মেজের উপর নামিয়ে রেখে দিয়েই অনুপম আবার হাসতে থাকে।—গুপ্তিপাড়ার চৌধুরীবাড়ি কিন্তু আর মেজাজের তেজ দেখাতে ভালবাসে না। তাহলে শোন, চিঠিটাকে একটু পড়েই শুনিয়ে দিচ্ছি।

চিমটি দিয়ে ধরে-রাখা তিন-চারটে চিঠির মধ্যে একটা চিঠির লেখা পড়তে থাকে অনুপম।—বড়লোকের বউকে এত করে লিখেও যখন কোন সাড়া পেলাম না, তখন তার বড়লোক স্বামীকেই লিখতে হচ্ছে। না লিখে পারলাম না। প্রতিভা না হয় সব ভুলে গিয়েছে, কিন্তু আপনি তো ভুলে থাকবার মত মানুষ নন। লোকের মুখে শুনছি, আপনার সাহায্যে স্কুল চলছে, হাসপাতাল চলছে। আপনি নিশ্চয় জানেন না যে, গুপ্তিপাড়ার এ-বাড়ির জীবন আর চলতে পারছে না। আমি কাল কলকাতায় যাচ্ছি, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবো। আশা করি, বিরক্ত হবেন না। ইতি......।

প্রতিভার মুখের দিকে তাকিয়ে অনুপম এইবার বেশ মৃদুস্বরে কথা বলে—ইতি কে, সেটা বুঝতে পারছো তো?

প্রতিভা—পারছি।

অনুপম—তবে চুপ করে থাক, খুশি হয়ে থাক।

প্রতিভা—না।

অনুপম—না? মনে হচ্ছে, বেশ তেজ করে কথা বলছো।

প্রতিভা—হ্যাঁ।

—একেবারে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যাবে এই তেজ।

—কখ্‌খনো না।

—আচ্ছা। তাহলে অপেক্ষায় থাক।

বারান্দার দেয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকায় অনুপম। তারপর নিজেরই হাত-ঘড়িটার দিকে তাকায়। তারপর বারান্দার শেষ প্রান্তের সিঁড়ি-মুখের দিকে তাকায়। তারপর হেসে ফেলে অনুপম, উৎসুক চোখের দৃষ্টিটাও হাসতে থাকে।—এই যে, তিনি এসেই গিয়েছেন।

প্রতিভাও দেখতে পায়, সুধার মা'র সঙ্গে কথা বলে বলে, লাল রবারের চটি পায়ে দিয়ে, আর দুই চোখে অদ্ভুত একটা চকচকে আকুলতা নিয়ে যিনি এগিয়ে আসছেন আর হাসছেন, তিনি গুপ্তিপাড়ার চৌধুরীবাড়ির বউ, প্রতিভারই রানু বউদি।

রানু বউদির পায়ের ওই লাল রবারের চটি নিশ্চয়ই আজকেরই কেনা একটি নতুন সংগ্রহ, একেবারে নতুন। কিন্তু গায়ের শাড়িটা বেশ পুরনো। পাড়ের জরি উসকো-খুসকো, আঁচলের গায়ে তিন জায়গায় মোটা সুতোর তিনটে সেলাই, খুব মিহি জমির একটা শান্তিপুরী। গলাতে কিছুই নেই: কানের ওদুটো জিনিসের মধ্যে সোনার একটা কুচিও নেই; দুটো বেলোয়ারী কানফুল।

কত রোগা হয়ে গিয়েছে রানু বউদি। প্রতিভার চোখ দুটো সব জ্বালা নিয়েও অপলক হয়ে দেখতে থাকে, কী খসখসে হয়ে গিয়েছে রানু বউদির সেই দুটো নরম হাত, যে হাত একটা শিশির সামান্য একটু আঁট ছিপি খুলতে গিয়ে চুপসে যেত, বার বার হাতে ফুঁ দিত রানু বউদি।

অনুপম বলে—আসুন।

রানু হাসতে চেষ্টা করে—এসেই গিয়েছি, তাই বলতে পারলেন, আসুন। আগে কিন্তু এই সামান্য একটা কথাও কেউ লিখে জানাতে পারেনি।

রানু যেন প্রতিভার মুখের দিকে তাকাতেই চায় না। এক পলকে একবার প্রতিভাকে দেখে নিয়েই আবার অনুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে রানু—টাটানগর থেকে লিখেছি, গুপ্তিপাড়া থেকে লিখেছি, কিন্তু ভুলেও একবার কেউ লিখলে না যে, একবার এস।

অনুপম—এখন যখন এসেই পড়েছেন, তখন পুরনো কথা ছেড়ে দিন।

রানু—আজই সকালবেলা কলকাতায় এসেছি। এসেই ভাবলাম......।

অনুপম—এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

রানু—সেজদার বাড়িতে, কালীঘাটে। আমি তো প্রতি মাসেই একবার করে কলকাতায় আসি। কিন্তু থাকবার তো উপায় নেই, সকালে এসে আবার বিকালেই গুপ্তিপাড়া ফিরে যেতে হয়।

অনুপম—কেন?

রানু—না যেয়ে উপায় তো নেই। একটা দশ বছরের বাচ্চা মেয়ে, একটা

ছ' বছরের বাচ্চা ছেলে, কার কাছে ওদের ফেলে রেখে কলকাতার হাওয়া খেতে পারি বলুন? সে ভদ্রলোক তো নিজেই পাগল। বলে-কয়ে বীণার মা'কে রাজি করাই, উনি দয়া করে দু' চারবার উঁকি দিয়ে দেখে যান বলেই আসা-যাওয়া করতে পারি। নইলে তা'ও পারতাম না। এখন তো সেজদাই ভরসা। সেজদা হাতে যা ধরিয়ে দেন, তাই নিয়ে আবার গুপ্তিপাড়া চলে যাই।

প্রতিভা হঠাৎ বলে ওঠে, যেন এতক্ষণের নীরব একটা মায়ার আশা হঠাৎ করুণ হয়ে কথা বলে ফেলেছে—মণ্টু আর টুলু আসেনি?

রানু এইবার প্রতিভার মুখের দিকে একটু স্পষ্ট করে তাকিয়ে জবাব দেয়।—না। ট্রেনে যাওয়া-আসা করতে পয়সা লাগে, প্রতিভা।

অনুপম—কিন্তু আপনার তো আজ গুপ্তিপাড়া ফিরে যাওয়া হবে না।

রানু—কেন?

অনুপম হাসে—আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না। আপনি এখানে থাকবেন।

রানুও হাসে—যাক্, আপনি তবু তো মুখ খুলে একটু বললেন। কিন্তু আমার থাকা সম্ভব নয়, অনুপমবাবু। আপনি বলেছেন, এই যথেষ্ট। আমি শুধু আপনাকে কয়েকটা কথা বলে......।

অনুপম—সব কথা শুনবো। কিন্তু আপনাকে আজ চলে যেতে দেওয়া হবে না। আপনি বরং এখনই......।

রানু—বলুন।

অনুপম—এখনই আমার সঙ্গে একবার বের হতে পারবেন?

রানু—কোথায়?

অনুপম—চলুন, মার্কেটে ঘুরে আসি।

রানু—আর মার্কেট? কতবার ভেবেছি, এবার মণ্টুর জন্যে একটা সিল্কের ফ্রক নিয়ে যাব, কিন্তু......ভাবলেই কি স্বপ্ন সত্য হয়ে যায়? হয় না।

অনুপম—চলুন। ওসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনার আজ আর মন খারাপ করা উচিত নয়।

রানু—ফিরতে কত সময় লাগবে?

অনুপম হাসে—মণ্টুর জন্যে একটা সিল্কের ফ্রক কিনতে যতটুকু সময় লাগবে।

রানুর দুই চোখের চকচকে বিস্ময় যেন নিবিড় হয়ে টলমল করে।—সত্যি, কাছে না এলে মানুষকে চেনা যায় না। আপনাকে কী ভেবেছিলাম, আর কী দেখলাম।

অনুপম—কী ভেবেছিলেন?

রানু—ভেবেছিলাম, এত বড় একজন গণ্যমান্য বড়লোক মানুষ, ভাগ্যবান মানুষ, লোকের মুখে যার সুনামের এত হাঁকডাক, তিনি কি আমার মত

মানুষের দুটো কথা সত্যিই ধৈর্য ধরে শুনবেন?

চামড়ার ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে অনুপম—চলুন।

প্রতিভার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই অনুপমের দিকে তাকায় রানু।—হ্যাঁ, চলুন।

প্রতিভা ডাকে—বউদি।

অনুপম হাসে—পিছু ডাকতে নেই।

প্রতিভা—দাদা এখন কেমন আছে, বউদি?

রানু—একটুও ভাল নয়। মাঝে একদিন......।

অনুপম—চলুন চলুন, সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

রানু—হ্যাঁ চলুন।

প্রতিভা—টুলু কি খুব দুষ্টু হয়েছে?

রানু—আর বলো না! একদিন একটা বেড়ালের লেজ ধরে......।

অনুপম—এবার চলুন। চলতে থাকে অনুপম।

—হ্যাঁ, চলুন। রানুও চলতে থাকে।

প্রতিভার বুকের ভিতরের চিৎকারটা বোবা হয়ে শুধু ছটফট করে। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে প্রতিভা। তাড়াতাড়ি পা ফেলে ফেলে, যেন অনুপম রায়ের হাসির শব্দের সঙ্গে তাল রেখে রেখে হেঁটে চলে যাচ্ছে একজোড়া লাল-রঙের চটি।

রানু বউদিকে একবার জিজ্ঞেস করলে হতো, মনে পড়ে তো, একদিন লুকোচুরি খেলতে গিয়ে কী দশা হয়েছিল তোমার? রানু বউদি তখন নতুন বউ; মা তখন রানু বউদিকে কোন কাজই করতে দিতেন না।

সন্ধ্যা হলেই, দাদা যখন বাইরে বের হতো, তখন সেই নতুন বউ নিজেই এসে প্রতিভার কাছে চুপি-চুপি বলতো, লুকোচুরি খেলবে? হ্যাঁ খেলবো। তবে লুকোই? হ্যাঁ; ধরতে পারলে কিন্তু এক কিল। বেশ।

রানু বউদিকে ধরে ফেলতে কিন্তু এক মিনিটও সময় লাগেনি। একটা পুরনো মাদুর গায়ে জড়িয়ে ঘরের এক কোণের দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নিয়ে, তখুনি বাবা-গো বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল আর ধরা পড়ে গিয়েছিল সেই রানু বউদি। মস্ত বড় একটা মাকড়সা রানু বউদির মুখের উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল। লুকোচুরি খেলতে সাহস করে, কিন্তু পারে না, সেই রানু বউদি আজ......।

যাই হোক, প্রতিভার জীবন রোজ এ সময় যেভাবে চলে, ঠিক সেভাবেই চলতে থাকে। দুপুর গেল। বিকেলও প্রায় শেষ হতে চললো। বিছানার উপর শুয়ে, আর, একটা মিথ্যে ঘুমের সঙ্গে উসখুস করে, বার বার টেবিলের ঘড়িটার দিকে তাকাতেও হলো। রানু বউদি কি এখনও ফিরে আসেনি?

ঘরের বাইরে এসে, তারপর বারান্দার শেষে সিঁড়ির মুখের কাছে এসে দাঁড়ায় প্রতিভা। তারপর দোতলাতে নেমে একটানা বারান্দার পাশে একটা ঘরের দরজার দিকে তাকায়; সে ঘরের খোলা দরজা দিয়ে রঙীন সিল্কের পর্দা ফুর-ফুর করে উড়ছে। না, আর সন্দেহ নেই, ভয়ানক ভুতুড়ে তামাসার নিশান উড়ছে।

ঘরের দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় প্রতিভা—কখন ফিরে এলে বউদি?

রানু—অনেকক্ষণ।

প্রতিভা—খাওয়া হয়ে গেছে নিশ্চয়।

—হয়েছে। তুমি অবিশ্যি একটু খোঁজ নিতেও ভুলে গিয়েছ।

—কখন্ খেলে?

—এই তো, ঘণ্টাখানেক হলো। অনুপমবাবু যখন খেলেন, তখন।

—নীচের খাবার ঘরের টেবিলে?

—হ্যাঁ।

—তুমি কি আজ এখানে থেকে যাবে ঠিক করেছো?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কালীঘাটে খবরটা জানিয়েছো কি? ওঁরা কি চিন্তা করবেন না?

—খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কথা বলছে রানু, প্রতিভার সব কথারই জবাব দিয়েও চলেছে, কিন্তু রানুর চোখ দুটো আর হাত দুটোও সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে অন্য একটা কাজও করছে। একটা নতুন-কেনা বাস্কেটের ভিতরে জিনিস ভরছে রানু; মাঝে মাঝে জিনিস-গুলিকে এক-এক করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন গুণেও নিচ্ছে। বেবি-ফুড, চা, জেলি, বিস্কুটের টিন, চকোলেটের প্যাকেট, মিছরি, মশলা, কিসমিস, বেদানা, মাখন...।

ঘরের টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে বড় বড় প্যাকেট; প্যাকেটের গায়ে লেখা দেখেই বোঝা যায়, এগুলো জামা-কাপড়ের প্যাকেট।

বিছানার উপরে পড়ে রয়েছে একটা বই। ঘরের ভিতরে ঢুকেই বইটাকে হাতে তুলে নেয় প্রতিভা। গয়নার দোকানের বই, গয়নার ছবিতে ভরা। একটা নেকলেসের ছবির কাছে লাল পেন্সিলের একটা দাগ হেসে রয়েছে।

হেসে ফেলে প্রতিভা।—এর চেয়ে আর একটু ভাল প্যাটার্নের নেকলেস পেলে না?

—অ্যাঁ? কী বললে? হ্যাঁ, ছিল হয়তো; কিন্তু ওটাই আমার পছন্দ হলো।

—জিনিসটা দেখি, একবার।

—অনুপমবাবু পরে নিয়ে আসবেন।

—তাই বল।

—মণ্টুর জন্যে দুল কেনোনি?

—কিনেছি।

—দেখি।

—তোমাকেও আবার দেখাতে হবে নাকি ? তা হলে তো আবার বাস্কেটের সব জিনিস তুলে নিয়ে তলা থেকে ডিবেটাকে বের করতে হয়।

—তা হলে থাক। যাক; কিন্তু ভদ্রলোকের কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় না করে নিলে তো চলবে না। টাকা চেয়েছো?

—চাইনি।

—না চাইলেও ভদ্রলোকের নিজের থেকেই দেওয়া উচিত ছিল।

—নিজেই বলেছেন। এখন তিন'শো টাকা দেবেন।

—মাত্র তিন'শো।

—এখন তিন'শো, পরে দরকার হলে আর লিখলে আরও যা পারেন পাঠিয়ে দেবেন।

—টাকা আর নেকলেস এখনও হাতে পাওনি?

—না।

—কিন্তু কখন্ পাবে?

—অনুপমবাবু বলেছেন, ফিরতে একটু রাত হতে পারে। যখনই ফিরে আসুন না কেন, নিজেই এসে আমার হাতে দিয়ে যাবেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে প্রতিভা। রানুর হাতের ব্যস্ততাও সব কাজ শেষ করে আর বাস্কেটের ডালা বন্ধ করে এইবার একটু স্বস্তি বোধ করবার সুযোগ পায়।

প্রতিভা—দু-একটা কথা বল, বউদি। এত চুপ করে বসে থাকা কি ভাল দেখায়?

রানু—তুমিই বল, আমি শুনি।

প্রতিভা—তোমার কি কিছু বলবার নেই।

রানু—কিছু মনে করো না, প্রতিভা। তোমাকে কোন কথা বলেও তো কোন লাভ নেই।

রানুর মুখটাকে যেন একটু ভাল করে দেখতে চায় প্রতিভা, তাই দুই ভুরু টান করে তাকিয়ে থাকে। আর রানু যেন নিজেরই সঙ্গে কথা বলে—সন্ধ্যা হয়ে এল।

প্রতিভা—তোমার ভয় করছে না, বউদি?

রানু—কিসের ভয়?

—সন্ধ্যা হয়ে এল যে!

—তাতে ভয় কিসের?

—কিন্তু গুপ্তিপাড়াতে তো সন্ধ্যে হতেই তোমার খুব ভয়-ভয় করতো।

—এখনও করে। কিন্তু এখানে তো ভয়-ভয় করবার কিছু নেই।

প্রতিভা হাসে—হ্যাঁ, এখানে বাদুড় ওড়ে না, ঝিঁঝি ডাকে না, চালতে গাছের মরা ডালে পেঁচা বসে না, কলাগাছের কাছে কালোছায়ার হাত দোলে না।

রানুও হাসে—তবে?

প্রতিভা—তোমার হাসতে লজ্জা করছে না?

রানুর গলার স্বরও বেশ শক্ত হয়ে জবাব দেয়—না।

প্রতিভা—তোমার এখানে আসতে একটুও লজ্জা হলো না?

—না।

—তুমি এখনই চলে যাও।

—তোমার মুখ থেকে একথা শুনতে পাব বলে তৈরী হয়েই এসেছি।

—তোমাকে এখনই যেতে হবে।

—না। তোমার বাড়ি নয় যে, তোমার হুকুমে চলে যাব।

মেজের উপর ধুপ করে বসে পড়ে প্রতিভা, দুই হাত দিয়ে শক্ত করে রানুর দুই পা জড়িয়ে ধরে—চলে যাও, বউদি।

—এ কি? চমকে ওঠে রানু। রানুর দু' চোখে ভয়ানক একটা আশ্চর্যের ভয়ও যেন গুমরে উঠেছে, তাই কাঁপতে থাকে একটা অদ্ভুত অন্ধ-অন্ধ দৃষ্টি।

প্রতিভা—তুমি কি আমাকে দেখেও কিছুই বুঝতে পারলে না?

এইবার রানুর দুই চোখ যেন নিষ্পলক দুটো নির্বোধ যন্ত্রণার মত স্তব্ধ হয়ে দেখতে থাকে; প্রতিভার হাতে সেই রুলি, আর কানে সেই দুল, গুপ্তি-পাড়ার মধু স্যাকরাকে মাত্র পাঁচ ভরি সোনা দিয়ে যে দুটো জিনিস তৈরী করানো হয়েছিল। দাদার ভাগ্যের মত বোনের ভাগ্যটাও কি পাগল হয়ে গিয়েছে? প্রতিভা কি শ্মশানের ছাই গায়ে মেখে ত্রিবেণীর সেই ক্ষেপী তুলসীর মত গাছতলায় পড়ে রয়েছে?

রানুর গলার স্বর কেঁপে কেঁপে কথা বলে—ঠিক বুঝতে পারছি না, প্রতিভা। কিন্তু ভয় করছে।

প্রতিভা—এটা একটা ভুতুড়ে বাড়ি, বউদি।

প্রতিভার হাত দুটো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রানুর রোগা শরীরটা যেন কাঠ হয়ে যায়।

প্রতিভা—ঠিক মাঝরাতে ভূত এসে তোমার ঘরের দরজায় টোকা দেবে। সে ভূত একটা সুড়ঙ্গের অন্ধকারের ভিতর থেকে চুরি করে গাদা-গাদা টাকা আনে। সে ভূত ঘরের বাইরে বক্তৃতা করে আর মানপত্র পায়। আর, ঘরের ভিতরে মানুষ পেলেই তাকে ঘাড় মটকে মেরে ফেলতে চায়। তুমি এখনই চলে যাও। শিগগির যাও।

—যাচ্ছি। এখনই যাচ্ছি। প্রতিভার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে রানু।

প্রতিভা—দেরি করো না, বউদি। রাস্তা থেকে একটা রিকশা ডেকে নিয়ে কালীঘাটে চলে যাও।

—যাচ্ছি। কিন্তু...।

—কী?

—তুমিও চল।

—যাব ঠিকই; কিন্তু আজ নয়।

প্রতিভার হাত ছেড়ে দিয়ে আর পুরনো শাড়ির সেলাই-করা আঁচল তুলে চোখ মুছে নেয় রানু। তারপর আর একটি কথাও না বলে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়। না, আর মুখ ফিরিয়ে প্রতিভাকে আর-একবার দেখে নেবার চেষ্টা করে না রানু। শুধু প্রতিভা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, লাল রবারের একজোড়া চটি ধড়ফড় করে নীচের সিঁড়িতে নেমে গেল।

অনুপম রায়ের বুকটা নিশ্চয় দুর্দান্ত সাহসে ভরাট একটা চমৎকার ভাগ্যের বুক। সেই সাহসও বোধহয় মরুভূমির ঘোড়া। বাধা পেলে আরও দুরন্ত হয়ে ছুটতে থাকে।

একটা বোর্ড আছে; সে বোর্ড দেশের সমাজজীবনের উন্নতির নানারকমের সেবা সাহায্য ও কল্যাণের কাজ করবার ক্ষমতা পেয়েছে। ক্ষমতা দিয়েছেন সরকার; টাকাও দিয়ে থাকেন সরকার। এই বোর্ডের তিন বছরের চেয়ারম্যান এন সি সেন যে এবছরেও আবার চেয়ারম্যান হয়ে যাবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। এন সি সেনের মত মানুষের পক্ষে বোর্ডের সব মেম্বারের শ্রদ্ধা আর সমর্থন আছে। কিন্তু অনুপম রায়ের আশা সেজন্য একটুও ভয় পায়নি। অনুপম রায় শুধু একটি মাস ঘোরাঘুরি আর ছুটোছুটি করেছে। দশজন মেম্বারের ছ'জনকে এক এক করে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে এই বাড়ির ওই কাজের ঘরে বসিয়েছে; তারপর কাজের কথা হয়েছে।

তারপর একদিন এই কাজের ঘরের ভিতরে বসেই টেলিফোনের বার্তা পেয়ে হেসে উঠেছে অনুপম রায়; বোর্ডের চেয়ারম্যান ইলেকশন হয়ে গেল। এন সি সেন হেরে গিয়েছেন, জয়ী হয়েছেন অনুপম। আজ থেকে বোর্ডের হাজার হাজার টাকার দাতব্যের খাতায় নাম সই করবেন নতুন চেয়ারম্যান অনুপম রায়।

কাজের ঘরের দরজায় সবুজ ভেলভেটের পর্দা দোলে। ঘরের ভিতরে চারটে আলো জ্বলে, দুটো পাখা ঘোরে। সকাল-সন্ধ্যা যখন-তখন চন্দ্রবাবু

আর সূর্যবাবুও এসে পড়েন। কাজের ঘরের জীবন যেভাবে এতদিন চলে এসেছে, সেভাবেই চলছে। জয়ের গুঞ্জন আর খুশি-হাসির হঠাৎ-কলরব একটুও ক্লান্ত হয়নি, হয়ও না।

কিন্তু অনেক রাতে তেতলার সিঁড়ি ধরে যখন আস্তে আস্তে দু'পায়ের নাগরা-চটি ঘষে ঘষে উপরে উঠতে থাকে অনুপম, তখন যেন আচম্‌কা একটা হোঁচট খায়। জ্বলে ওঠে অনুপম রায়ের মাথার ঘিলু, সেই সঙ্গে গায়ের সব রক্ত।

আর, তেতলার দরজা-বন্ধ একটা ঘরের ভিতরে তখন বিছানার উপর শুয়ে পড়ে থেকে প্রতিভা রায়ের বিনা-ঘুমের প্রাণটা আশ্চর্য হয়ে ভাবে—আর কেন এভাবে পড়ে থাকা! এবার চলে গেলেই তো হয়।

সেই সেদিন সকাল হতেই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল অনুপম—তোমার রানু বউদি হঠাৎ না বলে-কয়ে সব কিছু ফেলে রেখে দিয়ে একটা হঠাৎ-পাগল গাধার মত চলে গেল কেন?

প্রতিভা—ভূতের ভয়ে।

অনুপম—তাই বল!

প্রতিভা—একটা কথা বলবার ছিল।

অনুপম—কী কথা?

প্রতিভা—তুমি আমার ঘরের দরজাতে কখ্‌খনো টোকা দেবে না।

অনুপম রায়ের কপালের সম্মানিত সুখের রেখাটা যেন শিউরে গিয়ে নীল হয়ে যায়।—কেন?

প্রতিভা—আমি দরজা খুলবো না।

—আমি দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবো।

—আমি তখুনি ঘর ছেড়ে বের হয়ে যাব।

—এত সাহস আছে তোমার?

—আছে।

—তবে তোমার রানু বউদির আঁচল ধরে গুপ্তিপাড়া চলে গেলে না কেন? এখানে পড়ে আছ কেন?

—আমার ইচ্ছে।

হেসে ফেলে অনুপম।—তাই বল!

চলে গেল অনুপম।

তেতলার সারা বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ে সকালবেলার রোদ হাসছে। এক হাতে চামড়ার ব্যাগ, আর-এক হাতে রুপোর চেনে ঝোলানো চাবি দোলাতে দোলাতে সেদিন যেমন চলে গিয়েছিল অনুপম, রোজই তেমনি চলে যেতে পারে। অনুপমের মনটাও হাসে, দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতরে বসে রয়েছেন অদ্ভুত

এক কাঙাল অভিমান। অনেকদিন ঘরের দরজায় টোকার শব্দ বাজেনি, তাই রাগ হয়েছে। সে আবার ওই টোকার শব্দেরই ওপর রাগ দেখায়।

কিন্তু অনেক রাতে যখন আবার তেতলার এই সিঁড়ি ধরেই উপরে উঠতে হয়, তখন যেন একটা ঠোকর খায় অনুপম। নাগরাচটি দুমড়ে যায়। টিকটিকিটাও শব্দ করে ডেকে ওঠে। বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান অনুপম রায়কে টিটকারি দিচ্ছে, অনুপম রায়ের নিজেরই ঘর। তবে কি টিকটিকির ভয়ে পা টিপে টিপে হাঁটতে হবে? না, সহ্য করা অসম্ভব।

প্রতিভা রায়ের এই মিছে পড়ে থাকা জীবনেও কোথাও যেন একটা ছটফট পিপাসা লুকিয়ে আছে। প্রায় একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে প্রতিভার সন্ধ্যা-বেলার একটা হঠাৎ-ব্যস্ততা, প্রতিভার প্রাণেরই একটা বাতিক।

সারা বিকেল ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই ধড়ফড় করে জেগে উঠবে, দরজা খুলবে; আর, বারান্দায় রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাবে। ছটফট করে যেন একটা পূর্ণিমা দেখতে চাইছে প্রতিভার দুই চোখ। সুধার মা যখন চা নিয়ে আসে, তখন সত্যিই চমকে ওঠে প্রতিভা।—কে? ও, তুমি সুধার মা।

সুধার মা হাসে—এমন কিছু গভীর আঁধার তো এখনও হয়নি, বউদি, তবু তুমি যেন আমাকে দেখে চিনতেই পারলে না।

প্রতিভাও হাসে—যার চোখেই আঁধার, সে অত তাড়াতাড়ি চিনতে পারে না।

সুধার মা—ষাট, তোমার চোখ আঁধার হবে কেন? মাণিকের আলো নিয়ে চিরকাল হেসে থাকুক তোমার চোখ।

বারান্দার আলো জেবলে দিয়ে চলে যায় সুধার মা।

একদিন সন্ধ্যায় প্রতিভার প্রাণের বাতিকটা যেন হঠাৎ ছটফট করে জিজ্ঞেস করেই ফেলে, আজ কী তিথি, সুধার মা?

কিন্তু সুধার মা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। আনমনা প্রতিভার চোখ দুটো দেখতেই ভুলে গিয়েছে, চা রেখে দিয়ে কখন্ নীচে চলে গেল সুধার মা।

আবার আনমনার মত আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ায় প্রতিভা। বারান্দার এদিক থেকে ওদিক। বুকের ভিতরের একটা অশান্ত নিঃশ্বাস আজ আর কিছুতেই শান্ত হতে পারছে না। সেগুন কাঠের সিংহ-আয়নার কাছে এসে দাঁড়িয়ে উপরের ঘড়িটার দিকে একবার তাকায় প্রতিভা।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। চমকে ওঠে প্রতিভা। চোখ তুলে তাকায়। কে? কে এল? কে ও?

সাদা পাঞ্জাবী, সাদা চাদর, অনুপম রায়ের ধবধবে মূর্তিটা সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠে, প্রতিভার কাছে এসে দাঁড়ায়।

অনুপমের মুখের হাসিটাও বেশ ধবধবে।—তোমাকেই বলে যাবার জন্য

এলাম। ভবতোষবাবুর বাড়িটা আমিই কিনবো বলে ঠিক করে ফেলেছি, তোমারই নামে ওটা কেনা হবে।

প্রতিভার উদাস চোখ আর নীরব মুখে কোন সাড়া নেই। কিন্তু অনুপমের মুখের হাসি আর ভাষা হঠাৎ একেবারে মৃদু হয়ে ফিস-ফিস করে।—খুব রাগ হয়েছে, তাই না? কিন্তু খুব ভুল বুঝেছো। আমি আজ রাতে তোমার ঘরে যাব। অনেক কথা আছে।

গায়ের চাদরটাকে টেনেটুনে একটু আলগা করে নিয়েই অনুপম বলে—আজ আমাকে এখন..... এখনও অবশ্য অনেক সময় আছে, একবার বের হতে হবে। ওরা একটা সভা করে আমাকে সম্মান জানাবে; আমি যে জিতেছি, প্রতিভা।

রামপ্রসাদ এসে বলে—মাস্টারমশাই অজয়বাবু এসেছেন।

—এসেছেন! প্রতিভার উদাস চোখ যেন ঘুম-ভাঙা পাখির মত খোলা বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে আর খোলা আকাশের আলো দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে নেচে উঠেছে। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে চলে যায় প্রতিভা।

ড্রইং-রুমের পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে প্রতিভার বুকের ভিতর থেকে যেন অনেক দিনের একটা ছটফটে অপেক্ষার বন্ধ যন্ত্রণা মুখভরা হাসি হয়ে উথলে ওঠে।—এসেছেন তবে?

অজয়—আসতেই তো হতো। এই নিন, বাকি দশ টাকা।

প্রতিভা—দেনা শোধ।

অজয় হাসে—দেনা শোধ নয়; টাকা শোধ।

প্রতিভা—এতদিনে যে কথা কখনও মনে হয়নি, আজ সে কথা, এই এখুনি, আপনি আসতেই মনে হয়ে গেল। আমি আগে বুঝতেই পারিনি যে, আপনার অপেক্ষায় বসে আছি। কিন্তু আপনি আসতে বড় দেরি করে দিলেন।

—হ্যাঁ, দেরি হয়েই গেল।

—আমার কথা রেখেছেন তো?

—নিশ্চয়। আমাকে দেখে এতক্ষণে আপনার সেটা বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।

—হ্যাঁ, আপনার শরীর অনেক ভাল হয়েছে। আরও ভাল হবে, যদি আমার কথাটা ভুলে না যান।

—না, ভুলে যাব না, এতদিনেও যখন ভুলিনি।

—আমাকে ভুলে যাবেন নিশ্চয়।

—না।

—কেন?

—না না, সম্ভব নয়। এতে আবার 'কেন' কিসের?

—আমাকে মনে করে রেখে আপনার কী লাভ?

—মনে করে রাখাই তো একমাত্র লাভ, আর সব ফাঁকি।

—তার মানে?

—তার মানে, কাছে পেয়েই বা কী লাভ, যদি মনের মধ্যে পেতে না পারি।

—খুব ইচ্ছে করে, অজয়বাবু, আপনার কাছে চলে যাই।

—আপনি...কী আশ্চর্য...আপনি এ কথা বলছেন?

—হ্যাঁ, আমিই বলছি, আমি প্রতিভা, যার নাম আভা হলে আরও ভাল হতো। ইচ্ছে করে, এখুনি দৌড়ে গিয়ে আপনার একলা ঘরের বিছানাতে লুটিয়ে পড়ি।

—আপনি আমাকে আর বেশি আশ্চর্য করে দেবেন না। সহ্য করতে পারবো না।

—যদি যাই, তবে আমার জন্যেও নটে চাঁপা আনবেন তো?

—আনবো।

—বাস্, তাহলেই হলো, আর কিছু চাই না।

সাদা ধবধবে সাজ, যে অনুপম রায় এতক্ষণ ড্রইং-রুমের দরজার কাছে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে আছে, সে এইবার দরজার পর্দাটাকে এক হাতে খিমচে ধরে আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু হাতটা, সেই সঙ্গে হাতঘড়িটা যেন শীতভীরু, বুড়ো রোগীর হাতের মত থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। চুপসে গিয়েছে অনুপম রায়ের ভরাট মুখটা, চোয়ালটাও নড়বড় করছে, তাই চুরুটটাও মুখ ফসকে টুপ করে মেঝের উপর পড়ে যায় আর গড়াতে থাকে। যেন মরুভূমির ঘোড়ার সাহস মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছে।

অফিস-ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সেক্রেটারী পুলকবাবু চেঁচিয়ে কথা বলে—আপনি এখনও কেন দাঁড়িয়ে আছেন স্যার? আর দেরি করবেন না। ওরা বার বার টেলিফোন করে বলছে, সময় হয়ে গিয়েছে।

গেটটা যে সত্যিই খোলা। গেটের তালার চাবি আছে যার কাছে, সে বীর-বাহাদুর এখন কোথায়? কে তাকে ডাকবে? গেট বন্ধ করবে কে? ওদের আটক করে ধরে রাখবে কে? গেট বন্ধ করলেই বা কি? ফুর্তির ফড়িংয়ের মত বাগবাজারের সন্ধ্যার এই ধোঁয়াটে হাওয়াতেও ওরা ফুরফুর করে উড়ে চলে যেতে পারে।

খোলা গেটের সামনে রাস্তার উপর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এক ভদ্রলোক ওই গাড়ির কাছ থেকে খুব ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসেন আর চেঁচিয়ে ডাক দেন—বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছে, স্যার।

খিমচে-ধরা পর্দাটাকে ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে সাদা ধবধবে রুমাল বের করে কপালটাকে মুছতে থাকে অনুপম। কিন্তু কাঁপা হাতের ছোঁয়া লেগে

কপালটাও কাঁপতে থাকে। হ্যাঁ, যেতে হবে। ঘাড় টান করে ঝুঁকে পড়া চেহারা-টাকে একটু সোজা করে দাঁড় করায় অনুপম। আর, আবার দুই কানের সব আবেগ সচকিত করে এই ভয়ানক মতলবের ঘরের ভাষা শুনতে চেষ্টা করে।

দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠেছে প্রতিভা।—কিন্তু এ জন্মে আর হবে না, অজয়বাবু।

অজয়—কী?

প্রতিভা—আপনার কাছে যাওয়া আর হলো না।

অজয়—তাতে কী হয়েছে? কিছুছু আসে যায় না। আপনি কাঁদবেন না।

পর্দার বাইরের ধবধবে সাজের অনুপমের চুপসে-যাওয়া মুখটা হঠাৎ ভরাট হয়ে যায়, আর হেসে ফেলে—তাই বল! যাবে না; যাবার সাহস নেই, ইচ্ছেও নেই। গুপ্তপ্রেমের বুদ্ধিটা খুব পাকা।

গেটের কাছে গাড়িটা উতলা হয়ে বার বার হর্ন বাজাতে থাকে। এগিয়ে. যায় অনুপম, আর চলতে চলতেই হাত তুলে ইসারা করে—যাচ্ছি।

চোখ মুছে ফেলে প্রতিভা, হেসেও ফেলে—আর তো আপনার কাছে আমার টাকার পাওনা নেই। সবই তো আজ শোধ হয়ে গেল।

অজয়—হ্যাঁ।

প্রতিভা—তার মানে, আপনি আর আসবেন না।

অজয়—আপনি বললেই আসবো, আপনি ডাকলেই আসবো।

প্রতিভা—না, অজয়বাবু। ক্ষমা করুন। আপনি আর আসবেন না।

অজয়—বেশ তো, তাই হবে। তাতে কী আসে যায়?

উঠে দাঁড়ায় প্রতিভা। প্রতিভার দুই চোখ হেসে হেসে, যেন শেষবারের মত শুকতারার আভা ফুটিয়ে নিয়ে অজয়কে একবার দেখে নেয়।—যাই অজয়-বাবু, নমস্কার।

—হ্যাঁ, আমিও যাই।

চলে গেল অজয়। ঘরের ভিতরে একা হয়ে শুধু একটা মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিভা। না, অজয়ের পায়ের শব্দ আর শোনা যায় না। দরজার পর্দা হাতের এক ঠেলায় সরিয়ে দিয়ে আর হেসে হেসে হাঁটতে থাকে প্রতিভা।

—যাই, সুধার মা। প্রতিভার ডাক শুনেই রামায়ণ পড়ায় ব্যস্ত চোখ দুটোকে তুলে নিয়ে সুধার মা তাকায়—এস।

এইবার সিঁড়ি। ছেঁড়া কাগজে ভরতি একটা ঝুড়ি হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছে রামপ্রসাদ।

—যাই রামপ্রসাদ। ডাক দেয় প্রতিভা। রামপ্রসাদ হাসে—হ্যাঁ মা, আসুন।

সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে প্রতিভা। দোতলার বারান্দাতে টবের

ফুলের ঝরাপাতা ঝাড়ু দিয়ে জড়ো করছে দুর্গাবালা।

—যাই দুর্গাবালা। ডাক দেয় প্রতিভা।

—আসুন মা, আসুন। ব্যস্তভাবে সাড়া দিয়ে হেসে ফেলে দুর্গাবালা।

এইবার তেতলার বারান্দা। প্রতিভার প্রাণে হাসি, তাই মনে হয়, সেগুন কাঠের সিংহ-আয়নার মাথার উপরে ওই ঘড়িটার শব্দের মধ্যেও একটা নতুন হাসির শব্দ টিক্ টিক্ করে বাজছে। ঘড়িটার দিকে একবার তাকায় প্রতিভা। এখনও মাত্র সাড়ে ছ'টা। গঙ্গার হাওয়া বইতে শুরু করবে কখন্?

সেগুন কাঠের সিংহ-আয়নার মাথার উপরে ওই ঘড়িটা মাসের মধ্যে অন্তত একবার হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে যায়, যেন একটা অফুরান হয়রানির জীবনের হঠাৎ-অভিমান। কবে কখন্ কোন্ সময়ে যে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাবে, তার কোন ঠিক নেই, নিয়মও নেই। গত মাসে সকাল বেলাতেই দেখা গিয়েছে, দেড়টার ঘরে কাঁটা থামিয়ে রেখে চুপ করে রয়েছে ঘড়িটা। রামপ্রসাদ খবর দেয়, তাই দীনুবাবু এসে দম দিয়ে আর কাঁটা ঘুরিয়ে ঘড়িটাকে ঠিক সময়ের তালের সঙ্গে চালিয়ে দিয়ে চলে যান।

আজ রাতে যখন ঠিক সাড়ে দশটার ঘরে কাঁটা থামিয়ে দিয়ে চুপ করে গেল ঘড়িটা, তখন নীচের তলার কাজের ঘরের গুঞ্জন সামান্য একটু মৃদু হয়ে এসেছে। সূর্যবাবু, যিনি খুবই জোরে চেঁচিয়ে হাসেন, তিনি একটু আগেই চলে গিয়েছেন। শুধু আছেন চন্দ্রবাবু, আর, সেই যে প্রায় আট বছর আগে একবার অনুপমের এই কাজের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হেসেছিল, সেই কুলদা পণ্ডিতও বসে আছেন। কুলদা পণ্ডিতের সেই স্নিগ্ধ চেহারা আর নেই। রোগে ভুগে ভুগে শুকনো ঝিরঝিরে হয়ে গিয়েছে। চিমসে গলাটার শিরাগুলি ফুলে যেন জট পাকিয়ে রয়েছে।

কুলদা পণ্ডিত হাসেন—এবার আমাকে উঠতে আজ্ঞা করুন।

অনুপম—আচ্ছা।

কুলদা পণ্ডিত—আজ তো আমি আপনার কাছে অন্তত এক হাজার এক টাকা আশা করতে পারি।

কুলদা পণ্ডিতের মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকে অনুপম। কানের কাছে একটা অন্ধ উল্‌কি পোকা ফুরফুর করে উড়ছে, তবু মাথাটা একটু সরিয়ে নিতেও ভুলে যায় অনুপম।

চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই হেসে ফেলে অনুপম;

শান্ত লাজুক ও খুশিঘন একটা হাসি।—পণ্ডিত মশাই আমাকে কী অদ্ভুত লজ্জায় ফেললেন, দেখুন তো চন্দ্রদা।

চন্দ্রবাবু—কিন্তু পণ্ডিত মশাই যে সত্যিই তোমার কাছে একটু বেশি দক্ষিণা দাবি করতেই পারে, তাতে তো কোন ভুল নেই।

অনুপম—না, তাতে অবশ্য কোন ভুল নেই।......আচ্ছা, আপনি কষ্ট করে কাল একবার আসুন পণ্ডিত মশাই।

—আসি তাহলে। খুশি হয়ে চলে যান কুলদা পণ্ডিত।

—আমিও এবার উঠি। চলে গেলেন চন্দ্রবাবু।

চন্দন কাঠের ফ্রেম আর কাঁচ দিয়ে বাঁধানো মানপত্রটাকে হাতে নিয়ে একা-একা সবুজ ভেলভেটের পর্দার বাইরে এসে হাতঘড়ির দিকে যখন তাকায় অনুপম, তখন নীচের তলাও প্রায় নিঝুম হয়ে এসেছে।

—রাজুলু, আমি আজ খাব না। খাবার ঘরের দরজার কাছে এসে কথাটা বলে দিয়েই এগিয়ে যায় অনুপম।

সিঁড়ি ধরে এক ধাপ উঠেই থমকে দাঁড়ায় অনুপম! বুকের ভিতরে যেন বাঘের দাঁত কড়মড় করে শব্দ করে বেজে উঠেছে। কৈফিয়ত চাই। আমাকে ছেড়ে অজয়কে? কেন? কিসের জন্য? কী কৈফিয়ত দিতে পারবে তুমি?

দোতলার বারান্দাতে উঠে আবার থমকে দাঁড়ায় অনুপম। ছুরি নয়, পিস্তল নয়, এক হাতে শুধু চন্দন কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো মানপত্র; অনুপমের হাতটা যেন খুনীর হাতিয়ার আঁকড়ে ধরে রয়েছে। এরই একটি আঘাত মাথার উপর আছড়ে দিলে গুপ্তিপাড়ার ওই শক্ত খোঁপা রক্তে ভিজে যাবে।

লাফ দিয়ে দিয়ে এক-একটা সিঁড়ি পার হয়ে উঠতে থাকে অনুপম। গুপ্তিপাড়ার মেয়ের রক্তে ভেল্‌কি, মুখে মেজাজ। আজ একবার দেখতে চাই, সে-মেজাজ কেমন করে মুখ তোলে আর কথা বলে।

তেতলার বারান্দা। অনুপমের নিঃশ্বাসের জ্বালাটাও যেন শব্দ করে বাজছে। কাঁদলে চলবে না, পা জড়িয়ে ধরলেও চলবে না। আগে কৈফিয়ত চাই। রেহাই নেই তোমার। দরজা না খুলে দাও তো লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলবো।

ঘরের দরজার কাছে ছুটে এসেই অনুপমের আক্রোশের মূর্তিটা থমকে গিয়ে টলমল করে। দরজাটা খোলা। ঘরের ভিতরে আলো। আর......।

অনুপমের হাত থেকে চন্দন কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো মানপত্রটা ফসকে পড়ে যায়, বারান্দার রঙীন মোজেয়িক যেন শব্দ করে কঁকিয়ে ওঠে, কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে।

বিছানার উপরে নয়, ঘরের মেজের উপরে একটা হাতের উপর মাথা রেখে

ঘুমিয়ে পড়ে আছে প্রতিভা। অনুপমের দুই চোখের তারা দুটো যেন ফোস্কা হয়ে ফুলে ওঠে আর দেখতে থাকে, হ্যাঁ, ঘুম, সাংঘাতিক ঘুম। মেজের উপর পড়ে রয়েছে ওটা কিসের শিশি? হ্যাঁ, ঘুমের বড়ির শিশি।...এই, কে আছ, ডাক্তার বোলাও। চেঁচিয়ে ওঠে অনুপম।

কী অদ্ভুত চিৎকার! যেন ঘাড়-মটকানো শকুনের ভীরু মিনমিনে স্বরের একটা শিহর। ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলি মাড়িয়ে মাড়িয়ে কাঁপতে থাকে অনুপম রায়ের দুর্দান্ত সাহসের ধড়টা। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে দরজার কপাট ভেজিয়ে দেয় অনুপম।

তেমনই আস্তে আস্তে হেঁটে বারান্দা পার হয়ে যায় অনুপম। সিঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে নামতে থাকে। চুপসে গিয়েছে ভরাট মুখটা। ঝুলে পড়েছে চোয়াল। মাঝরাতের চোরের মত যেন ছায়া লুকিয়ে লুকিয়ে সিঁড়ির ধাপ থেকে ধাপে নেমে যেতে থাকে অনুপম রায়ের কুঁজো হয়ে যাওয়া একটা অদ্ভুত শরীর। আরও অদ্ভুত ওই শরীরের ছায়াটা; যেন শিরদাঁড়াভাঙা একটা অন্ধকার চুপি-চুপি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।

নীচের তলায় নেমেই একবার টান হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে অনুপম। তারপর আর দেরি করে না। সবুজ ভেলভেটের পর্দা ঠেলে সেই কাজের ঘরের ভিতরেই ঢোকে আর টেলিফোনে কথা বলে।—ডাক্তার ব্যানার্জি আছেন?

—আছি।

—আমি অনুপম।

—কী খবর?

—আমার দুর্ভাগ্য, ডাক্তার ব্যানার্জি।

হেসে উঠলেন ডাক্তার ব্যানার্জি।—কী বললেন? আপনার দুর্ভাগ্য? সেটা কী করে সম্ভব?

—মনে হয়, হঠাৎ হার্টফেল করেছে; তাই এভাবে আমাকে একা রেখে দিয়ে চলে গেল।

—কে? কে? শিগগির বলুন।

—আমার স্ত্রী। শিগগির আসুন ডাক্তার ব্যানার্জি।

—